তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ত্রিবেণী প্রকাশন

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র, ১৩৬৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ভাদ্র, ১৩৬৫
তৃতীয় সংস্করণ : মাঘ, ১৩৬৫

প্রকাশক
শ্রীকানাইলাল সরকার
২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া
৩১, মোহনবাগান লেন
কলিকাতা ৪

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ
বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি
২১৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা ৬

বাঁধাই
তৈফুর আলি মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদার্স

প্রচ্ছদ-সজ্জা
অর্ধেন্দু দত্ত

দাম সাত টাকা

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র
পরমমিত্রবরেষু

দোলপূর্ণিমা, ১৩৬৪

প্রচ্ছদপটে

শ্রীঅজিত ঘোষের সৌজন্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি প্রাচীন কাংড়া চিত্র এবং নামপত্রে ঊনবিংশ শতাব্দীর কালীঘাটের একটি প্রাচীন পট ব্যবহৃত হইয়াছে।

আঠারো শতকের তৃতীয় দশক তখন শেষ হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে মুঘল আমল। সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী মুরশিদাবাদ; একাধারে দেওয়ান ও সুবাদার 'মতোমন্ উল্ মুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নসিরী নাসির জঙ্গ মুরশিদকুলী খাঁ' তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় এক অনাস্বাদিত-পূর্ব শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে সদ্য বিগত হয়েছেন। বাংলার মসনদে তখন সদ্য বসেছেন জাফর খাঁর একমাত্র জামাতা সুজাউদ্দীন—'মতোমন্ উল্ মুল্ক সুজাউদ্দীন বাহাদুর আসদ্ জঙ্গ'। রাজা সীতারাম রায় থেকে শুরু করে বাংলার সমস্ত জমিদারের সামন্ততান্ত্রিক স্বাধীনতা দমন করে তাঁদের ঘোড়ার মত মুখে লাগাম পরিয়ে সুবে বাংলার রথে জুড়ে বাংলার নবাবী তখন জলুসের রাত্রির শোভাযাত্রার মত চলেছে। দেশে তখন নিরঙ্কুশ শান্তি—চোর-ডাকাতেরা দিনের বেলায় সাপের মত লুকিয়েছে; ডাকাত ধরা পড়লে তাকে দু ভাগে ভাগ করে চিরে পথের ধারের গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। রাত্রিকালেও পথের ধারে গাছের তলায় ক্লান্ত পথিক নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যায়। মুরশিদাবাদ শহরে তখন টাকায় পাঁচ মন চাল। খাদ্যসামগ্রীর বাজার-দর বাঁধা। কোন ব্যবসায়ী বাঁধা-দরের উপর দর চড়িয়ে লাভ করতে চেষ্টা করলে ধরা পড়তে দেরি হয় না, তাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়ে আনা হয়। সে-আমলের ইতিহাসের কেতাবে পাওয়া যায় যে, মাসে এক টাকা আয় হলে একজন লোক দু বেলা পেট পুরে পোলাও-কালিয়া খেতে পারত। ১৭২৬।২৭ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র তিরিশ বছর পর পলাশীর যুদ্ধ; কিন্তু তখনই বোধ করি সুবে বাংলায় মুসলমান

নবাবশাহার উজ্জ্বলতম জোলুসের আসর। বোধ করি বেলোয়ারী কাচের ঝাড়লণ্ঠনে সামদানে বাতিগুলি নেববার আগে শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জিলা বীরভূমে অজয় নদীর ধারে গঞ্জ ইলামবাজার। বড় জমজমাট গঞ্জ তখন ইলামবাজার। ইলামবাজার থেকে পশ্চিমে জয়বাজার, উত্তরে সুখবাজার পর্যন্ত নিয়ে একনাগাড় এক মস্ত জমজমাট গঞ্জ।

দেশ তখন সমৃদ্ধ। বর্গীর হাঙ্গামা তখনও বছর বিশেক দূরে। বুলবুল কি টিয়াপাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ধান খেয়ে গেলেও লোকে খাজনা দেবার জন্যে ভাবে না। দেশে তখন অনাবৃষ্টিও ছিল না। যুদ্ধও না। বাংলা দেশের ক্ষেতে তখন শস্যের সমারোহ; খামারে খামারে ধানের বাখার, ছোলা-মুসুরের বাখার, ভাঁড়ারে জালায় জালায় গুড় মজুদ। ঢাকায় মসলিন, মুরশিদাবাদ-বিষ্ণুপুরে রেশম, গ্রামে গ্রামে আটপৌরে কাপড়ের তাঁত চলে ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত। ফিরিঙ্গীরা এ দেশে এসেছে, বসেছে, কিন্তু তার ভিত পোক্ত হতে পারে নি।

আজকাল ইলামবাজারে যে ইংরেজ-কুঠীর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তার কথা কেউ তখন স্বপ্নও দেখত না; শুধু কখনও-সখনও দু-একখানা নৌকো এসে লাগত; তার উপর থেকে দু-চারজন আশ্চর্য সাদা রঙের মানুষ এসে নেমে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলত। এখানকার মাল নিয়ে চলে যেত। ওদের বলত ফিরিঙ্গী। তাদের কারবার ছিল তুলোর আর কাপড়ের।

তাঁতের কারবারে ইলামবাজারের তুলোর বাজার তখন মস্ত বড় মোকাম। লেন-দেন চলে হাজার হাজার টাকার। তার সঙ্গে আশপাশের চাষীদের ঘরের পলুর চাষের রেশমের কারবারও কিছু ছিল। কিন্তু ইলামবাজারে সবচেয়ে বড় কারবার লাক্ষার। অজয়ের কূলের কুলগাছ আর পলাশগাছে লায়ের চাষ চলত। লা থেকে রঙ আলতা গালা তৈরী হয়ে চালান যেত দিল্লী পর্যন্ত। এখানকার গালার কদর ছিল খুব। মুরশিদাবাদের দরবারে যে গালার উপর মোহর ছাপ দিয়ে গোপনীয় পত্র পাঠানো হত সে গালা ছিল ইলামবাজারের। নবাব সুজাউদ্দিনের রঙমহল চেহেলসতুনে যে সব গালা

আসবাব খেলনা ছিল, বিলাসভবন ফররাবাগে গালার যে বিরাট বড় অপরূপ গাছটি ছিল, যার সবুজ পত্রপল্লবের বৃন্তে বৃন্তে ছিল লাল ফুল আর টোপা টোপা হলুদ ফল এবং যার উপর এক ঝাঁক কালো কুচকুচে মৌচুটকি পাখি সরষের আকারের রাঙা চোখ আর প্রবাল রঙের ঠোঁট নিয়ে বসে ছিল, যার তারিফ নাকি দিল্লী-দরবারের আমীরেরা এসেও করে যেতেন, সে গাছটি ইলামবাজারের গালা দিয়ে এখানকার কারিগরেরাই তৈরি করেছিল। মুখসুদাবাদের নবাবের রঙমহল থেকে আমীর-ওমরাহ-রাজা-জমিদার-বাড়ির মেয়েরা সে সময় পুরনো ভেঙে নিত্যই যে নতুন গালার চুড়ি পরতেন, জড়োয়া চুড়ির পাশেও যে চুড়ি জেল্লায় হার মানত না, সে চুড়িও ছিল ইলামবাজারের। মুরশিদাবাদের তওয়াএফ বাঈজী কসবীদের হাতে যে একহাত করে গালার চুড়ি বাহার দিত সেও তাই। তার সঙ্গে তার গড়ন-রঙ-ঢঙের নিত্যই ছিল পরিবর্তন। ওদিকে ইলামবাজারের কারিগরদের যেমন ছিল কারিগরির এলেম [illegible] ছিল নিত্য নূতন ঢঙ আবিষ্কারের উপযুক্ত সাফা মগজ। নবাব-বাদশা[illegible] দরবারে খেলাতের ফর্দে বড় বড় বাড়ির কুটুম্বিতার তত্ত্বতল্লাসের দফার মধ্যে ইলামবাজারী গালার জিনিস কিছু-না-কিছু না-থাকলে চলতই না। শুধু নবাব আমীর শেঠই নয়, গালার তৈরী থালার উপর ফল ফুল, আর পুরনো রকম—আম জাম কাঁঠাল এসব সচ্ছল গৃহস্থের ঘরে না-থাকলে তাদের মনও খুঁতখুঁত করত। ইলামবাজারের বাজারে এর জন্যই ছিল বড় খরিদ্দারের আমদানি। অনেকে বলত, ইলামবাজার নয়, এলেমবাজার। সেই জমজমাট ইলামবাজারে সেদিন অমাবস্যার ভোরবেলা।

ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম সোমবার। সোমবারে অমাবস্যা। শিব-চতুর্দশীর পরদিন মৌনী অমাবস্যা। পঞ্জিকায় নির্দেশ আছে মধুযোগ ও অক্ষয়স্নান। এই রাত্রিতে গঙ্গাস্নানে অক্ষয়পুণ্য। রাত্রি-প্রভাতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদে আরম্ভ হবে মাধবপক্ষ, পক্ষের পূর্ণতিথি পূর্ণিমায় মাধবের [illegible] খেলা, হোলি উৎসব, আবীরে রঙে কুমকুমে পৃথিবী রাঙা হয়ে উঠবে, মাধবীলতার কোমল সবুজ শাখাগুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে [illegible] [illegible] [illegible] মাধবীপুষ্প স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠবে। গৌরীশক্তির [illegible] সঙ্গে আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই ফুটতে শুরু করেছিল যে [illegible]

সে পলাশের ফোটা শেষ হয়েছে শিব-চতুর্দশীতে, তার ঝরার পালা শুরু আজ থেকে। রাঙা পলাশ শুকিয়ে রঙে পরিণত হবে, তারই কণা উড়িয়ে বাতাস খেলবে হোলি। সংকল্প করে যারা মাধবার্চনা করবে তারা এই অমাবস্যার রাত্রিতে স্নান করে ঝরা-পলাশ কুড়িয়ে বাড়ি আনবে, রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে তাই দিয়ে তৈরি করবে মাধবরঞ্জনের জন্য রাঙা রঙ। আবীর কুমকুম আসবে বাজার থেকে। ইলামবাজারে অজয়ের ঘাটে বড় বড় নৌকা এসে লাগবে। আবীর কুমকুম বেচে তার বদলে আলতা গালার খেলনা, চুড়ি আর তুলো বোঝাই নিয়ে ফিরবে। কাশ্মীরী জাফরান নিয়ে আসবে পাঞ্জাবের শেখ সওদাগরেরা—ইয়া ঢিলেঢালা পায়জামা, হাঁটুঝুল পাঞ্জাবির আস্তিন, তার উপরে হাতকাটা জরির কামদার ফতুয়া পরে শাহী জোয়ান সব। জাফরানের সঙ্গে আনবে আতর। বড় বড় গদির মালিকেরা, জমিদারেরা আতর কিনবে; তাদের হোলিতে আবীরের সঙ্গে আতর না হলে চলে না। পাঞ্জাবীরা আরও পণ্য আনে, ঘোড়া আনে। জমিদার-ব্যবসাদারেরা কেনে সে সব।

আকাশের পূর্বকোণে শুকতারা দপদপ করছে তখনও; অমাবস্যার অন্ধকার সবে ফিকে হতে শুরু করেছে, রাত্রির নিঝুম থমথমানি এখনও কাটে নি। পাখিরা সবে একবার ডাক দিয়ে আবার ডাকি-ডাকি করছে; বাজারের গালার কারখানার চুল্লীর ছাই কাড়া—অর্থাৎ পরিষ্কার করা তখনও পর্যন্ত শুরু হয় নি; এরই মধ্যে সেদিন মৌনী অমাবস্যার মন্বন্তরা-স্নান উপলক্ষ্যে বাজারের ঘরে ঘরে সাড়া পড়ে গেছে। কাল থেকে মাধবার্চনা পক্ষ। আজ স্নান না করলে চলে? দোল-পূর্ণিমা হোলি-উৎসব। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা দোলযাত্রা। দ্বাপরের কানহাইয়ালালের ব্রজলীলার শ্রেষ্ঠ লীলা দোললীলা; ভারতের বসন্তোৎসব হোলি; বাংলার প্রাণচৈতন্য শচীনন্দন মহাপ্রভুর জন্মতিথি। হোলি-উৎসবের প্রস্তুতির জন্য প্রথম স্নান।

পনের দিন ধরে এখন শুক্লপক্ষের চাঁদের মত কলায় কলায় উল্লাস আনন্দ উৎসব বাড়তে থাকবে। বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, বালিকা থেকে বৃদ্ধা অবধি। রঙ পিচকারি থেকে কাদা আলকাতরা পর্যন্ত। সরঞ্জাম সংগৃহীত হচ্ছে। শরবত থেকে সুরা পর্যন্ত। ভগবানের জন্য নৈবেদ্য থেকে নেশার

মুখের স্বাদের জন্য নানাবিধ স্থূল ও তীব্রস্বাদী আহার্য পর্যন্ত। নামগান কীর্তনগান থেকে বাঈজী-কসবী, খেমটা-ঝুমুর পর্যন্ত।

দেশের জীবনের শুধু এইখানটিতে সর্বনাশের সংকেত পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। জীবনে পচ ধরেছে; একটু অবহিত হলেই তার গন্ধে অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে। কিন্তু সে দিকে অবহিত হবার মত দৃষ্টির স্বচ্ছতাও নেই কারও।

বাংলা দেশে মহাপ্রভুর যে বৈষ্ণবধর্ম মহাপ্লাবন এনেছিল, জীবনকে সাগর-সঙ্গমের মহাতীর্থে পৌঁছে দিয়েছিল, সে স্রোতোধারার মুখ তখন মজে এসেছে, ফলে দেশ-জীবনের অবস্থা হয়েছে বিলের মত। মাছেরা যেমন এ ক্ষেত্রে সাগরসঙ্গমে পৌঁছতে পারে না, সাগরের স্বাদ পায় না—বিলের জলতলেই চক্রাকারে পাক খেয়ে উছল মেরে অসীমের সীমা ও অতলের তল পাওয়ার ভ্রান্ত আস্বাদে বিভোর থাকে—মানুষেরাও তেমনি আচার-আচরণপালনের মধ্যেই পরম-প্রাপ্তির স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। বিলের জলে নিক্ষিপ্ত গৃহস্থের উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জনের লবণের স্বাদেই যেমন বিলের মাছের সমুদ্র-জলের আস্বাদ বলে ভ্রম হয়—মানুষেরও ঠিক সেই অবস্থা।

স্নান। স্নান। অক্ষয়-স্নান। ইলামবাজারের প্রান্তদেশে অজয়; ক্রোশ তিনেক দূরে শ্রীমন্ জয়দেব গোস্বামীর শ্রীপাট কেন্দুলী। কেন্দুলী পর্যন্ত অজয় নদ গঙ্গা-মহিমায় মহিমান্বিত; পৌষ-সংক্রান্তিতে, মকরবাহিনী নাকি উজান বেয়ে কাটোয়া থেকে কেন্দুলী ঘাট পর্যন্ত আসেন; এই ঘাট পর্যন্ত অজয়-স্নানে গঙ্গা-স্নানের পুণ্য হয়; সেই বিশ্বাসে দলে দলে স্নানার্থীরা স্নান-পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য জেগে উঠেছে সেদিন।

*　　　*　　　*　　　*

—ওদিকে নয়। এইদিকে। আরও খানিকটা নীচে যাই চল্। লোক থৈ-থৈ করছে ওদিকে। এদিকটা নিরিবিলি হবে। কী? দাঁড়ালি যে?

—হুঁ! অভিযোগের সুরে হুঁ বলে সুর টানলে মোহিনী। অভিযোগের সঙ্গে আবদার: হুঁ, ঘাটের বাজারে গালার চুড়ি পরব যে!

মা আর মেয়ে। কৃষ্ণদাসী আর গোবিন্দমোহিনী। সংক্ষেপে দাসী আর মোহিনী। জম্বুবাজার ও ইলামবাজারের ন্যাড়ানেড়ী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একটি বড় আখড়ার অধিকারিণী। কিন্তু লোকে চুপি চুপি বলে বৈষ্ণবী নটী। কথাটা

পরিষ্কার হল না। ছিল ওরা বৈষ্ণবী। মা কৃষ্ণদাসী তরুণ বয়সে নামের দলের সঙ্গে নামগান গেয়ে বেড়াত; ক্রমে ইলামবাজারের ঐশ্বর্যের মোহে আজ নটী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে পুরো নটী নয়, নটীপাড়ায় বাস করে না, নটীর সাজে সাজে না, বৈষ্ণবীর মত তিলক কাটে, চূড়া বেঁধে চুলও বাঁধে, দুই বাজারের বাজার-এলাকার বাইরে একটি শান্ত বৈষ্ণব-পল্লীতে আখড়াতেই বাস করে; সেখানে প্রভুর সেবাও আছে। তবে এ সমস্তের আড়ালে এদের আর-একটি রূপ আছে। সেটি নটীর রূপ। অনেককাল পর্যন্ত সেটি সাধারণ্যে অপ্রকাশ ছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসীর আখড়ায় চারিদিক পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকা সত্ত্বেও সে সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পাঁচিল পার হয়ে বাতাসে ভেসে এসেছে মুরশিদাবাদী জর্দার গন্ধের সঙ্গে দামী আতরের গন্ধ। আরও ভেসে এসেছে অনেক-কিছু, যা নাকি কানাকানি করে প্রায় ঘরে ঘরেই ছড়িয়ে দিয়েছে, কৃষ্ণদাসীদের স্বরূপের ব্যাখ্যা। তাতে কৃষ্ণদাসীর কোন অনুশোচনা নেই; কিন্তু লজ্জা বা শঙ্কা দুইয়ের একটা, হয়তো বা দুটোই এখনও আছে। তার কারণ সে হল এ অঞ্চলের আখড়াধারী বৈরাগী বাউলদের শীর্ষস্থানীয় সিদ্ধসাধক প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ার উত্তরাধিকারিণী। তার খেতাব হল—মা-জী। আখড়ায় প্রেমদাসের সিদ্ধাসন আছে; তাঁর প্রতিষ্ঠা-করা মহাপ্রভুর দারু-বিগ্রহ আছে। সেই কারণে সে অত্যন্ত সাবধানে থাকে। কোন গদিওয়ালা ধনীর বাড়িতে যখন সে যায় তখন যায় অত্যন্ত গোপনে। যায় ডুলিতে, সঙ্গে লোক থাকে। বিরল পথে যাতায়াত করে। পথে লোকে ব্যঙ্গ করলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বাজারের লোক দেশান্তরের আগন্তুক দুঃসাহসী সওদাগরদের পিছন ধরিয়ে দিলে বিপদ হবে। ওদের তো কোন বাধাবন্ধ নেই, পথের মাঝখানেই এসে হাঁকবে—এ লম্বরদারনী!

তাদের সম্প্রদায়ের অনেককে এই অসাবধানতার জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে বাজারে। একেবারে সম্প্রদায় থেকে বিচ্যুত হয়েছে তারা। সব চেয়ে ভয় তার এই মেয়ে মোহিনীকে। মোহিনীকে কৃষ্ণদাসী অতি সন্তর্পণে গোপন সম্পদের মত রাখতে চায়। মেয়েকে নিয়ে তার অনেক আশা অনেক কল্পনা; সে শুধু জানে তার মন আর জানেন যিনি সব জেনেও কিছু-না-জানার ভান করে বসে আছেন; লুকিয়ে থাকেন পাথরের বিগ্রহের

মধ্যে। মোহনার দিকে কৃষ্ণদাসী তাকায় আর বুকের ভিতর সেই কথায় আলোড়ন ওঠে। মেয়ে তো নয়, সাক্ষাৎ আগুনের শিখা। ঘরের দেওয়ালের আড়ালে কাচ-ঘেরা লণ্ঠনের ভিতরের প্রদীপের মত ঢেকে রেখেছে তাই। ঘেরা না থাকলে এত পাখাওয়ালা পিঁপড়ে-ফড়িং ছুটে এসে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে যে তাতে শিখাই নিবে যাবে নয়, অগ্নিকাণ্ড হবে। সেই কারণেই বাজার পার হয়ে ইলামবাজারের সদরঘাটে যাবে না কৃষ্ণদাসী। বাজারকে পিছনে রেখে মাঠ পার হয়ে শালবন-কুলবনের ভিতর দিয়ে গাঁয়ের ঘাটে স্নান করবে। আর মেয়ে আবদার ধরেছে ঘাটের বাজারে যাবে চুড়ি পরতে!

কৃষ্ণদাসী বললে, না। একটু রূঢ়ভাবেই বললে।

ভাল করে চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মেয়ের চাদরটাও ঠিক করে দিলে। মেয়েটার বয়স সবে পনের। তার কুড়ি বছর বয়সের সন্তান।

—চুড়ি আমি আনিয়ে দেব।

মৃদুস্বরে মেয়ে তেমনি অনুযোগের সুরেই বললে, আনিয়ে দেবে! পরের আনা জিনিস বুঝি পছন্দমত হয়? দোকানে কত রকম চুড়ি—

বাধা দিয়ে মা বললে, কত রকম চুড়ি! মরণ তোমার! দোকানে সবার সামনে লোক দেখিয়ে চুড়ি পরবি কী? আমাদের বুঝি তাই পরতে আছে?

—নেই তো, এত চুড়ি পরে তুমি ডুলি চেপে যাও কেন?

—যাই কেন? কচি খুকী নাকি তুই? সে যাই লুকিয়ে। আমরা বৈরেগী-বোষ্টুম, ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায়। আমাদের অলঙ্কার না, আভরণ না। শুধু তেলক আর মালা। বড়জোর দরবেশী ফকিরকাঁটী ফটিকের মালা। দশকে দেখিয়ে গালার চুড়ি পরে 'ভাবন' করতে গেলে পতিত করবে। চল্, আর কচি খুকীর মত দাঁড়িয়ে খ্যান-খ্যান করিস নে। ঝুঁঝকি কেটে ফরসা হয়ে আসছে।

আকাশ সত্যই ফরসা হয়ে আসছে; গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। দিক্‌চক্রবালের ওপার থেকে সূর্যদেবতার রথ ছুটে আসছে মুহূর্তে মুহূর্তে

বহু যোজন পথ অতিক্রম করে। পাখিরা বাসায় বসে মুখ বাড়িয়ে কলরব করা শেষ করে দুটি চারটি করে বাইরে উড়তে শুরু করেছে। কাকেরা বেরিয়েছে সব চেয়ে আগে। প্যাঁচা এবং বাদুড়েরা বাসায় ফিরছে। খুবই কাছাকাছি মাথার উপর দিয়ে দ্রুত কুহু-কুহু-কুহু-কুহু ডাক ডেকে উড়ে গেল একটা কোকিল। কাকে তাড়া করেছে।

মোহিনী কাকটাকে গাল দিলে, মর্ মুখপোড়া হিংসুটে।

কৃষ্ণদাসী বললে, ওই অমনি করে তেড়ে ঠোকরাতে আসবে বাজারের যত নচ্ছারের দল। শিস কাটবে। তখন মানটা থাকবে কোথায়?

বাজারের পথে সাধারণ নটীরা যখন সেজেগুজে বের হয় তখন বাজারের অবস্থাটা যে কী হয়! মা গো! শিস, হাসি, অশ্লীল কথা যেন হাঁড়ি ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে গড়িয়ে বেড়ায় অবরুদ্ধ পচনরসের মত। ওই বিদেশীদের দু-একজন দুঃসাহসী দাঁত মেলে পথ আগলে দাঁড়ায়, হাত ধরে টানে। সাধারণ নটী-কসবীরা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে গুপ্ত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তাই কি কৃষ্ণদাসীর সহ্য হয়?

মেয়ের পিঠে ঠেলা দিয়ে কৃষ্ণদাসী হাঁটতে শুরু করলে। রাত্রির স্নান। আলো ফুটলে হবে না। এতেই অন্যায় হল। রাত আর নেই। পাখি ডেকেছে। পাখি ডাকলে আর রাত্রি থাকে না। 'ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা, খনা বলেন সে হল উষা।' উষাকাল রাতও নয়, দিনও নয়। পাখি বাসা ছেড়ে বাতাসে পাখা মেললেই উষা শেষ, দিন শুরু হয়ে যায়। —চল্, চল্, পা চালিয়ে চল্ বাছা। তা বলে দেখে চলিস। দেখছিস না, কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া 'কুয়ো' (কুয়াসা) জাগছে।

কৃষ্ণদাসী মাঠের মধ্য দিয়ে পথ ধরলে। চারিপাশে পাতলা শালবনের ভিতর মাঝে মাঝে খানিকটা-খানিকটা চাষের ক্ষেত। তারই আলের উপর দিয়ে শালবনের ভিতর দিয়ে পায়ে-চলা পথ। গঞ্জ-বাজারকে বেড় দিয়ে চলে গেছে। ওই পথ ধরে কৃষ্ণদাসী মেয়েকে নিয়ে এক নির্জন ঘাটে গিয়ে নামবে। বাঁয়ে বোলপুর সুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত শালবনের এলাকাটা পার হয়ে সে নিশ্চিন্ত হবে। বনের মধ্য দিয়ে চলে গেছে এই গাড়ির রাস্তাটি। ওই রাস্তায় সারিবন্দী গরুর গাড়ি চলছেই—চলছেই। ধান আর চাল, চাল আর

ধান। উত্তর দিক থেকে আসে এই ইলামবাজার জম্বুবাজার গঞ্জে। ওই পথে ঠিক এই সময়ে একটা ভয়ের সম্ভাবনা আছে। ওই পথে এই সময়ে দেখা যায় এক ঘোড়সওয়ারকে। রাধারমণ দাস সরকারের পাষণ্ড বংশধর অক্রূর সরকারকে। অক্রূর অহঙ্কার করে বুক বাজিয়ে বলে—অক্রূর নেহি, হাম ক্রূর সরকার হ্যায়। রাধারমণ সরকার ধনী ব্যবসাদার, ইলামবাজারে তার মস্ত গদি; রাধারমণের সাধনকুঞ্জে কৃষ্ণদাসীর যাতায়াত আছে। ছেলে অক্রূর কুলধর্ম মানে না; সে বৈষ্ণব-বংশের ছেলে হয়েও দুর্দান্ত মাতাল, নারীদেহের প্রতি তার প্রচণ্ড প্রলোভন এবং রুচিও বিচিত্র; তার রুচিতে সে নিকষ কালো বন্য বর্বর-জাতীয়া মেয়েদের পিছনে উন্মত্ত লালসায় ছোটে। এই বনের পথ ধরে কিছুদূর গিয়ে বাঁ দিকে বনের ভিতর তার এক বিলাসকুঞ্জ আছে, সেইখানে তার অনুচরেরা সংগ্রহ করে আনে নিত্য-নূতন শবরী-জাতীয় যুবতী। সেই ভোগ করে এই ভোরবেলা সে ইলামবাজার ফেরে। রাধারমণ পুত্রের মতি ফেরাবার জন্য মোহিনীকে চায় কৃষ্ণদাসীর কাছে। এই শবরীলালসালোলুপ অক্রূরের বিকৃতরুচির মধ্যেও বিচিত্র ব্যতিক্রমের মত ভাল লেগেছে মোহিনীকে। বাপকে সে কথা দিয়েছে যে, মোহিনীকে সে যদি পরকীয়া-সাধনের সঙ্গিনী হিসেবে পায় তবে দীক্ষা নিয়ে সব ব্যভিচার ছেড়ে দেবে। কৃষ্ণদাসী মুখে সরকারকে 'না' বলতে পারে না, কিন্তু ওই অক্রূরের হাতে মোহিনীর মত সোনার পুতলীকে তুলে দিতে পারবে না।

মোহিনীকে নিয়ে তার অনেক বাসনা, অনেক কামনা।

পথের ধারে এসে দাঁড়াল কৃষ্ণদাসী। মেয়েকে বললে, দাঁড়া। ঘন শাল-বনের মধ্য দিয়ে রাঙা মাটির গরুর-গাড়ি-চলা কাঁচা সড়ক। ক্যাঁ—ক্যাঁচ—ক্যাঁচ শব্দে গরুর গাড়ি চলেছে—ধুলো উড়ছে; লাল ধুলোয় সব ঢেকে গেছে। গাছের আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণদাসী যথাসম্ভব স্থিরনিশ্চয় হয়ে নিলে। না, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, ঘূর্ণির মত ধুলোর ঝড়ও আসছে না, কোন প্রমত্ত কণ্ঠের শাসনবাক্যও শোনা যাচ্ছে না। না। আসছে না অক্রূর! এবার সে মেয়ের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললে, আয়।

* * *

সড়ক রাস্তাটা পার হয়ে ওধারে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ে নিশ্চিন্ত হল

কৃষ্ণদাসী। জঙ্গলের একেবারে প্রান্তদেশ এখানটা। ডাইনে পড়ে রইল ইলামবাজারের বাজার। সড়কের মুখে গঞ্জের ঘাট ; সামনেই একটু ডান দিকে দক্ষিণ মুখে এসেই পড়ল অজয়ের তটভূমি। তটভূমিতে শালজঙ্গল পাতলা হয়ে গেছে ; বোধ করি বালুপ্রধান জমিতে শালগাছ ভাল জন্মায় নি। নইলে অজয়ের দক্ষিণ দিকে যে শালজঙ্গল তাকে জঙ্গল বলা চলে না—বন বলতে হয় ; বিশাল শালবন। ক্রোশের পর ক্রোশ চলে গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে সাঁওতাল পরগনার অরণ্যভূমের সঙ্গে মিশে গেছে। আবার দক্ষিণে বাদশাহী সড়ক পার হয়ে গেছে দামোদরের ধার পর্যন্ত। দামোদরের ওপারে আবার শুরু হয়েছে বন। বাঁকুড়া জেলা জুড়ে এঁকে-বেঁকে এক দিকে চলে গেছে মানভূম-হাজারিবাগের অভিমুখে, অন্য দিকে চলে গেছে মেদিনীপুর হয়ে উড়িষ্যা সীমান্ত ধরে নাগপুরের দিকে। মূল শালবন প্রকৃতপক্ষে অজয়ের দক্ষিণ দিকে। বর্ধমান জেলার মধ্যে এপারে একটা ফ্যাকড়ার মত শালবনের খানিকটা অংশ ক্রোশ দুই-আড়াই চলে গেছে বোলপুরের ধার পর্যন্ত।

খোলা জায়গায় এসে কৃষ্ণদাসী দম নেবার জন্য একটু দাঁড়াল। এতক্ষণে অনেকটা নিশ্চিন্ত। নবাবী শাসনে চোর-ডাকাতরা শায়েস্তা হয়েছে, দরিদ্র-লম্পটেরাও শায়েস্তা হয়েছে ; কিন্তু ধনী লম্পট যারা তাদের শায়েস্তা করবে কে ? তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করবে কে ? সে নালিশ নেবেই বা কে ?

অকস্মাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে কৃষ্ণদাসী।

কী থেকে কী হয়ে গেল ! হয়তো তার জন্যে নিজের দায়িত্ব কম নয়। কিন্তু তবু মনে হয় এর উপর তার নিজের হাত ছিল না ; নিজের হাত নেই। স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। লোকে বলছে, সাঁতার কেটে তীরে উঠল না কেন ? সাঁতার তো জানে ! জানে বইকি সাঁতার। এত বড় পাট—প্রেমদাস বাবাজীর পাট—সেই পাটের মা-জী, সাঁতার জানে বই-কি ! কিন্তু আশ্চর্য, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলার টান থেকে কিছুতেই সে পাশ কাটিয়ে তীরে উঠতে পারছে না।

নিন্দা তো উঠেছে। চাপা যেন আর থাকছে না। শুধু তার শ্বশুরের সাধনসিদ্ধ পাটের উপর শ্রদ্ধার জন্য লোকে এখনও তাকে পতিত করতে

পারে নি। উঁচু জাতের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ-সমাজের লোকেরাও প্রকাশ্যে কোন কথা বলতে পারে না।

তারা অবশ্য সমাজে নগণ্য, বৈষ্ণব গোস্বামীদের চরণরেণু, জাতহারা ন্যাড়া-নেড়ী দলের বৈরাগী বৈষ্ণব। কিন্তু তবুও তার শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজীর সাধক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাঁর ভাবাবেশ হত, তাঁর ভাবাবেশের সময় গোরাচাঁদের কাঁধের উত্তরীয় খসে পড়ত। বড় বড় গোস্বামীরা দেখতে আসতেন। তাঁরা বলতেন, প্রভুর অঙ্গেও কম্পন জাগে তাই এমন হয়। কেউ বলতেন, ওই উত্তরীয় দিয়ে প্রেমদাসের অঙ্গের ধুলো ঝেড়ে দিতে বলেন। কৃষ্ণদাসীর মহান্ত প্রেমদাস বাবাজীর নিজের ছেলে নয়; সুন্দর রূপ দেখে পোষ্য নিয়েছিলেন শেষ সেবাদাসীর গৃহস্থাশ্রমের ছেলেটিকে। নাম দিয়েছিলেন গোপালদাস। পাটটিই বরাবরকার শিষ্য আর পোষ্যের পাট। এ পাটের সেবায়েত বাবাজীদের সেবাদাসী আছে, সন্তান নেই। অর্থাৎ সাধনেরই পাট, সংসারের হাট নয়। এখানে দেওয়া-নেওয়া আছে, কিন্তু বিকিকিনি নেই। ঘর আছে দোর আছে, কিন্তু বাঁধন নেই। বাঁধনের ডোর পাকিয়ে উঠল কৃষ্ণদাসীর কন্যা মোহিনী হতে। গোপালদাস কৃষ্ণদাসীকে নিয়ে এল সাধন-সঙ্গিনী করে; সাধনের ফুল ফল হল; বছর কয়েক যেতেই কৃষ্ণদাসীর সন্তান হল—মোহিনী। তাতে সমাজে লজ্জা অবশ্য হয়েছিল তখন, কিন্তু এ লজ্জা আর সে লজ্জার অনেক প্রভেদ। তারপর কৃষ্ণদাসীর জীবনে ঘটল বিপর্যয়। বৈষ্ণব গোপালদাস দেহ রাখলে। শ্বশুর প্রেমদাস আর শাশুড়ী রাইদাসী বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসীকে বুক দিয়ে আগলে রাখলে—তাদের সাধনভজনের পুঁজিপাটা যা ছিল সব কৃষ্ণদাসীকে দিয়ে আখড়ার বিগ্রহকে দেখিয়ে বলে দিলে, ওইখানে মনটি রেখে ঘর কর, সংসার কর, মেয়েকে মানুষ কর, মুক্তি ওইখানে, অভয় ওইখানে, উদ্ধার ওইখানে। ঘাটে বাঁধা আছে নামের তরী, উনি তার কাণ্ডারী, পারের কড়ি তোমার ওই চরণে মতি।

আরও কিছু দিয়ে গিয়েছে শ্বশুর শাশুড়ী; দিয়ে গিয়েছে অনেক রোগের অনেক ওষুধ, অনেক মন্তরতন্তর, ঝাড়ফুঁকের বিদ্যে। লোকে বলে ডাকিনী-বিদ্যা। ইলামবাজার অঞ্চলে ওই মূলধনে কৃষ্ণদাসী মহাজন সেজে বসে আছে। তাই লোকে কেউ কিছু বলতে পারে না। এদিকে এল আর একটা স্রোত।

ইলামবাজারে জনুবাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যের স্রোত। গঞ্জ উঠল জেঁকে। ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী এল মুরশিদাবাদ; সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় অঞ্চল আবার জাঁকল। নৌকো এল, বজরা এল, উটের সারি এল, খচ্চরের পালের পিঠে হরেক রকমের সওদা এল, দেশ-দেশান্তর থেকে হরেক রকমের লোকজন এল, তাদের গেঁজেলে সোনার মোহর, রূপার সিক্কা। তারা এসে যে বিকিকিনি শুরু করলে সে শুধু জিনিসপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না, আরও অগ্রসর হল অনেক দূর। ইলামবাজারের গঞ্জে কসবীপাড়াটা সারা রাত্রি আলো জ্বালিয়ে রেখে আর হৈ-হুল্লোড় করে তার সাক্ষী দিচ্ছে। স্রোতটা বাইরে থেকে যেমন এল, ভিতর থেকেও তেমনই বন্যার জলের সঙ্গে মিশবার জন্য পুকুরের জলেও স্রোত ধরল। এখানকার দোকানদারেরা এক পুরুষের মধ্যেই মহাজন হয়ে উঠে আমেরী বিলাসে মাতল; যারা সামান্য সাধনভজন করত তারা হয়ে উঠল সাধক।

পরকীয়া-সাধন কিশোরী-ভজন দেশে চলছিল, কিন্তু সে চলছিল গোপনে; চলছিল গুরুদের ইশারায়। সংসারে সাধনা করলেই সিদ্ধি মেলে না। শতকরা নিরেনব্বই জনই ভ্রষ্ট হয়; এবং তাই হত। কিন্তু তাতে ভ্রষ্ট যারা হত তারা দুঃখও পেত লজ্জাও পেত, বুক ফাটিয়ে কেঁদে গোবিন্দের কাছে কামনা জানাত যেন আগামী জন্মে সিদ্ধি মেলে। টান পড়ল তাদের সম্প্রদায়ে; বিশেষ করে যারা শহর বাজার গঞ্জ এলাকায় থাকে তাদের উপর টানটা পড়ল প্রবল ভাবে। তারা গরিব, তারা ভিখারীর জাত, তারা এ টানে স্রোতের কুটোর মতই ভেসেছে। এর জন্য অপবাদ তাদের হয়েছে। বিশেষ করে ইলাম-বাজারের এলাকার বাইরে। এই তো ক্রোশ চারেক পথ জয়দেব কেন্দুলী, পৌষ-সংক্রান্তিতে সেখানে গোটা দেশের বাউল দরবেশ ন্যাড়া নেড়ীর সমাগম হয়; সেখানে ইলামবাজারের তাদের যাওয়া ভার হয়েছে। ইলামবাজারের বৈষ্ণবী শুনলে—তাদের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে, কেউ বা মুচকে হাসে, কেউবা একটু সরেও বসে।

কখনও কখনও রাগ হয় কৃষ্ণদাসীর; নিজের উপরও হয়, যারা লোভ দেখিয়ে তাকে তার সাধনপথ থেকে টেনে কাদায় নামিয়েছে তাদের উপরও হয়, ওই বাউল-বৈষ্ণবদের উপরেও হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরই হয়। কখনও

ঘেন্না হয় ওদের উপর, ওই বাউলদের উপর, যারা সরে বসে, যারা মুখ বেঁকিয়ে হাসে তাদের উপর। মরণ! সে তো সব জানে, সাধন জানে, ভজন জানে, সিদ্ধি জানে—সব জানে। সব মিছে—সব মিছে। জাত হারালে ভিখিরী; ঘর বেঁধে সে ঘর যে রাখতে না পারে সে-ই ঘর ছেড়ে হয় বৈরাগী।

—মা! ডাকলে মোহিনী।

চমক ভাঙল কৃষ্ণদাসীর: অ্যাঁ?

—পূব দিকে লালি দিয়েছে। ঘাটে নাম। সূয্যি উঠে যাবে যে!

—চল্।

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়ের হাতখানা ধরলে কৃষ্ণদাসী; তারপর কোন্ কৌতুকোচ্ছলতায় কে জানে, তার হাত ধরে ঠিক সমবয়সী সখীর মত অজয়ের বালুময় ঢালু পাড় ভেঙে ছুটে নামতে লাগল; সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল শব্দে হাসি। মা এবং মেয়ে দুজনে ঝপ করে দুটি বালিহাঁসের মত জলে এসে পড়ল।

* * * *

আকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

পাখির কলরবে ভরে উঠেছে ওপার এপারের বনস্থলী। শীতের শেষ, বুনো হাঁসের ঝাঁক সারারাত্রি ক্ষেতে ফসল খেয়ে কলকল শব্দ তুলে দহের দিকে বিলের দিকে খালের দিকে ফিরছে। মোহিনী স্নান সেরে উঠে শুকনো কাপড় পরে পলাশতলায়-তলায় ঝরা ফুল কুড়চ্ছিল। শুকিয়ে দোলের রঙ খেলার রঙ হবে। কৃষ্ণদাসী কাপড় ছাড়ছিল। আর তাকিয়ে ছিল ওপারের শালবনের দিকে। ওই বনের ভিতর দিয়ে পথ ধরে দামোদর পার হয়ে বাঁকুড়া মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে পুরীর পথ। কৃষ্ণদাসী মোহিনীকে কোলে নিয়েই ওই অরণ্যের ভিতর দিয়ে সড়ক ধরে মদনমোহনের বিষ্ণুপুর হয়ে ঝাড়খণ্ডের ভিতর দিয়ে জগন্নাথদর্শন করে এসেছে একবার। তখন মোহিনীর বাপ গোপালদাস বেঁচে ছিল, দল বেঁধে গিয়েছিল তারা। এদিকে এ-বন কেন্দুলীর ওপারের শ্যামরূপার গড় পার হয়ে চলে গিয়েছে পাহাড়-মুলুকের দিকে। আর একবার জগন্নাথদর্শনে যেতে মাঝে মধ্যে তার ইচ্ছা হয়। কিন্তু হয় না। মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হয় জগন্নাথের পাট-অঙ্গনে লুটিয়ে পড়ে মাথার বুকের সকল বোঝা নামিয়ে দিয়ে বাকী জীবনটা পথের ধারে বসে মহাপ্রসাদ ভিক্ষা

করে কাটিয়ে দেয়। আর সবচেয়ে বড় বোঝা তার রূপের ডালি ওই মোহিনী, তাকেও জগৎ-নাথের চরণে নিবেদন করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু হয় না, হয়ে ওঠে না। কেমন করে কোথা দিয়ে যে কোন্ পাকচক্র লেগে যায় তা বুঝতে পারে না।

—খাবে মা?

মোহিনী এসে কাছে দাঁড়াল।

—কী? প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পূর্বেই গন্ধ এসে তার নাকে ঢুকল। মহুয়ার গন্ধ; পূর্ণপ্রস্ফুটিত রসপরিপুষ্ট মহুয়াফুল। কৃষ্ণদাসীর বুকের ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার গন্ধে।

—মহুয়া?

—হ্যাঁ। কী বড় বড় আর কী সুন্দর দেখ! আর কী যে মিষ্টি!

পলাশফুল কুড়তে কুড়তে মোহিনী পলাশফুলের সঙ্গে মহুয়াফুল কুড়িয়েছে; আঁচল ভর্তি। মোহিনীর রসনা মুহূর্তে রসায়িত হয়ে উঠল; রসনার সে রসক্ষরণের সঙ্গে জগদ্বন্ধুদর্শনের কামনাও বোধ হয় গলে ওই রসের সঙ্গেই মিশিয়ে গেল। কয়েকটা মহুয়াফুল তুলে নিয়ে মুখে ফেলে দিয়ে চিবুতে চিবুতে বললে, তুই কতগুলো খেলি? বেশী খেয়েছিস নাকি? আর খাস নে। বলে আবার এক মুঠো মহুয়াফুল তুলে মুখে ফেলে দিলে কৃষ্ণদাসী।

মোহিনী বললে, তবে তুমি খাচ্ছ কেন?

—আমাতে আর তোতে? মরণ! হেসে ফেললে মা।

—শুধু তো গা ঘুরবে! তা ঘুরুক।

—মরণ! যা বলি তাই শোন্! বলে, শুধু তো গা ঘুরবে! মাদকেতে মেতে উঠবি। শুধু মেতে? তেতে উঠবে সারা গা। হেসে ফেললে কৃষ্ণদাসী। আবার গম্ভীর হয়ে বললে, সবেরই একটা বয়েস আছে। বয়স হোক, খাবি। সে সব আচার আচরণ আছে, কত ক্রিয়াকরণ আছে, সে সব হবে।

আবার হেসে ফেললে কৃষ্ণদাসী। মহুয়ার রস তার পাকস্থলীতে গিয়ে তার দেহকে মাতায় নি, তাতায় নি, কিন্তু মন তার এরই মধ্যে মেতে উঠেছে। আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসতে লাগল সে।

সন্ন্যাসী বেরিয়ে এসে সদ্য-উদিত সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন।

কৃষ্ণদাসী অবাক হয়ে গেল। কে এল এ নবীন গোসাঁই? এ অঞ্চলের গোসাঁই মহান্ত সকলকেই তো সে চেনে! হোক না সে ন্যাড়া-নেড়ী সম্প্রদায়ের বৈরাগী বৈষ্ণবী; কিন্তু সে ইলামবাজারের ন্যাড়া-নেড়ীদের বড় আখড়ার মা-জী। দুর্নাম থাকলেও এখনও মহোৎসবে চব্বিশপ্রহরে নবরাত্রিতে তার ডাক আসে—তাকে যেতে হয়, তার একটা আসন হয়। তার আখড়ার মহাপ্রভু-বিগ্রহ প্রেমদাস বাবাজীর সেবাসাধনায় জীবন্ত দেবতা; সে বিগ্রহকে দেশের লোক সাধ্যসাধনা করে নিয়ে যায় চব্বিশপ্রহর নবরাত্রিতে। সে সব আসরে সে যোগিনীর মত সাজ করে প্রভুর চরণতলেই বসে থাকে। যিনিই হোন, যত বড় গোসাঁই হোন, এসে তার হাত থেকেই চরণোদক নিয়ে ধন্য হন। সে সকলকেই তো জানে চেনে। এ কে? এ গোসাঁই এখানকার কেউ নয়। এ তা হলে কোন দূরান্তরের গোস্বামী মহান্ত, নিজের মঠের ধ্বজা উড়িয়ে আসছেন জয়দেব প্রভুর পাট পরিক্রমা করতে। তীর্থযাত্রী গোস্বামী মহান্ত; বড় সুন্দর নবীন মহান্ত! গৌর যেন নবকলেবর ধরে আবার অবতীর্ণ হয়েছেন পাতকী-তারণের জন্য। প্রভাতটি আজ ভাল। দর্শন-পুণ্য হয়ে গেল। নৌকাখানা পার হয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণদাসী যাই হোক, বৈষ্ণবের ঘরে তার জন্ম, বৈষ্ণবের আখড়ায় সে বাস করে, সে এ গোসাঁইকে দেখে প্রণাম করতে ভুলল না। সেই তটভূমিতেই নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে উঠে হাত জোড় করে রইল। পর-মুহূর্তে আড়চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে যতখানি সে অবাক হল ততখানি সে বিরক্ত হল। মেয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। পলক পড়ে না। কৃষ্ণদাসী তার হাত ধরে টানলে: মর্—মর্—মর্। প্রণাম কর্। প্রণাম কর্।

মোহিনী চমকে উঠে তাড়াতাড়ি নতজানু হয়ে বসে মাথাটি লুটিয়ে দিলে।

কী যে হাবা মেয়ে! প্রণাম করতে গিয়ে আঁচল ছেড়ে দিয়েছে। পলাশফুলগুলি ঝরঝর করে পড়ে গেছে মাটিতে ছড়িয়ে।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় সেদিন সকাল থেকেই অনেক ভিড়। মাধবার্চনা শুরু আজ থেকে। এই শুক্লপক্ষ ষোলকলায় পরিপূর্ণ হওয়ার ক্ষণে মাটিতে চাঁদের উদয় হয়েছিল, আজ প্রেমদাস বাবাজীর মত সিদ্ধ সাধকের পাটে ভিড় হবে বইকি। প্রবীণ যাঁরা তাঁরা বলেন, প্রেমদাস বাবাজী যখন নামগান করতেন তখন বিগ্রহের আবেশ হত। প্রভুর কাঁধের উপর থেকে উত্তরীয় খসে খসে পড়ত; চোখের কোণ দুটি চিকচিক করে উঠত।

ইলামবাজার আর জয়বাজারের মাঝখানে খানিকটা উত্তরে অজয় থেকে কিছুটা দূরে এই বাবাজী-পল্লীটি। অধিকাংশই মাটির বাড়ি, খড়ের চাল, বাঁশের খুঁটি, মাটির মেঝে; চারিপাশ বাঁশঝাড়, নিম সজনে রাঙচিতের বেড়ার সঙ্গে জমিয়ে তুলে তারই বেড় দিয়ে ঘেরা; শান্ত নিস্তব্ধ পল্লীটি; কচিৎ কোলাহল কলরব শোনা যায়; মধ্যে মাঝে দু-চারটে উচ্চ কণ্ঠে ডাক শোনা যায়: আয়, আয়, আঃ—আঃ—অ মঙলী—! অর্থাৎ মঙলী গরুটিকে ডাকে। নয়তো শোনা যায়: অ—রে, অ, বে—জো—! বে-জো-রে—! অর্থাৎ অ ব্রজবল্লভ কি ব্রজদাস! কখনও কখনও রূঢ় কটু কণ্ঠস্বরে শোনা যায়: আরে ও হতচ্ছাড়া মুখপোড়া! উচ্চকণ্ঠের এই হাঁকডাকগুলি পাড়াটির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চারি পাশের আখড়াগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে; গাছগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, পত্রপল্লবে নাড়া জাগিয়ে অকস্মাৎ কুহু-কুহু শব্দ তুলে ত্রস্ত কোকিল উড়ে চলে যায়; কিংবা কা-কা শব্দ তুলে উড়ে যায় কাক। কখনও শোনা যায় গরুর হাম্বা রব—বাঁধা গাইটি তার দূরে-চলে-যাওয়া বাছুরটিকে ডাকছে। আখড়াগুলি সকাল থেকে নির্জনই থাকে; ভোরবেলা থেকেই বৈষ্ণব

বৈষ্ণবীরা খঞ্জনি একতারা গোপীযন্ত্র নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে ভিক্ষায় বের হয়; আখড়ায় থাকে শুধু বৃদ্ধেরা আর নিতান্ত যারা কিশোরী বা সদ্য-যুবতী তারা। বৃদ্ধেরা দাড়ির বিন্যাস করে আর গুন গুন করে গানের সুরে বিলাপ করে "ও হায় প্রেম করা আমার হল না।" যুবতীরা ঘরের পাট-কাম করে; কাঁথা সেলাই করে, চুড়া করে চুল বাঁধে, নাকে রসকলি আঁকে। মধ্যে মাঝে কোকিল বা পাপিয়াকে সুর করে তাদের ডাক ডেকে ভেঙায়—কু-উ! কু-উ! কু-উ! চোখ গেল! চোখ গেল! কখনও-সখনও আপন আখড়ায় আগড় বন্ধ করে পাশের আখড়ায় সখীর কাছে গিয়ে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখ তুলে বলে, শুনেছিস?

—কী?

—মা-জীর কথা?

—ডুলি এসেছিল তো?

—হ্যাঁ। সঙ্গে পাহারা।

—মরণ, তার আর শুনব কী?

—আমার কাছে শোন্। কান কাছে আন্।

কানে কানে সে কী বলে। শুনে এ সখী খিলখিল শব্দে হাসতে শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে যে বলে সেও শুরু করে। খিলখিল হাসির ঐকতানে চঞ্চল হয়ে ওঠে কুঞ্জগুলি। এই পর্বপার্বণের দিনে শুধু সকলেই তারা আখড়ায় থাকে; নিজেদের করণীয় নিয়মগুলি পালন করে। আজ প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ায় সকলেই প্রণাম করে অর্চনা করে মাধবার্চনা-গৌরাঙ্গার্চনার প্রথম দিনটি পালন করবে।

কৃষ্ণদাসী কপালে তিলক কেটে রেশমের ঝাড়া সুতোর তৈরী কেটের কাপড় পরে প্রভুর সেবায় নিজেকে মগ্ন করে দিয়েছে। আপন মনে স্তবগান করে চলেছে।

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় শচীনন্দন!

আর-সব কথা সে ভুলেই গিয়েছে। রাধারমণ সরকারের কথা, তার ছেলে অক্রূরের কথা—সব কথা। এখন শুধু সম্মুখে আছেন প্রভু। তিনি যেন জগৎ জুড়ে বসেছেন। সে মধ্যে মধ্যে কাঁদে। অনুতাপে নয়, অপূর্ণ কামনার জন্য নয়—এমনি কাঁদে। আপনি যেন কান্নার সাগর উথলে ওঠে। কতজন কত

কথা বলে। বলে, এ কী করে হয়? সে কৃষ্ণদাসী সেজে-গুজে গায়ে গন্ধ মেখে ডুলি চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে যায় নটীর মত গান গাইতে; শুধু দাস-সরকার হলেও কথা ছিল না, আরও দু-চারজন জমিদার-জোতদারের বাড়ি যায়, সে এমন করে কাঁদে কেমন করে?

কেমন করে কাঁদে সে কৃষ্ণদাসীও জানে না, কিন্তু সে কাঁদে। দুটো জীবন তার যেন দুটো আলাদা ঘরের মত। দুই ঘরের মধ্যে কোন যোগ নেই। অথবা দুটো আলাদা পাত্রে সে তরল পদার্থের মত আলাদা আকার ধারণ করে।

আজ কিন্তু মধ্যে মধ্যে তার সুর কেটে যাচ্ছে।

প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ওই সকালে দেখা নবীন গোসাঁইয়ের মুখ মনে পড়ছে। যেন গৌরের মুখের সঙ্গে ও-মুখের কোথাও মিল আছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগছে—কে? ও কে? এই নবীন গোসাঁই কোথা থেকে এল?

কথাটা শুধু নিজের মনের থেকেই নয়—বাইরে থেকেও বার বার এসে হাজির হল, যারা আখড়ায় প্রণাম করতে এল তারাও কথাটা তুলে দিয়ে গেল।

যারাই দেখেছে নৌকার উপর সূর্যপ্রণামরত এই নবীন সন্ন্যাসীকে, তাদের সকলের মুখেই ওই এক কথা—আহা, কী দেখলাম! মরি মরি মরি! কী রূপ, কী ছটা! কে? এ সন্ন্যাসী কে?

বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছলে, বললে, কোন্ মায়ের ঘর আঁধার করে বুক খালি করে পথে বেরিয়ে এল সোনার চাঁদ!

ওরই মধ্যে নিতাই দাস ভাবুক লোক—সাধন-ভজনে নিষ্ঠাবান মানুষ, সে বললে, মাকে না-কাঁদালে লীলা বুঝি হয় না, বুঝেছ না! রাম পিতৃসত্য পালনে বনে গেলেন—মা কৌশল্যা কাঁদলেন; গোবিন্দ মথুরা এলেন—মা যশোদার চোখের জলে মাটির পৃথিবী গলে গেল। গৌর আমার পথে বেরুলেন পাতকীতারণে—শচী-মা কেঁদে সারা। জয় গৌর! জয় গোবিন্দ!

বৈষ্ণবের আখড়ায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আলোচনা; ওদের জীবনে একটি তার—একতারাতে একটি সুরই বাজে, কথাবার্তা সেই সুরেই চলে।

তরুণী বৈষ্ণবীরা কানাকানি করে—নিতাই দাসকে অভিশাপ দিয়ে বললে,

মরণ, বুড়োর ভীমরতি হয়েছে। শ্রীমতীর কান্না মনে পড়ল না; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জলের কথা জিভ দিয়ে বেরুল না! মর্ বুড়ো, মর্।

কৃষ্ণদাসী কথা বললে না। শুধু কয়েকটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, আর প্রতিবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার পর মুখ তুলে উদাস দৃষ্টিতে সূর্যালোকিত আকাশের দিকে কিছুক্ষণের জন্য চেয়ে রইল। মেয়ে মোহিনী অবাক হয়ে শুনছিল কথাগুলি।

এমন সময় এল গোপীদাস বাবাজী। বিচিত্র মানুষ। বাউল বৈষ্ণবদের কাছে বিচিত্র নয়; কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে বিচিত্র। গোপীদাস মুখে মুখে পদ রচনা করে পথে পথে একতারা বাজিয়ে গেয়ে বেড়ায়। গাইতে গাইতেই সে এল—ওই সন্ন্যাসীর কথা নিয়েই গান।

—কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী?
দেখে তারে, মন কি করে, পরান উদাসী!
তার হাতে নাই বাঁশী, সেজেছে নতুন দেয়াশী—
তমালতলার ধুলা ঝেড়ে, আয় গো রাধে,—যাই দেখে আসি।

গানে গোপীদাস মাতন তুলে দিলে।

ভাল ক'রে দেখ্‌সে মিলায়ে—
সাজ বদলি দিস নে যেন যেতে ভুলায়ে—
যায় না ঢাকা বাঁকা নয়ন—মধুমাখা অধরের হাসি।

গানের শেষে গোপীদাস বললে, অজয়ের ঘাট, বাজার হাট—সব জুড়ে এই এক কথা মা-জী। কে? কে এল?

*　　　　*　　　　*

খবরটা নিয়ে এল শেষ পর্যন্ত 'কয়ো বোরেগী'। সে প্রায় সন্ধ্যাবেলায়। সারাটা দিনে তখন কৃষ্ণদাসী সন্ন্যাসীর কথা প্রায় বিস্মৃত হয়ে বসে আছে। শুধু কৃষ্ণদাসী কেন, বৈষ্ণব-পল্লীটিতেও তখন সন্ন্যাসীর আলোচনা, তাকে নিয়ে প্রশ্ন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কর্মময় সংসার, সেখানে প্রশ্ন মনে করে রাখবার অবকাশ কোথায়?

বৈষ্ণব-পল্লীতে গাই দুইবার সময় এল। উনুনে আঁচ পড়ল, রান্না চাপল; ফাল্গুন মাসের শেষ, চৈত্র কিস্তির খাজনার তাগিদ নিয়ে জমিদারের

পাইক এল ; দু-চারজন পাওনাদারও এল। এল জন-দুয়েক পেশোয়ারী পাঠান—গরম কাপড় মলিদা আলোয়ানের ব্যবসাদার ; ধারে গত বছর গায়ের কাপড় দিয়ে গেছে, তার টাকার তাগিদে।

—এ বাবাজী, এ কোকনদাস (খোকনদাস) বৈরাগী ! টাকা—টাকা—টাকা লাও। এ—

আরও এল দু-একজন ফেরিওয়ালা : কেঁ-টের কাপড় !

আরও এল দু-চারজন বিচিত্রচরিত্রের লোক। তিলক-ফোঁটা-কাটা লোক আখড়ায় বসে প্রবীণা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে গুজ-গুজ ফুস-ফুস কথা বললে। সে কথাগুলিও বিচিত্র।

মাধবার্চনার পক্ষারম্ভে পরকীয়া-সাধন করবেন এখানকার অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত ধার্মিক জনেরা। তারই সাধনসঙ্গিনী চাই। যোগাযোগ অবশ্য আগে থেকেই আছে, তবুও নিমন্ত্রণ এসেছে নূতন করে।

কৃষ্ণদাসীর বাড়িতেও লোক এসেছে। এখানকার মস্ত গদির মালিক রমণ সরকারের ওখান থেকে। পুজো নিয়ে লোক এসেছিল ; তারই সঙ্গে ইশারায় ডাকও এসেছে। সন্ধ্যার পরই ডুলি আসবে। এর পরই তার সারা মন ওই মুখে ফিরেছে ; যে-মন নিয়ে মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে ফিরে সেবায় নিযুক্ত ছিল, সেবা শেষ করতে সে-মন তৎপর হয়ে উঠল। বিগ্রহের ঘরের দরজা বন্ধ করে মন এসে বসল তার বিলাসের সাজঘরে। যে চোখ থেকে এতক্ষণ বিগ্রহের দিকে চেয়ে জল ঝরছিল, সেখানে চঞ্চল দৃষ্টি ফুটে উঠল। কৃষ্ণদাসীর মনে রাখবার অবকাশ কোথায় ?

মনে রেখেছিল শুধু মোহিনী। সারাটা দিনই ওই সন্ন্যাসীর ছবি তার মনে মনে ভেসে বেড়িয়েছে। অপরূপ সন্ন্যাসী ! আর কানের পাশে বেজেছে গোপীদাস বাবাজীর গান—

কে এল সই নবীন সন্ন্যাসী ?

তাই কয়ো বোরেগী আসতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলে মোহিনী। কয়ো অর্থে কাক ; কাককে এখানে 'কয়ো' বলে ; বোধ করি বা 'কউয়া' শব্দের বঙ্গজ রূপ। 'কয়ো বোরেগী' নাম নয়, আসল নাম একটা আছে, কিন্তু সে লোকে ভুলে গেছে। বাউণ্ডুলে গাঁজাখোর ভিক্ষুক। কিন্তু ভিক্ষে সে গৃহস্থের দোরে-

দোরে ঘুরে করে না, সে বেছে বেছে গিয়ে দাঁড়ায় এ অঞ্চলে যে বাড়িতে যেদিন কোন একটা সমারোহ থাকে সেদিন সেই বাড়িতে। সে শ্রাদ্ধই হোক আর গৃহশান্তিই হোক, অন্নপ্রাশন, বিবাহ বা ব্রত কি যা-কিছু হোক। ভিক্ষার ঝুলি তার আছে, কিন্তু সেটা পূর্ণ করার চেয়ে পেট পূর্ণ করে খেয়ে-দেয়েই সে অধিক তৃপ্ত। এ অঞ্চলে কোথায় কবে কোন্ সমারোহ সে সমাচার তার নখ-দর্পণে। সেই কারণে সে ভোর থাকতে উঠে বেরিয়ে পড়ে। হাঁটতে হয় হয়তো কোনদিন চার ক্রোশ পাঁচ ক্রোশ ; পথে যেখানে যত সমৃদ্ধ বাড়ি বা ঠাকুরবাড়ি আছে—সেখানে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে, জলপান খেয়ে, গাঁজায় দম দিয়ে আবার রওনা হয়। ঠাকুরবাড়িই সে বেশী পছন্দ করে ; কারণ সেখানে যা পায় তা মুড়ি-মুড়কি-পাটালিগুড় জলপান নয়, সে পায় বাল্যভোগের বা প্রভাতী-ভোগের প্রসাদ—ছোলাভিজে, বাতাসা, একটু ছানা, এক টুকরো আর-কিছু, কোন কোন মন্দিরে দুখানা পুরিও মিলে যায়। এ গুণগুলির সঙ্গে এ অঞ্চলের লোকে কাকের গুণের সঙ্গে যথেষ্ট মিল দেখতে পায়। আরও একটি গুণ আছে—কাকের প্রকৃতি ও গুণের সঙ্গে যার মিল নাকি প্রায় আধ্যাত্মিক। কাকেরাই নাকি বার্তা নিয়ে আসে সকলের আগে। ওরা অযাচিতভাবে বার্তা বহন করে এনে দিয়ে যায়। এটা নাকি কাকচরিত্র-পণ্ডিত যাঁরা তাঁদের মত। বাড়িতে কাক এসে বসে কলকল করে রব করলে বুঝতে হবে, বার্তা দিয়ে যাচ্ছে। আরও মিল আছে। কয়ো বোরেগীর গায়ের রঙ কালো, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং পা দুখানি কাকের পাখার মতই অশ্রান্ত ও দ্রুত। লোকে দেড় প্রহরে যে পথটা হাঁটে, কয়ো বোরেগী এক প্রহর না-যেতেই সে পথ চলে যায়। মধ্যে মধ্যে কয়ো কৃষ্ণদাসীর আখড়ায় এসে হাজির হয় এবং চেরা গলায় ডাকে—গৌর বলে কয়ো এসেছে মা-জী! এঁটো-কাঁটা যা আছে ছিটিয়ে দাও। জয় গৌর! নিতাই হে!

ওইটিই ওর সকলের দরজায় ভিক্ষার বুলি।

সেদিন সন্ধ্যার মুখ। কৃষ্ণদাসী তখন ব্যস্ত। ঘরের সকল কাজ সেরে নিয়েছে। প্রভুর আরতি হয়ে গিয়েছে। প্রস্তুত হচ্ছে সে সাধনরাত্রির জন্য। দেহ-মার্জনা আছে, প্রসাধন আছে। দুধের সর এবং ময়দা মুখে মেখে ধুয়ে-মুছে হলুদের-সূক্ষ্ম-চূর্ণ-বাঁধা মিহি কাপড়ের থুপনিটি মুখের উপর হালকাভাবে

বুলিয়ে নিয়ে রসকলি তিলক আঁকতে হবে। চুল বাঁধা আছে। রাধারমণ দাস-সরকার প্রৌঢ় বৈষ্ণব মানুষ, নটীর প্রসাধন বা সজ্জা তাঁর কাছে পলাণ্ডুর মতই অস্পৃশ্য অশুদ্ধ। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবী-বেশ না-হলে তিনি দোরগোড়া থেকেই ফিরিয়ে দেবেন। বৈষ্ণবীর বেশই তাকে এমন করে করতে হবে, যাতে সুর্মা-টিপ-ওড়না-চুড়ি-সমৃদ্ধ নটী বা তওয়াইফই-বেশকে হার মানাতে পারে। ব্যস্ততা সেই জন্য। কিন্তু কয়োর আহ্বান উপেক্ষা করা যায় না। কারণ কয়ো, কাকের মত তাড়ালেও যায় না। তাড়া দিলে কাকেরা উড়ে গিয়ে সরে বসে, মুহূর্ত পরে আবার আসে; কয়োও তাই, এখন তাড়ালে একটু পরই আবার ফিরে আসবে সে, এবং হাঁকবে: গৌর বলে কয়ো আবার এসেছে মা-জী। জয় গৌর! নিতাই হে!

একখানি মালপোয়া এবং মালসাভোগের কিছু একখানি পাতায় সাজিয়ে আলগোছে তার হাতে দিয়ে দাসী বললে, আজ আমার তাড়া আছে কয়ো, তুই অন্য কোথাও বসে খেগে যা।

কয়ো পাতাখানা সামনে পেতে নিয়ে বললে, কোথায় যাব? যেতে যেতে চিলে ছোঁ মারবে। ও-বেটাদের হাতে কয়োরও রেহাই নাই। কোথাও যাবে বুঝি?

কয়ো নির্বিকারভাবে প্রশ্ন করলে। ওর প্রশ্নে শ্লেষ নেই, ঘৃণাও নেই। কয়োর কুৎসা রটনার প্রবৃত্তিও নেই। ও শুধু শোনে, শুধু বলে। জেনে সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করে না বলে ও তা কাউকে করাতে চায় না।

—কোথায় যাব?—দাসী বললে, কত কাজ, সে আর তুই বুঝবি কী? সেই ভোর থেকে—

কথা কটা বলতে বলতেই চলে আসছিল কৃষ্ণদাসী, হঠাৎ পাশ থেকে মোহিনী প্রশ্ন করে বসল। সন্ন্যাসীর কথা কয়ো তো নিশ্চয় জানবে। সে বললে, হ্যাঁ কয়ো, জয়দেবের ঘাটে আজ কোন্ গোসাঁই মহান্ত এল? মস্ত বড় নৌকো। শিষ্যসেবক। এই উঁচু ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডাতে গড়ড় আঁকা। খুব ধুমধাম! কে সে কয়ো?

মেয়ের প্রশ্ন শুনে কৃষ্ণদাসীও ঘুরে দাঁড়াল। তারও মনে পড়ে গেছে।

কয়ো আগেই মালপোতে কামড় মেরেছিল। বিচিত্র কয়ো, বিচিত্র তার

খাওয়া। সে খেতে আরম্ভ করে উলটো দিক থেকে। শাক থেকে নয়—মিষ্টি থেকে। এঁটোকাঁটার খাওয়া তো, আগাগোড়াটা একসঙ্গেই পায়। তাই ওইভাবে খেতে অসুবিধাও নেই। জিজ্ঞেস করলে বলে, হাবজ-গাবজ ঘাস-পাতা খেয়ে পেট ভরে গিয়ে শেষে যদি ভাল জিনিস খাবার জায়গা না থাকে! এবং চিবোয় সে চোখ বুজে। মালপোয় কামড় মেরে চিবতে চিবতে সে ঘাড় নাড়তে লাগল, উঁ-হুঁ। উঁ-হুঁ।

—উঁহু কী? আমি নিজে চোখে দেখেছি।—কৃষ্ণদাসীর দেরি হয়ে যাচ্ছে; ভ্রূ কুঞ্চিত হল তার। একটু উচ্চস্বরেই সে বলে উঠল, আমি নিজে চোখে দেখেছি।

কয়ো কোঁত করে গ্রাসটা গিলে এবার বললে, হুঁ। সে জয়দেবে নয়।

—তবে কোথায়?

—কদমখণ্ডীর ঘাটের ওপারের ঘাটে।

—ওপারের ঘাটে? শ্যামরূপোর ঘাটে?

—হুঁ। রাজার ছেলে কালাপাহাড়। বলে, রাধা মানি না। জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয়, চামুণ্ডো। ঠাকুর এনেছে শুধু শ্যাম। ওই শ্যামরূপোর ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে। বোষ্টুমী গেলে ঝাঁটা মারবে।

কৃষ্ণদাসী অবাক হয়ে গেল। শ্যামরূপোর ভাঙা গড়ের এক পাশে মঠ বানাবে! ভাঙা মঠ জঙ্গলে ভর্তি, বুনো শুয়োর সাপ-খোপের আড়ত। মধ্যে মধ্যে বাঘ আসে। ভালুকের তো কথাই নেই। এই তো ভালুকের সময়। মৌ পেকেছে, মৌ খেতে আসবে। মৌ খেয়ে মাতাল হয়ে ধেই-ধেই করে নাচবে। সেইখানে মঠ করবে!

জয়পুরী বাবাজীদের চ্যালা নয়, চামুণ্ডো! রাজার ছেলে কালাপাহাড়! শুধু শ্যাম! রাধা নেই! কী আবোল-তাবোল বকছে কয়ো?

অধীর হয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, অ মুখপোড়া, তা চোখ খুলে কথা বল্ না কেন? এ সব আজগুবি কথা বললে কে তোকে?

কয়ো কিন্তু চোখ বুজেই খেতে খেতে বলে গেল, পাঁচজনে এক কথা দু কথা করে দশ কথা বললে—কয়ো শুনে এল। তুমি শুধাচ্ছ—বলছি। মস্ত বড় ঘরের ছেলে। হয় বামুন, নয় কায়স্থ। রাজা বাপের বেটা। খুব নাকি

পণ্ডিতও বটে। কাশীতে পড়ত। তাপরেতে সন্নেসী হয়ে যায়। বাপ মরে গেল, অনেক ধন। ভাইকে সর্বস্ব দিয়েছিল। এখন এই স্বকীয়াওলারা কাশীতে এলে পর জুটল তাদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গেই এ দেশে এয়েছিল চেলা হয়ে।—একটুকুন জল দেবা? গলাতে আঁটির মতন আটকায়—

চোখ খুলল কয়ো।

কৃষ্ণদাসী তখন চলে যাচ্ছে। পাঁচজনের মুখের উড়ো কথা! ও শুনতে কৃষ্ণদাসীর প্রবৃত্তি নেই। হ্যাঁ, কোন একটা লোকের মত লোকের কথা হত তো শুনত কৃষ্ণদাসী। উড়ো কথা আর ঝরা পাতা—ও দুইয়ে আগুন দিয়ে ছাই করে দিয়ো। উড়ো কথা সব মিথ্যে আর ঝরা পাতা আবর্জনা—দূর, দূর। কয়ো ডাকলে—মা-জী!

—মরণ! কী?

—জল!

—জল! বললাম, ঘাটে খেগে যা। আমার এখন হাতজোড়া।

—আমি দিচ্ছি মা।—মোহিনী বলে উঠল। ছুটে ভিতরে গিয়ে জলের ঘটি হাতে আবার বেরিয়ে এল সে।

কৃষ্ণদাসী ভুরু কুঁচকে বললে, তা বলে ছুঁস না যেন কয়োকে। যে আঁচলের ফেঁচা তোর, উড়ছে—উড়ছে—উড়ছে। পতাকার মত ফত-ফত করে উড়ছে। সামলাস আঁচল।

কৃষ্ণদাসী বাড়িয়ে বলে নি। পনর বছরের কিশোরী মোহিনী মনেও যেমন এখন অপরিপক্ক, দেহেও তেমনি অপরিপূর্ণ এবং অপটু। পনর বছরের কিশোরী মোহিনী এখনও হিলহিলে পাতলা; হাতের মুঠিতে কোমর ধরতে পারার কথা প্রচলিত আছে, কিশোরীকে দেখে তাই মনে হয়। কৃষ্ণদাসীর পাটের শাড়ি পরে পুজোর কাজ করে মোহিনী, কিন্তু সে কাপড় মোহিনী ভাল সামলাতে পারে না। আঁচল ঝলমলে হয়ে ঝুলে পড়ে, মাটিতে লুটোয়, বাতাসে ওড়ে; কখনও কখনও পায়ের সঙ্গে কাপড়ের প্রান্ত জড়িয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে। মায়ের সাবধান কিন্তু কয়োকে ছোঁয়াপড়ার ভয়ে। কয়ো সত্যি সত্যিই কয়ো অর্থাৎ কাক। খাদ্যের বাছবিচার নেই, ঘরেরও বিচার সে করে না; যার ঘরে ভাত আছে—সে ব্রাহ্মণই হোক আর

চণ্ডালই হোক, হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, ভিক্ষে সে তার ঘরেই করে। ওকে কি ছোঁয়া যায়!

কাপড় সামলে নিয়েই মোহিনী ঘটি হাতে কয়োর সামনে দাঁড়াল। কয়োকে মোহিনী ভালবাসে। মা না-থাকলে কয়োকে পেলে মোহিনীর সময়টা কাটে ভাল। সারা চাকলাটার খবর বলে কয়ো। শুধু খবর নয়, এ অঞ্চলের যত গল্প সব তার জানা। ওই ওপারের ইছাই ঘোষের দেউলের গল্প; শ্যামরূপার গড়ের গল্প; এপারে কালুডোমের ডাঙার গল্প— সব সে জানে। জয়দেবের গল্প অবশ্য সবারই জানা, কিন্তু এসব গল্প কজন জানে? তা ছাড়া দিল্লীতে বাদশা মারা গেলে কয়ো আগে খবর আনে। মুরশিদাবাদে কোন ফরমান জারি হলে, সে খবর সর্বাগ্রে জানতে পারে কয়ো।

মোহিনী এসে দাঁড়াল, কিন্তু কয়ো তখনও চোখ বুজে রয়েছে, চিবুচ্ছে। মোহিনী বললে, জল নে কয়ো।

—মোহিনী!—অঞ্জলি পাতলে কয়ো। খানিকটা খেয়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে ইশারা দিলে 'আর না।' তারপর আবার আরম্ভ করলে আহার। এবার নীরবে। কেষ্টদাসী নাই, কাকে বলবে! মালপোর শেষটুকু মুখে পুরে চোখ দুটি মুদ্রিত করলে। কিন্তু মোহিনী প্রশ্ন করলে, তারপর কয়ো?

—কী?—অস্পষ্ট কথার সঙ্গে ভুরু দুটি চকিতে ওপরে উঠে নীচে নামল, ঘাড়টি ঈষৎ তুলল। অস্পষ্ট কথা ইশারায় স্পষ্ট করে তোলে কয়ো। কথা তো তাকে খেতে খেতেই কইতে হয়।

—ওই যে সকালের গোঁসাইয়ের কথা! কোথাকার রাজার ছেলে?

—কে জানে? শুনলাম রাজার ছেলে।

—ঘরে পরিবার ছেলেপুলে আছে?

—তা আছে বইকি। উঁহু, নাই।—ঘাড় নাড়লে কয়ো: থাকলে ভাইকে রাজ্যি দেবে কেন?—একটু চুপ করে থেকে বললে, ছিল বোধ হয়, বোধ হয় মরে গিয়েছে সব।—আবার একটু চুপ করে থেকে বললে, ভাইটা ভাল। মঠ করবার জন্যে টাকাকড়ি অনেক দিয়েছে। সম্পত্তিও দেবে। শ্যামরূপোর গড়ের অংশ কিনেছে।

বলেই যায় কয়ো, জয়পুরী পণ্ডিতেরা নবদ্বীপে হার মেনে দস্তখত করে রাধারাণীর জয় দিয়ে জয়পুর ফিরে গেল। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। এ ছেলে নাম কাটিয়ে নিজেই মত বানিয়েছে, বুয়েচ!

বলে গেল অনেক কথা। শুনে এসেছে কেঁতুলীর মহান্তের মঠে।

কদমখণ্ডীর ঘাটে নেমে পুজো ভেট অবশ্য পাঠিয়েছে, কিন্তু নিজে দর্শন করতে যায় নি এই নবীন গোস্বামী। চূড়ার দিকে তাকিয়ে প্রণাম জানিয়ে শ্যামরূপার গড়ের ঘন অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কেন্দুলীর মহান্ত বলেছেন—অধামিক!

মহান্তের লোকজনেরা বলাবলি করেছে—লাগবে।

পাইকেরা লাঠি-সোঁটায় ভাল করে তেল মাখিয়েছে।

হঠাৎ থেমে গেল কয়ো। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে। বললে, দাও, আর-খানিক জল দাও। বেশী দিয়ো না। মাসলাভোগ প্যাটে গিয়ে জল পেয়ে গেঁজে উঠে ফাঁপবে। হুঁ, আর না। এই ঠাঁইটাতে দাও, হাত বুলিয়ে নিই। নইলে কাল এলে মা-জী ঝাঁ-ঝাঁ করে লাগবে—একেরে বাঘিনীর মতন।

মোহিনী বললে, তারপর কয়ো?

—আর জানি না।—কয়ো পাতাটা মুড়ে হাতে নিয়ে চলে গেল। কয়োর খাওয়া শেষ হয়েছে, আর কথা সে বলবে না। এবার হাত মুখ ধুয়ে কোথাও বসে আবার গাঁজা খাবে। তারপর শুয়ে পড়বে। তবুও আজ সে বেরিয়ে যাবার সময় বললে, দরজা-টরজা দাও বাপু। একলা থাকবে। কয়ো এরই মধ্যে বুঝতে পেরেছে যে, কৃষ্ণদাসী আজ বাইরে যাবে। তার কথাবার্তার স্বর থেকে তার গা ধোয়ার জন্য ব্যস্ততা থেকে সে বুঝে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনেও পড়েছে যে আজ ফাল্গুনের শুক্লা-প্রতিপদ। এবং এক সময় বাড়ির বাইরে কয়েকটা শব্দও পেয়েছে। বুঝতে তার বাকি থাকে নি যে, ওপাশে খিড়কির ডোবাটার চারিপাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও ডুলি নিয়ে বেহারারা এসে বসল। ওই ডুলিতেই কৃষ্ণদাসী যাবে দাস-সরকারের কুঞ্জে। মা চলে যাবে, মোহিনী একরকম একলা থাকবে।

অবশ্য ভয় এ-কালে তেমন কিছু নেই। নবাব জাফর কুলী খাঁর শাসনের

গুণে এ দেশে এখন বাঘে-বকরিতে এক ঘাটে জল খায়, বাজে-কবুতরে এক গাছের ডালে বসে জিরোয়। কাটোয়ার নায়েব ফৌজদার কুড়ালিয়া মহম্মদ জানের দাপটে চোর ডাকাত শীতের সাপের মত মুদ নিয়েছে।

তা ছাড়া, এই যে আখড়া, প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধপাট—এ হল লোহার বাসর-ঘরের চেয়েও নিরাপদ। এ জায়গা মহাপ্রভুর আদেশে দৈব বলে সুরক্ষিত। এখানে মন্দ অভিপ্রায়ে কেউ রাত্রে ঢুকলে আর বের হতে পারে না। ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই হয় রাত্রের মত অন্ধ হয়ে বসে থাকে অথবা পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে; সকাল হলে ধরা পড়ে যায়। অনেকে বলে, রাত্রে এই আখড়ার মধ্যে অবিরাম খড়মের আওয়াজ ওঠে। যিনি এই আখড়া রক্ষা করেন তিনি ঘুরে বেড়ান। এর উপর কৃষ্ণদাসী নিজে অনেক সিদ্ধবিদ্যা জানে। প্রেমদাসের বৈষ্ণবী আসামের মেয়ে ছিল। ডাকিনী বিদ্যা জানত। কৃষ্ণদাসীকে সে বিদ্যা সে দিয়ে গেছে। সাধনা করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পারে না, কিন্তু এ সব বিদ্যা দেওয়া যায়। কৃষ্ণদাসী ঘরবন্ধন জানে, অঙ্গবন্ধন জানে। যাবার আগে এক মুঠো সরষে হাতে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে আখড়ার চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে যাবে। ওই সরষে-গণ্ডি লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরষে হয়ে উঠবে এক এক সাপ, গণ্ডির ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। মন্ত্র পড়ে মোহিনীর অঙ্গবন্ধন করে দিয়ে যাবে। সেই অঙ্গ কেউ স্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে মরে যাবে।

মোহিনী চুপিচুপি বললে, তুই থাক্ না ভাই কয়ো।

—থাকব?—কয়ো অবশ্য কখনও কখনও থাকে, মোহিনীকে আগলায়। যতক্ষণ কৃষ্ণদাসী না আসে ততক্ষণ দাওয়ায় শুয়ে গল্প বলে, মোহিনী ঘরের ভিতর জানলার ধারে শুয়ে শোনে। কৃষ্ণদাসী চলে গেলে মোহিনী কয়োকে দরজা খুলে দেয়। কয়ো বাড়ি এসে ঢোকে। কয়োর বাড়ি ঢোকার কোন ব্যাঘাত হয় না। তার কারণ মোহিনীই যে ডাকে, আর কয়োর মনেও যে কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকে না। সুতরাং আখড়ার দেবতাও কোনদিন রুদ্র-মূর্তি ধরেন না, মন্ত্রপড়া সরষেও সাপ হয় না। কেন হবে? তবে কয়ো আভাস যেন পায়। মনে মনে প্রণাম করে বলে—আমার ধর্ম আমার ঠাঁই,

গোসাঁই তোমার ধর্ম তোমার ঠেঞে। মেয়েটা ভয় পেয়েছে একলা আছে, আমি ধর্মের মুখ চেয়ে এসেছি আগলাতে। ভয়টয় দেখিয়ো না, অধর্ম হবে।

* * *

কৃষ্ণদাসী দাস-সরকারের কুঞ্জে গিয়েই এই কথাটা জিজ্ঞাসা করলে—ওই সন্ন্যাসীর কথা। সকালে সন্ন্যাসী দেখার পর এসে দেবকার্যে নিযুক্ত করেছিল নিজেকে। ভুলে না-গেলেও সন্ন্যাসীর কথা ভাববার অবকাশ হয় নি; সুযোগ হয় নি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিল কথাটা। কিন্তু এই অভিসারে বের হবার পূর্ব-মুহূর্তে কয়োর কথায় তার কৌতূহল বিচিত্রভাবে প্রবলতর হয়ে উঠল।

মঠ করবে সন্ন্যাসী ওই শ্যামরূপার গড়ে?

রাজার ছেলে সন্ন্যাসী হয়েছে?

এই দুটো খবরই তার কৌতূহলকে দুর্দমনীয় করে তুলতে যথেষ্ট।

রাজার ছেলে সন্ন্যাসী! তাই এত রূপ! তাই এত গম্ভীর! অভিসার-যাত্রাপথের চঞ্চল মন একটু অধিকতর চঞ্চল হয়ে উঠল। দাস-সরকারের কুঞ্জে ঢুকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, আজ নতুন সন্ন্যাসী কে এল সরকার মশাই? সারা চাকলা চন-মন করে উঠেছে। ঘাটে মাঠে হাটে নাকি ওই ছাড়া কথা নেই? কয়ো বলে—রাজার ছেলে সন্ন্যাস নিয়ে এসেছে, শ্যামরূপার গড়ের মধ্যে মঠ করবে। মঠে নাকি শুধু শ্যামের পুজো! রাধার নাকি বনবাস! আমরা তো দূরের কথা, বোষ্টমী বৈরেগিনীদের ঝাড়ু মেরে তাড়াবে, আপনাদেরও নাকি মুখ দেখবে না!

সুন্দর সাজানো ঘরে বসে দাস-সরকার তামাক খাচ্ছিলেন। সুগন্ধি কাষ্ঠগড়ার তামাক। ধোঁয়ায় মিষ্টি গন্ধ ভুরভুর করছিল। রাঢ় অঞ্চলের মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল ঘর খড়িমাটি দিয়ে নিকানো; লম্বায় চওড়ায় বেশ বড় ঘর। দরজার পাশে মাথায় পটুয়ার তুলিতে আঁকা সুন্দর পদ্ম; কুলুঙ্গির মাথায় মাথায় ছোট ছোট আলপনা। এ ছাড়াও দেওয়ালগুলির ঠিক মাঝখানে ব্রজলীলার এক-একটি অধ্যায় বেশ বড় বড় করে আঁকা—মানভঞ্জন, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, দোললীলা। এ সবের মাঝখানে ঢুকেছে মুসলমানী আমলের লতাপাতা ফুল পাখি। মেঝেটি জমানো খোয়ার—উপরে পঙ্কচুনের

পালিশ। মেঝের উপর পুরু গালিচার ফরাস। গালিচার উপর কয়েকটি মখমলের তাকিয়া। দেওয়ালে শৌখিন দেওয়ালগিরিতে সামাদানের মধ্যে বাতি জ্বলছে। চার দেওয়ালে আটটি দেওয়ালগিরিতে জোড়া শামাদানে ষোল বাতির আলোয় ঘরখানি উজ্জ্বল। তার উপর খড়িমাটির কোমল শুভ্র লেপনের প্রতিফলন সে উজ্জ্বলতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। একদিকের দেওয়াল ঘেঁষে বড় একখানি গালিচার আসন। তার সামনে জ্বলছে বড় পিলসুজের উপর বড় একটি প্রদীপ। গন্ধে বোঝা যায় প্রদীপ তেলের নয়, ঘিয়ের। আর নামানো রয়েছে রূপার রেকাবিতে নানান উপকরণ। ফুলের মালা, ফুল, চন্দন, চুয়া, পান, একটি আতরদানও নামানো রয়েছে। দাস-সরকারের কাছে নামানো একখানি চমৎকার খোল। দাস-সরকার কৃষ্ণদাসীর কথায় মুখ তুলে চোখ মেলে তাকালেন। বেশ জোর করেই তাকাতে হল যেন। চোখ দুটি রাঙা হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। ওঠারই কথা। সন্ধ্যার মুখেই দুগ্ধ এবং সর-সহযোগে অহিফেন সেবন হয়েছে, তার উপর এই তামাক-ছিলিমটির অব্যবহিত পূর্বেই সেবন করেছেন সকাল থেকে গোলাপজল-ভিজানো ত্বরিতানন্দ একদফা। ত্বরিতানন্দ অর্থাৎ গাঁজা। কেউ কেউ তুরিয়ানন্দও বলে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের যবনিকা যেন ফাঁক হয়ে গেছে সরকারের চোখের সামনে। মৃদঙ্গ বাজিয়ে বিশ্বজগৎ নৃত্য করতে করতে চলেছে—অপ্সরীর মত রাসমঞ্চের চারিপাশের অষ্টসখীর মত, আর রাধারমণ সরকার যেন কেন্দ্রস্থ গোবিন্দের চরণপদ্মে স্থির ভ্রমরটির মত বসে আছেন।

ফরসির কাঠের নলটি ছেড়ে দিয়ে হেসে রমণ সরকার বললেন, সকালের সেই নবীন মহান্ত? দেখেছ না কি?

—দেখেছি। ভোরবেলা স্নানে গিয়েছিলাম যে!

—দেখেছ?

—হ্যাঁ। মরি মরি, রূপই বটে। লোকের পাগল হওয়ার দোষ নাই। রাজার ছেলে—

অকস্মাৎ রেগে উঠলেন দাস-সরকার। দাঁতে দাঁত টিপে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, রাজার ছেলে কৃষ্ণদাসী, ও রাজার ছেলে হলে আমিও জগৎশেঠ।

ওটা কামদেব হলে আমিও মহাদেব! বেটা পাষণ্ড! বেটা কালাপাহাড়! কয়ো ঠিক বলেছে—কালাপাহাড়ই বটে। রাধারাণীকে মানে না। বলে পরকীয়া-সাধন যদি ধর্ম হয় তবে অধর্ম কিসে! শ্যামের পাশ থেকে রাধারাণীকে সরাবে! বাঁশীর বদলে চক্র ধরাবে! আমাদের ঘেন্না করে! হুঁঃ, ওর ঘেন্নায় কী হয় কৃষ্ণদাসী? আমরা ওকে ঘেন্না করি। রাধে! রাধে! রাধে!

—তা হলে রাজার ছেলে নয়?

—পক্ষ থাকলেই পক্ষী হয় না কৃষ্ণদাসী। পক্ষীর আরও লক্ষণ আছে। না-হলে ফড়িংকে পক্ষী বলতে হয়। এ গোসাঁইয়ের পক্ষী-লক্ষণ সবই আছে, তবে সবই আকারে ছোট। অর্থাৎ চড়ুইয়ের জাত। বাজপক্ষী নয়। জয়পুরের রাজপুত্তুর ভাবছ; তা নয়। রাজা-টাজা নয়। জমিদার, বড় জমিদার। চটক—বুঝলে, যাকে বলে চড়ুই। বড় জোর শালিক বলতে পারে। গাঙ-শালিক। গাঙের ধারে বাড়ি। বোয়েচ কিনা?—সরকার কথা বলতে বলতে শান্ত হয়ে এলেন এতক্ষণে। রসিয়ে রসিয়ে শ্লেষ দিয়ে বলতে লাগলেন রসিকের মত।

রসিকের মত কথা বলতে গেলেই সরকার এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন আর মধ্যে মধ্যে বলেন 'বোয়েচ কিনা!'

—বোয়েচ কিনা, বড় জমিদার, উপাধি রায়চৌধুরী। জাতিতে ব্রাহ্মণ; বহুপূর্বে পূর্বপুরুষেরা ছিল শুধু বামুন পণ্ডিত। পাঠান আমলে গৌড়ের সুলতানদের কোন সুলতানের সুনজরে পড়ে যায়। অনুস্বার-বিসর্গের ছটা আর টিকি-নাড়ার ঘটা দেখে সুলতান খুশী হয়ে খেলাতের সঙ্গে মোটা ব্রহ্মত্রের সনদ দেন। কিন্তু খাগের যে কলমে তালপাতার ওপর ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায়—বোয়েচ কিনা দাসী, জীবন-জমিতে ব্রহ্মতত্ত্বের চাষ করা যায়, তা দিয়ে আসল জমির একটি ঢেলাও ওল্‌টানো যায় না। কাজেই ব্রহ্মত্রের জমি খাজনা-বিলি করে হন জোতদার। তারপর বোয়েচ কিনা, জোতদার থেকে জমিদার। শিষ্যসেবকদের পরলোকের কর্ণধার থেকে প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। দেবশর্মা থেকে রায়চৌধুরী। শাস্ত্র-পুরাণের পুঁথিগুলি খেরোর কাপড়ে বাঁধা হয়ে, কালস্রোতের ঠেলায় ভাঙা কূলের মাটি ঢলে

পড়ল। তার জায়গায় কাপড়ের মোটা মোটা দপ্তরে থোকা জমাওয়াশীল বাকীর কাগজ বিন্ধ্যপর্বতের মত বাড়তে লাগল। পুঁথিগুলি যদি একেবারে ফেলে দিত তো হত। ধুয়ে-মুছে যেত। বোয়েচ কিনা দাসী—তিত্ লাউ খাওয়া যায় না—গেরস্ত-বাড়িতে ও লাউ হলে তার ফল থেকে মূল পর্যন্ত ফেলে দেয়। কিন্তু বৈরাগীর আখড়ায় হলে কি সন্ন্যাসীর আশ্রমে হলে তারা বিষ্ণুমায়ায় ফেলতে পারে না; নতুন করে না-লাগলেও তিত্ লাউ কটি পাকিয়ে শিকেয় টাঙিয়ে রেখে দেয়। সোনারূপোর জলপাত্রও লাউয়ের খোলার কমণ্ডলুর মায়া ঘোচাতে পারে না। এও তাই আর কি! তাই থেকেই এ-বংশে মধ্যে মাঝে দু-চারজন পণ্ডিত জমিদারও ফড়কে বেরিয়েছে। দেশে এদের অনেক নাম কেষ্টদাসী। তবে ভক্তি-পথে পা বাড়ায় না, মেঠো পথের ধুলো-কাদার উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা, জ্ঞানমার্গের পাকা সড়কে হাঁটার উপরেই বংশটার ঝোঁক। বোয়েচ কিনা—দু-চারটে মহানাস্তিক জন্মেছে, আবার জনকয়েক দুঁদে জমিদার, পাকাপোক্ত ভোগীও জন্মেছে। এই ছেলের বাপ ছিল তেমনি একজন ভোগী। বিয়ে ছিল দুটি। দুটিই ছিল দুয়োরানী। সুয়োরানী ছিল এক যবনী রক্ষিতা। এ ছাড়াও নিত্য নতুন বাঈজী-বাঈয়ের অভাব ছিল না। আর একটি জিনিসের অভাব ছিল না, সেটি হল বিষয়বুদ্ধির। অনেক দিনের পুরনো বংশ, ডালপালা অনেক, সবার মধ্যেই এই একই ধরন; এই সুযোগে ইনি অধিকাংশ শরিকের সম্পত্তি নানান কৌশলে কিনে, আসল গুঁড়ির মত মোটা হয়ে উঠলেন। শরিকেরা শেষ প্যাঁচ মারলে, যবনী রক্ষিতার অপরাধে পতিত করবার ভয় দেখালে। ইনি হাসলেন, এবং গুরু ডেকে তিলক ফোঁটা কেটে মালা পরে নিজে বৈষ্ণব হলেন—সঙ্গে সঙ্গে ওই যবনীটিকে ভেক দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।

—বোয়েচ কিনা, কেষ্টদাসী! অল্পদামী জিনিস মেকী হয় কম। কী তার দাম যে মেকী হবে? মেকী হয় দামী জিনিস। আর যে জিনিসের যত মূল্য সে জিনিসের মেকী তত নিখুঁত। ধর্মের চেয়ে মূল্য আর কোন্ জিনিসের আছে বল? তাই এ সংসারে ধর্মের ভণ্ডামি আর আসল ধর্মাচরণ কষ্ট করে ধরা তত কঠিন, বোয়েচ!

চাদরের খুঁটে চোখ মুছলেন সরকার।—এই ধর, আমরা যে গোপন

ভজন করছি, এর অর্থ নিয়ে যত খুশী কুৎসা করা যায়। কিন্তু তিনি তো জানেন—। কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে কসরত-দক্ষ তরুণের শূন্যে লাফ মেরে ডিগবাজি খাওয়ার মত উপরের দিকে চোখ দুটি তুলে বিচিত্র কৌশলে উল্টে দিলেন।—বোয়েচ কিনা!

—বোয়েচ, এই ছেলেটি তাঁর বড় ছেলে। ছেলেটির মা গোঁড়া পণ্ডিত-বংশের মেয়ে।—বোয়েচ কিনা। একটা কথা বলতে ভুলেছি কেষ্টদাসী; সেটা কী জান, সেটা হল ওদের জাতের কথা। নিজেরা দেবশর্মা থেকে রায়চৌধুরী হয়েছিল, পুঁথিপেঁতে তাকে তুলে জমিদারী সেরেস্তার কাগজ নিয়ে পড়েছিল, এবং শামুকের খোলার নস্যের বদলে ফুরসির নল, চটি এবং তালপাতার বদলে নাগরা এবং রেশমী ছত্র গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্দরমহলে মা-লক্ষ্মীদের জাত বদল হতে দেয় নি; তাঁরা ছিলেন খাঁটী ব্রাহ্মণী। মেয়ে দিত বড়লোকের বাড়িতে, কিন্তু মেয়ে আনত গরিব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বাড়ি থেকে। ওটা ছিল ওদের সেই প্রথম যিনি জমির সনদ পেয়ে জোতদার হয়েছিলেন—তাঁর আজ্ঞা। সেটা ওদের ভাঙবার জো ছিল না, ভাঙলে অভিসম্পাতের ভয় ছিল। বোয়েচ কিনা;—বাজিকরেরা বলে শুনেছ তো—কার আজ্ঞে? না, কামরূপের মা-কামিক্ষের আজ্ঞে। এ তাই। এখন এ ছেলের মা ছিলেন—জাত-বামুন যাকে বলে—সেই ঘরের মেয়ে। বোয়েচ কিনা, যখন বিয়ে হয় তখন তো জামাই ছিল ছেলেমানুষ, মেয়ের বাপ বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝলেন তখন মেয়েকে বললেন—আমার লোভের পাপে তুই লক্ষ্মীর মত জলে পড়েছিস মা। তবে আমার লোভ হলেও, তোর কপাল বড়। তার ওপরেই তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি চললাম। আর কখনও আসব না। তোর কপাল তোর ওই ছেলে। বোয়েচ কিনা, ওই ছেলেকে তিনি ইচ্ছেমত মানুষ করেছিলেন। বাধা দেবার কেউ ছিল না। কর্তা তখন ওই যবনীকে নিয়ে বিলাসের আমিরী ঢঙ পালটে বৈষ্ণবী ভজনের মুখোশ পরেছিল; বাঁয়া-তবলার বদলে মৃদঙ্গ, ঘুঙুরের বদলে মন্দিরা বাজিয়ে গানবাজনার আসর চলে। ঘরে কদাচিৎ আসেন। সে এসেও বড় গিন্নীর ওদিক বড় মাড়ান না; ও-মেয়েকে বড় ভয় বা বড় ঘেন্না, যা হোক একটা কিছু করেন। বোয়েচ কিনা, এইভাবে ছেলে বড় হল; ঘোড়ায় চড়া শিখলে না, বন্দুক

তলোয়ার ছুঁলে না, বাবরী করে চুল রাখলে না ; শিখলে সংস্কৃত, কিছু ফার্সী পুঁথি নিয়ে পড়ে রইল, মাথার চুল ছাঁটলে বামুন-পণ্ডিতের মত। তারপর একদিন বাপকে গিয়ে বললে, কাশী যাব পড়তে।

বাপ বেশ ভাল করে ছেলের আপাদমস্তক তাকিয়ে দেখে বললেন, কাশী!

—হ্যাঁ, কাশী।

বাপ ভুরু কুঁচকে বললেন, তোমাদের তুই ভাইকে আমি মুরশিদাবাদ পাঠাব ঠিক করেছি। দিন-কতক দরবারে আমাদের মোক্তারের সঙ্গে যাবে-আসবে। নবাব বাহাদুরের সঙ্গে পরিচয় হবে। রাজকার্য কাকে বলে শিখবে। চালচলন তরিবত-সহবত কায়দাকানুনে দোরস্ত হবে। গানবাজনা শিখবে। এ সময় কাশী? তোমার মা কি বড়ই ধরেছেন? তা সে তো আমাকে বললেই পারতেন।

ছেলে যেন নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপ। বোয়েচ না, কেষ্টদাসী, ছেলে হাসলে না, কাশলে না, ভুরুও কোঁচকালে না, যেমন বলছিল তেমনি বলে গেল—মা যাবেন না। আমি যাব। পড়তে যাব। কাশীতে পড়ব ঠিক করেছি।

—পড়তে যাবে? কাশীতে পড়তে যাবে স্থির করেছ?

ছেলে, বোয়েচ না, বলে গেল—বেদান্ত পড়ব স্থির করেছি।

—বেদান্ত পড়ে তো পৈতৃক জমিদারি চালানো যাবে না!

ছেলে বললে, শুনেছি অনেক আগে আমাদের পিতৃপুরুষের বেদান্তের টোল ছিল।

বোয়েচ না, কেষ্টদাসী, এবার বাপের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ফরসির নলের অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ায় বিষম খেলেন তিনি। কাশতে কাশতে বুকে হাত বুলিয়ে স্থির হয়ে বললেন, তুমি টোল খুলবে নাকি?

ছেলে বললে, টোল তো আমাদের আছে; সেটা তো উঠিয়ে দেন নি কোনদিন; তবে আমরা অধ্যাপনা করি না, মাইনে-করা বৃত্তিভোগী পণ্ডিতেরা অধ্যাপনা করেন।

—তুমি তাই করবে নাকি?

—না, সে এখনও স্থির করি নি। বেদান্ত পড়ে, এ বংশের এতকালের কুলধর্ম-ভ্রষ্টতার প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য যা প্রয়োজন হবে তাই করব।

বাপ অনেকক্ষণ কথা কইতে পারলেন না। তারপর বললেন, তুমি হয়তো প্রহ্লাদ, কিন্তু আমি হিরণ্যকশিপু নই—আমাদের বংশও দৈত্যবংশ নয়। কৃষ্ণনাম করতে নিষেধ করব না। উৎসাহই দেব। যাও। কাশীই যাও। কিন্তু—। কিন্তু সেখানে থাকার ব্যবস্থাটা এ বংশের—। না, যেমন ইচ্ছা তেমনি থেকো। বারণ করব না।

ফুরসির নলে একটা সুখটান দিয়ে দাস-সরকার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে নলটি কেষ্টদাসীর হাতে দিয়ে বললেন, মজেছে ভাল। নাও, দেখ।

সলজ্জভাবে নলটি হাতে নিয়ে পাশে রেখে দাসী বললে, তার পর?

—তার পর? বোয়েচ না, এখন ধ্রুব তো তপস্যা করতে গেলেন কাশী। বোয়েচ না, এর বাবা বলেছিল—আমি হিরণ্যকশিপু নই। তা নয়। কিন্তু সুরুচি-মোহমুগ্ধ উত্তানপাদের সঙ্গে মিল পনের আনা। তাই ধ্রুব বলেছি এঁকে।

ধ্রুব কাশী গেলেন। কিছুদিন পর মা মারা গেলেন।

বছর চারেক পর খোদ কর্তা।

শ্রাদ্ধশান্তির পর সৎভাইকে সব ভার দিয়ে ফের চলে গেল কাশী। কী করবে এখনও স্থির করে নি। তবে জমিদারি নয়, এটা ঠিক। বেদান্ত-পড়া হয়েছে, কিন্তু ধাতস্থ হয় নি। তার কিছুদিন পরেই জয়পুরের মহারাজার ফতোয়া নিয়ে পণ্ডিতেরা এল কাশী।—সেই স্বকীয়-পরকীয়ার কাণ্ড গো!

জান তো ঔরংজীব বাদশার ভয়ে পাণ্ডারা গোবিন্দজীকে গোপীনাথকে জয়পুর পাঠিয়েছে। মদনমোহনকে পাঠায় করৌলী। সেও জয়পুরের মহারাজার বাস্তু। বাস্—

মহারাণা দ্বিতীয় জয়সিং তিন মূর্তির সেবার অধিকার পেয়ে বৈষ্ণবধর্মের অভিভাবক হয়ে উঠলেন; বোয়েচ না! তিনি এখন পরমভাগবত। হুঁ, লোকটার অনেক গুণ আছে, অনেক কীর্তি করেছে, কিন্তু আস্পর্ধা দেখ তো!

নড়ে-চড়ে বসলেন দাস-সরকার। এতক্ষণ নেশার ঝোঁকে এক নাগাড় ওই আগন্তুক সন্ন্যাসীর ঠিকুজী-কুলুজীর বিবরণ বলে এসেছেন উত্তেজনার বশে,

এবার নড়ে বসলেন। ফুরসিটা টেনে নিয়ে বারকতক টান দিয়ে বললেন, নিবে গেছে। ওরে বাবা কালীচরণ, দে তো একবার তামাক।

কৃষ্ণদাসী তালপাতার পাখা নিয়ে হাওয়া করছিল মৃদু মৃদু। সরকার ঘেমে উঠেছেন। শীত শ্রীপঞ্চমীর পর থেকেই বলতে গেলে নেই। শীতলাষষ্ঠীর পান্তাভাত কলাইসেদ্ধ শীতের অভাবে বেশ ভাল জমে নি। লেপ সহ্য হয় না। তার উপর ঘরখানার দরজা-জানলা বন্ধ। ভজন-কুঠুরি এর নাম। এ সব ঘরের দরজা-জানলা ছোট, এবং আঁটসাঁট করে বন্ধই থাকে। বন্ধ ঘরে ধূপশলাকার ধোঁয়া। এক নাগাড় এতক্ষণ বকেছেন স্থূলবপু দাস-সরকার। মুখে জাফরান-দেওয়া পান দাস-সরকারের, সুতরাং দাস-সরকারের ঘেমে ওঠা স্বাভাবিক। কৃষ্ণদাসীরও এমন ক্ষেত্রে পাখাখানি নিয়ে বাতাস করাই রীতিসম্মত। সাধনসম্মতও বটে।

দাস-সরকারের এতক্ষণে সেদিকে দৃষ্টি পড়ল। হাত বাড়িয়ে বললেন, দাও, দাও আমাকে দাও। তোমাকে কি বাতাস করতে হয়? দাও।

—না—না—না। আপনি এত কথা বলে ঘেমে উঠেছেন যে!

দাস-সরকার হাতের তর্জনী এবং অঙ্গুষ্ঠ এক করে মুদ্রা সহযোগে মৃদুস্বরে গান ধরে দিলেন—

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা—
সখি বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা!

—সখি, ওটা মদনানলে দহন-জ্বালার ঘাম। বাতাসে শীতল হওয়ার নয়।

কৃষ্ণদাসী ফিক্ করে হেসে বললে, হাকিমী দাওয়াই খেয়েছেন বুঝি? মরণ!

উত্তর একটা দিতে যাচ্ছিলেন দাস-সরকার, কিন্তু তার আগেই চাকর সাড়া দিল—কল্কে নিয়ে সে ঘরে ঢুকছে। সরকার সংযত হলেন। এটা দাস-সরকারেরা পারেন—চক্ষের পলকে ভোল পাল্টাতে পারেন। মুহূর্তে ভোল পাল্টে গেল সরকারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন জয়পুরের মহারানা সওয়াই জয়সিংহের উপর। বলতে লাগলেন, মরণ হলে তো বাঁচতাম কৃষ্ণদাসী। তুমিই বল—জয়পুরের মহারানা জয়সিংহের আস্পর্ধার কথা শুনে বাঁচতে ইচ্ছে হয়? ওঃ! বলে কিনা, রাধারাণী পরকীয়া বলে—! রাজা

হলেই মাথা কেনে তো! আর তারই বা দোষ কী দিই বল? বোয়েচ কিনা, ঔরংজীব বাদশা গোবিন্দজীর মন্দিরের চূড়া ভাঙলে, পাণ্ডারা ভয়ে গোবিন্দজীকে জয়পুরের মহারানার বাড়িতে তুলে দিলে। প্রভু নিজেই যখন আশ্রয় নিলেন, তখন সে বাতলাবে বইকি, বলবার আস্পর্ধা হবে বইকি যে—ঠাকুর, ওসব গোপিনী-টোপিনী নিয়ে তোমার রাস দোল ঝুলন করা হবে না।

কৃষ্ণদাসী সে বিবরণ জানে। সে তো বেশী দিনের কথা নয়, সে দিনের কথা। কৃষ্ণদাসী তখন কিশোরী। কৃষ্ণদাসীর শ্বশুর প্রেমদাস বাবাজী, স্বামী গোপালদাস তখন বেঁচে। জয়পুরের মহারানার পাঠানো পণ্ডিত কৃষ্ণদেব আসছেন—এই সংবাদে দেশময় বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গেল, গেল, সব গেল। রাধাই যদি যান তবে আর বৈষ্ণবধর্মের রইল কী? গোবিন্দ? হায় রে হায়, রাধা বাদ দিয়ে গোবিন্দ? জল বিনে মীন? বিজুলী বিনে মেঘ? রূপ ছাড়া রস? মহারানা জয়সিংহের এত বড় ঔদ্ধত্য গোবিন্দ সহ্য করবেন?

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

কীর্তিমান মহারানা 'সওয়াই' জয়সিং। গণিতে জ্যোতিষে পণ্ডিত লোক। জয়পুরে দিল্লীতে মথুরায় উজ্জয়িনীতে কাশীতে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংস্কৃত ভাষার অনুরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক, শাস্ত্রপরায়ণ এবং সত্যসন্ধানী। গোবিন্দজীকে জয়পুরে নিয়ে গিয়ে দেশের বৈষ্ণবাচার ও ধর্মের অবস্থার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। চিত্ত পীড়িত হল। বাংলা দেশে এবং বাংলা দেশের পরকীয়া-তত্ত্বের ব্যাখ্যায়, পূর্ণ চৈতন্যময় পুরুষের উপাসনায় এ কী বিকৃতি! এ যে ব্যভিচার!

পণ্ডিতদের নিয়ে তিনি বিচার করলেন। সমগ্র ভাগবতের প্রতিটি শ্লোক বিশ্লেষণ করে বিচার করে 'পরকীয়া' মতকে খণ্ডন করে তিনি 'স্বকীয়া' মতের প্রতিষ্ঠা চাইলেন। বহুবল্লভকে শুধু শ্রীবল্লভ হিসেবে দেখতে চাইলেন। গোপীজনমনোহারীকে রাধাপ্রেমপরায়ণতার কলঙ্কমুক্ত করবার সংকল্প করলেন। পরকীয়া রাধার স্থলে লক্ষ্মীকে দেখতে চাইলেন তাঁর পাশে। বহু সতর্ক বিচারের পর মত খাড়া হল। মহাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব হলেন সে মতের ধারক। বৈষ্ণবধর্মের সংস্কার হবে। প্রথমেই বিচার হল বঙ্গদেশীয়-মতাবলম্বী জয়পুরবাসী পণ্ডিতদের সঙ্গে। তাঁরা হার মানলেন। বিচারপত্রে স্বকীয়া মত স্বীকৃতির স্বাক্ষর দিলেন। তারপর মহারানা পণ্ডিত কৃষ্ণদেবকে পাঠালেন দিগ্বিজয়ে। মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সর্বাগ্রে জয় করতে হবে বঙ্গদেশ।

কলিতে বৈষ্ণবধর্মের মুরলী তার দ্বাপরের কেন্দ্র বৃন্দাবন ও যমুনাতট থেকে স্থান পরিবর্তন করে বঙ্গদেশে নবদ্বীপের গঙ্গাতটে এসে নূতন সুরে বেজেছে। আজু কে গো মুরলী বাজায়? এ তো কভু নহে শ্যামরায়! সে গৌরতনু,

বৃন্দাবনচন্দ্রের নব ভাব-বিগ্রহ। আবির্ভূত হলেন নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে। সকল শাস্ত্র সকল পাণ্ডিত্য অর্জন করে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের পরাভূত করেও অবশেষে একদা নিজেকে যেন বিদীর্ণ করে নবভাবে নিজেকে প্রকাশিত করলেন। যেন খনির কঠিন প্রস্তরময় দেহ দীর্ণ করে জ্যোতি বেরিয়ে এল; জ্ঞানতত্ত্বের ব্রহ্মকমণ্ডলু থেকে গঙ্গাস্রোতের মত উৎসারিত হল ভক্তি ও ভাবরসের সুরধুনী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পুরুষ সেই এক প্রেমময় পরমপুরুষ; ভজনা কর তাঁকে। উন্মত্ত ভাবাবেগে বের হলেন নবদ্বীপের নিমাই। নিমাই নয়, লোকে প্রত্যক্ষ দেখলে জীবন-চৈতন্যের বিশাল স্রোত। ভেসে গেল দেশ—ভেসে গেল জীবন। সেই নবভাবেই বৈষ্ণবধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে; নূতন গোমুখী—নবদ্বীপ; অথবা বলা যায় জহ্নু-মুনির আশ্রম। নূতন মহিমায় নির্গত হয়ে ভাবগঙ্গা প্লাবিত করে দিয়েছে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ। নবদ্বীপের শঙ্খ যদি এ স্রোতের আগে আগে না বাজে, বাংলা দেশ যদি এ মত স্বীকার না করে, তবে অপর সকল দেশ স্বীকার করা সত্ত্বেও এর অবস্থা হবে বঙ্গদেশের কীর্তিনাশার মত; নবদ্বীপের স্রোতই মহাপ্রভুর পুণ্যে ভাগীরথীর মহিমা বহন করবে।

মহারানা জয়সিংহ আচার্য কৃষ্ণদেবকে সর্বপ্রথম পাঠালেন বাংলা দেশে। সঙ্গে রক্ষক সিপাহী দিলেন; সুবায় সুবায় সুবাদার নবাবদের কাছে, রাজ্যে রাজ্যে রাজাদের কাছে অনুরোধপত্র পাঠালেন; সাহায্য প্রার্থনা জানিয়ে লিখলেন—"সঠিক ধর্মতত্ত্বের বিচার সর্বদেশে সর্বকালে সর্বলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য এবং এ বিষয়ে সাহায্য করা সকল রাজারই কর্তব্য, ও অপর সকল ধর্মেরও সহযোগিতা করা সকল ধর্মেরই অঙ্গীভূত। ধর্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত, সেই গুহার পথ আবিষ্কার, নির্ভুল দিঙ্‌দর্শন, বিচার ভিন্ন অর্থাৎ 'বিনা তজবিজে' হয় না। ধর্মের ভাণ্ডারে তছরুপ হইলে, আসলের বদলে মেকী চলিলে বেহেস্তের স্বর্গের ফটক বন্ধ হইয়া যায়; সেখানে মেকী সেলামী অচল; অথবা বেহেস্তের তোষাখানা মেকী মালে ভরিয়া উঠিলে দুনিয়া জাহান্নমে যায়। খোদাতয়লা ঈশ্বর রুষ্ট হইয়া উঠেন। সুতরাং হিসাবনিকাশে সাহায্য করিয়া নিজের ও দশের ধর্মের কল্যাণ অবশ্যই করিবেন।"

প্রয়াগে এসে বিচার হল। কৃষ্ণদেবের প্রতিভা জয়যুক্ত হল। পণ্ডিতেরা

স্বকীয়া মতে স্বাক্ষর দিলেন। সেখান থেকে স্থলপথ ছেড়ে নৌকা নিয়ে গঙ্গার স্রোত-পথে নবদ্বীপ যাত্রা করলেন। পথে কাশী—ভারতের সর্বমত সর্ববিদ্যার মহাকেন্দ্র। এখানেও বিচারসভা বসল। কাশীর গঙ্গার ঘাট—অতীত ভারতের সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যাপীঠ। এত বিচার, এত গবেষণা, এত দীক্ষা, এত উপলব্ধি, জ্ঞানে ধ্যানে এত আবিষ্কার পৃথিবীর আর বোধ করি কোথাও হয় নি। আচার্য কৃষ্ণদেব ঘাটে পূর্বাস্য হয়ে জাহ্নবীকে সম্মুখে রেখে আসন গ্রহণ করলেন, আশেপাশে বসল শিষ্যরা, আর তাঁর দক্ষিণে বামে—উত্তর ও দক্ষিণ মুখে বসলেন কাশীর বৈষ্ণবাচার্যেরা। দৃষ্টির সম্মুখে অনন্ত পুণ্যস্রোতা সুরধুনী। বিরাট ঘাট জনসমাগমে পূর্ণ, কিন্তু স্তব্ধ। শুধু গঙ্গাস্রোতের কলকল শব্দ উঠছিল।

বিচারে আপন মতকে জয়যুক্ত করে আচার্য কৃষ্ণদেব বৈষ্ণবাচার্যদের স্বাক্ষর নিয়ে উঠে গঙ্গার ঘাটে নেমে জল মাথায় দিয়ে উপরে উঠছেন—এক শ্যামবর্ণ কান্তিমান নবীন যুবক তাঁর সম্মুখে হাতজোড় করে দাঁড়াল। মুণ্ডিত মস্তক, মধ্যস্থলে সুপুষ্ট শিখাগুচ্ছ, কপালে তিলক, বুকের উপর দুলছে তুলসীর মালা। বললে, আপনার সঙ্গে আমি বঙ্গদেশ-বিজয়ে সঙ্গী হতে চাই।

আচার্য তার মুখের দিকে চেয়ে তার কান্তিতে মুগ্ধ হয়ে বললেন, এস। গ্রহণ করছি তোমাকে। দীক্ষা নাও আমার কাছে।

এই যুবকই এই নবীন সন্ন্যাসী। বুকে তার মায়ের সারা জীবনের বঞ্চনার বেদনা সঞ্চিত হয়ে রয়েছে—ভূমিকম্পের কঠিন চাপে প্রস্তরীভূত মৃত্তিকার স্তরের মত; তার উপর বনিয়াদ করে সে গড়ে তুলেছে তার সংকল্পের মন্দির। তার মা যাতে বেদনা পেয়েছেন, সারাটা জীবন ম্লানমুখী হয়ে কাটিয়েছেন, তার উচ্ছেদ সে করবেই। ধর্মের নামে জীবনের বিকৃতি প্রবৃত্তির এই ব্যভিচারকে সে জীবনপাত করে নির্মূল করবে। শাস্ত্রকে সে জেনেছে, অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি সে করেছে। মানুষের জীবনের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ হয়ে চলেছে অসৎ থেকে সতে, অশুদ্ধতা থেকে পরিশুদ্ধতায়। বিকৃত ব্যাখ্যায় তাকে অধোমুখী বিপরীতমুখী করার পাপ কখনও সহ্য হবে না। সমস্ত দেশ সমস্ত জাতি সব যাবে অনিবার্য ধ্বংসের পথে। বেণীমাধবের ধ্বজার দিকে, জ্ঞানবাপীর দিকে, বিশ্বনাথের পুরনো মন্দিরের দিকে সে তাকায়

আর সারা অন্তর তার ক্ষোভে বেদনায় টনটন করে ওঠে। বৃন্দাবন সে যায় নি, কিন্তু কল্পনায় সে দেখতে পায় বৃন্দাবনের ভাঙা মন্দির। তার মায়ের বেদনা আর এই বেদনা যেন এক হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে সে স্বপ্ন দেখে তার পূর্বপুরুষদের। তাঁরা যেন বলেন—আমাদের বংশের পাপেরই এই পরিণাম। ঘুম ভেঙে গিয়ে উঠে বসে সে। সারা রাত্রি আর ঘুম হয় না। দোষ সে ঔরংজীব বাদশা বা হিন্দুধর্মদ্বেষী বাদশাদের দেয় না। তারা তাদের ধর্ম-বিশ্বাসমত কাজ করেছে। ধর্মবিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয় তবে তার ফলভোগ তারা করবে। কিন্তু হিন্দুর এ দুর্ভোগ তার নিজের জীবনের কর্মফল। এ পাপ থেকে হিন্দুকে উদ্ধার পেতে হবে। এক-একদিন ইচ্ছা হয় একটা পতাকা হাতে করে সে বেরিয়ে পড়ে, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দ্বারকা থেকে মণিপুর পর্যন্ত চিৎকার করে ডাক দিয়ে বেড়ায়—জাগো, বিলাস ব্যভিচার থেকে জাগো। ওঠো। কিন্তু সাহস হয় নি। সে শক্তি কি তার আছে?

সেদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে আচার্য কৃষ্ণদেবের ক্ষুরধার যুক্তিতর্কের দীপ্তি দেখে বঙ্গদেশানুসারী বৈষ্ণব-পণ্ডিতদের অসহায় অবস্থা এবং পরাজয় দেখে তার অন্তরাত্মা বলে উঠল—এই তো, এই তো পেয়েছি নবগঙ্গার স্রোতোধারা, এরই সঙ্গে মিশিয়ে দিই আমার জীবনের স্রোতটুকু। প্রবলতর হোক স্রোত। পরকীয়া সাধনার খাতের মুখ বন্ধ হয়ে যাক; অথবা সে স্রোত অভিশপ্ত হোক কীর্তিনাশার মত।

আচার্য কৃষ্ণদেবের সাদর সম্ভাষণের উত্তরে সে হাত জোড় করে বললে, শুধু দীক্ষা নয়, আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করে এই সাধনাকে প্রচার করব আজীবন। এই আমার সংকল্প।

কৃষ্ণদেব বললেন, আমি সংসারী, আমি তো সন্ন্যাস দীক্ষা দিতে পারব না। আমার তো অধিকার নেই।

দৃঢ়কণ্ঠে নবীন ব্রহ্মচারী বললে, তা হলে দীক্ষা থাক্, আপনার কাছে আমি শাস্ত্রতত্ত্বে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছি। আমাকে শাস্ত্র-শিষ্য হিসাবেই গ্রহণ করুন। সঙ্গে নিন আমাকে। এই দিগ্বিজয়ের অভিযানে সামান্য কিছু করতে পারলেও জীবন সার্থক হবে আমার।

সস্নেহে তার হাত ধরলেন কৃষ্ণদেব।

*　　*　　*

নবাব জাফর কুলি খাঁ কঠোর শাসক; হিসাবনিকাশ, অর্থনীতিতে, ভূমি ও রাজস্ব-বিদ্যায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত; সেই রাজস্ব আদায়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর; বাংলার জমিদারদের ঔদ্ধত্য এবং অবাধ্যতা নিষ্ঠুর হাতে দমন করে রাজস্ব আদায় করেছিলেন। কিন্তু বিচারক হিসাবে ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। কৃষ্ণদেব তাঁর দরবারে এসে মহারানা সওয়াই জয়সিংহের অনুরোধ-পত্র পেশ করতেই তিনি সসম্মানে গ্রহণ করে বললেন, মহারানার অনুরোধ আমি আমার পালনীয় কর্তব্য বলেই গ্রহণ করছি। এ আমার অবশ্যকর্তব্য।

কৃষ্ণদেবকে বাসস্থান দিলেন। নবাবী ভাণ্ডার থেকে তাঁর সিধার ব্যবস্থা হল। নবাব জাফর কুলী খাঁ সুবে বাংলার ফৌজদারদের মারফত বৈষ্ণবধর্মের কুলপতি এবং সমাজপতিদের এই সিদ্ধান্তের বিচারে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ-পত্রের নামে পরওয়ানা পাঠালেন। শ্রীপাঠ নবদ্বীপ শান্তিপুর থেকে দিকে দিকে পত্র গেল। উড়িষ্যা পার হয়ে দক্ষিণে ত্রৈলঙ্গ দেশ পর্যন্ত গেল এর সাড়া। কয়েকজন ত্রৈলঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতও এসে উপস্থিত হলেন। বাংলা দেশেও পরকীয়া মতের বিরোধী—স্বকীয়া মতের সমর্থক পণ্ডিত যাঁরা ছিলেন তাঁরাও এসে উপস্থিত হলেন। দিনাজপুরের শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ এবং প্রাণনাথ রায় তাঁদের অগ্রণী। কৃষ্ণদেবের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা। নবদ্বীপের প্রধান আচার্য কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ত্রৈলঙ্গী বৈষ্ণব রামজয় বললেন, ভাল, বিচার হোক। জাফর কুলী খাঁ আদেশ দিলেন—দলিল লেখা হোক সর্বাগ্রে। দলিল লেখা হল। বাংলার বৈষ্ণবেরা লিখলেন—

> "আমরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতাবলম্বী, অতএব বিচারে যে ধর্ম স্থাই হয় তাহাই লইব। এই মত করার হইল বিচার মানিলাম তাহাতে পাতসাই শুভা শ্রীযুক্ত জাফর খাঁ সাহেব নিকট দরখাস্ত হইল তিঁহো কহিলেন ধর্মাধর্ম বিনা তজবিজ হয় না অতএব বিচার কবুল করিলেন সেই মত সভাসদ হইল শ্রীপাঠ নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য ও ত্রৈলঙ্গ দেশের

রামজয় বিদ্যালঙ্কার সোনার গ্রামের শ্রীরাম বিদ্যাভূষণ ও শ্রীলক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য গয়রহ শ্রীশ্রীকাশীর শ্রীহরানন্দ ব্রহ্মচারী ও নয়ানন্দ ভট্টাচার্য সাং মহুলা।"

জয়পুরের আচার্য কৃষ্ণদেব প্রসন্ন গাম্ভীর্যের সঙ্গেই বললেন, স্বীকার করছি। সাক্ষী মাথার উপর চন্দ্র সূর্য, সাক্ষী সম্মুখে সমাসীন মতোমন উল্ মূল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খাঁ নাসির জঙ্গ মুরশীদ কুলী খাঁ—সুবে বাংলার দণ্ডমুণ্ডের মালিক, ধর্মের রক্ষক, যিনি যুদ্ধে বীর, পরোপকারে মুক্তহস্ত, দানে হাতেম ও বিচারে নসেরুয়ার তুল্য। পরাজয় হলে আমি পরকীয়া-মতকে স্বীকার করে এঁদের গুরু বলে মেনে নিয়ে দীক্ষা নেবার প্রতিজ্ঞা করছি।

কৃষ্ণদেবের কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্যে বাগ্মিতায় চকিত হয়ে উঠল সভায় উপস্থিত আমীর-ওমরাহেরা। প্রদীপ্ত হয়ে উঠল তরুণ ব্রহ্মচারীর মুখ। আমীর-ওমরাহদের মধ্যে উপস্থিত ছিল তার জ্ঞাতিরা। কৃষ্ণদেব নিজের ধ্বজাটি দিলেন শিষ্যের হাতে। সে বহন করে নিয়ে গেল সেই ধ্বজা রাজসভা থেকে বিচারসভা পর্যন্ত।

বিচারসভা বসল মুরশিদাবাদে নয়। বসল মোকাম মালিহাটিতে। কাটোয়ার কাছে মালিহাটি। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস ঠাকুরের নাটমণ্ডপে, অগ্রবর্তী হয়ে বসলেন শ্রীনিবাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীরাধামোহন ঠাকুর। পাশে বসলেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের বংশধর। তাঁদের পাশে বসলেন বাংলার বৈষ্ণব আচার্যেরা।

এ পাশে কৃষ্ণদেব। পাশে শ্রীধর বিদ্যাবাগীশ। বাঁ দিকে তরুণ ব্রহ্মচারী। পাশে পুঁথির স্তূপ। যখন যে পুঁথির প্রয়োজন হয় যুগিয়ে দেয়। দ্রুত লেখনীতে লিখে যায় বিচারের যুক্তিতর্ক। বিচার চলল ছ মাস।

ছ মাস বিচারের পর একদিন আচার্য কৃষ্ণদেব স্তব্ধ হলেন। চোখ থেকে তাঁর জলের ধারা নেমে এসেছে। চৈতন্যস্বরূপ একমাত্র পুরুষের সে বিশ্ব-বিমোহন মূর্তি তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তি রাধার মত তাঁর বাঁশী শুনে পাগলিনী। বিরহে ব্যাকুল। সুখ নাই, সান্ত্বনা নাই, তৃপ্তি নাই, ওই মোহন বাঁশুরিয়াকে না পেলে সব শূন্য—সব শূন্য—সব শূন্য। সেই একমাত্র আপন। কিন্তু সে আপনার নয়, নিজস্ব নয়; বস্তুময়

সংসার শতবন্ধনে বেঁধে রেখেছে প্রাণরূপিণী নায়িকাকে ; তাঁকে অভিসার করতে হয় গোপনে বিপিনে, নিশীথ রাত্রে বর্ষণমুখর দুর্যোগের মধ্যে। ওদিকে বাঁশুরিয়ার বংশীধ্বনির আর বিরাম নাই। তিনিও ব্যাকুল। অধীর। প্রাণময়ী রাধা ছাড়া তাঁর লীলাব্যাকুলতার পরিতৃপ্তি কোথায় ?

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে ননু তে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্ ॥

কবিরাজ গোস্বামীর জয়দেবের পদাবলীর মধ্য দিয়ে পরকীয়া বৈষ্ণব ধর্ম-তত্ত্বের সেই আহ্বান—প্রাণ-রাধাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, তিনি তোমাকে ডাকছেন তোমাকে ডাকছেন। বাঁশী বাজে ওই শোন। তিনি তোমার বিরহব্যাকুল। কাল চলে যায়—শত বন্ধনে-বাঁধা-মানুষ, মিথ্যা অভিমানে অধীর মানুষ, রাত্রি যায়—আমার কথা রাখ, ওই পথে যাত্রা কর। তিনি তোমারই অনুরাগী, ওগো, শুধু তোমারই অনুরাগী।

"কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥"

জীবন এবং চৈতন্যস্বরূপের এই লীলা-মাধুরী পরকীয়া ভাবের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে সেই সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে। এই হল পরম সত্য। স্বকীয়া ভাবের মধ্যে এ রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হতে পারে নি বলে স্বয়ং লক্ষ্মীই রাধারূপে অবতীর্ণা হলেন।

রাধামোহন ঠাকুর রাধা-তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করলেন: আচার্য কৃষ্ণদেব, একদা বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী নিজে বললেন—প্রভু, আমি তো তোমার সর্বেশ্বরী, তোমার পরম সান্নিধ্যে অহরহ আমার অবস্থান। আমাকে ধারণের জন্য তোমার ওই বক্ষস্থল উন্মুক্ত প্রসারিত। কিন্তু কই, এই পাওয়ার মধ্যে তো পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাচ্ছি না !

চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষ বললেন—দেবী, তুমি আমার পত্নীত্বের অধিকারে মহারাজ্ঞীর মত আমার উপর অধিকারে প্রতিষ্ঠিতা। পাওয়ার জন্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রমের দুঃখ নাই, অসাধ্য সাধনের আকুল আবেগ নাই, হারানোর ভয় নাই, হারিয়ে তার জন্য অনন্ত বেদনা নাই। দুঃখের আস্বাদন নাই, তাই সুখের মিষ্টত্বের উপলব্ধি নাই ; চোখের জল ঝরে না, তাই হাসির মধ্যে

প্রাণ প্রকাশ পায় না। তোমাকে সেই রস আমি আস্বাদন করাব। তুমি জন্মাবে রাধা হয়ে, আমি জন্মাব কৃষ্ণরূপে। পরকীয়া ভাবের মধ্যে পূর্ণ প্রকাশ হবে লীলারসের।

এর আগে ঋগ্বেদ অথর্ববেদ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ভাগবত থেকে বিভিন্ন পুরাণ এবং কাব্য থেকে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করে বিচার হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কৃষ্ণদেব বিচলিত হন নি। এবার তিনি বিচলিত নয়, যেন বিগলিত হয়ে গেলেন। কাঁদলেন তিনি। নিজে যেন বাঁশী শুনতে পেলেন।

কৃষ্ণদেব অশ্রুবিগলিত চোখ তুলেই তাকালেন সূর্যের দিকে, বললেন— হে দেবতা, তোমাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। তুমি সাক্ষী, আমি পরাভূত হয়েছি। এ পরাভব আমার ভ্রান্তি নিরসন। তোমাকে সাক্ষী করেই আমি আচার্য রাধামোহন ঠাকুরকে অজয়পত্র লিখে দিয়ে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করছি।

লেখা হল অজয়পত্র।—

> "শ্রীযুক্ত সেওার জয়সিংহ মহারাজার সেখান হইতে স্বকীয় ধর্ম্মের পরওানা লইয়া গৌরমণ্ডলে স্বকীয় ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত পাতশাহার হুকুম মত তৈলাতী লোক সঙ্গে করিয়া গৌরমণ্ডলে সর্ব্বশুদ্ধা স্বকীয়সিদ্ধান্তের জয়পত্র লইয়া আসিয়াছিলাম। নালিহাটী মোকামে তোমার নিকট স্বকীয় পরকীয় ধর্ম্মবিচার অনেক মত করিলাম এবং শ্রীমৎভাগবত এবং পুরাণ এবং শ্রীশ্রী৺গোস্বামীদিগের ভক্তিশাস্ত্র লইয়া সিদ্ধান্তমতে স্বকীয় ধর্ম্মের স্থাপন হইল না। ইহাতে পরাভূত হইয়া অজয়পত্র লিখিয়া দিলাম এবং শিষ্য হইলাম।"

কাটোয়ায় গঙ্গার যে ঘাটে মহাপ্রভু মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন সেই ঘাটে এসে সশিষ্য কৃষ্ণদেব পরকীয়া বৈষ্ণবতত্ত্বের যুগলমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এবং নিজের দীক্ষান্তে নিজের শিষ্যদের নবমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। শিষ্যরা একে একে দীক্ষা গ্রহণ করলেন; কিন্তু কই, সে নবীন ব্রহ্মচারী কই? কই? নবীন ব্রহ্মচারী নেই। নিঃশব্দে কাউকে কিছু না বলে নবীন ব্রহ্মচারী স্থানত্যাগ করেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কৃষ্ণদেব।

চারিদিকে তখন জয়ধ্বনি উঠেছে। সংকীর্তন হচ্ছে।

রাধাগোবিন্দ জয় রাধাগোবিন্দ!

জয় চৈতন্ত নিত্যানন্দ! জয় বঙ্গদেশ! 'ডাণ্ডা গাড়া গেল'। ঝাণ্ডা—জয়পতাকা প্রতিষ্ঠিত হল।

*　　*　　*

এ সব কথা কৃষ্ণদাসী জানে। তবে এই নবীন সন্ন্যাসী যে সেই গাজনের দলছাড়া গোঁসাই তা জানত না। হেসে সরকার গাঁজার কল্কেটি মুখে তুলতে গিয়ে নামালেন। এর মধ্যে আর একবার ত্বরিতানন্দের তৃষ্ণা অনুভব করেছেন। রজনী গভীর হয়ে আসছে। পরকীয়া-রসতৃষ্ণাকে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করে তুলতে চাইছেন, কিন্তু মন এবং দেহ যেন বীণার তারের সুরের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের সুরের এক হয়ে মিলে যাওয়ার মত মিলছে না। তাই আর একবার গঞ্জিকা সেবন করে প্রৌঢ় বয়সের মেদবহুল স্থূল দেহের স্নায়ুকে চড়া সুরে টেনে বেঁধে উদগ্র তৃষ্ণাতুর মনের কড়া তারের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে চাইলেন। চৈতন্যস্বরূপ পরমপুরুষ মানস বৃন্দাবন বিকৃত জীবনে নিতান্তই অলীক হয়ে গেছে।

কল্কেটি নামিয়ে সরকার বললেন, গাজনের দলছাড়া গোসাঁই নয় সখী, এটা নিতান্তই গোয়ালছাড়া সেই গরুটা যেটা নাকি কানে কালা, যেটা নাকি ঘাসের টানেই ছুটে বেড়ায়, বংশীধ্বনি দূরের কথা বলভদ্রের শিঙের শব্দও কানে পৌঁছয় না। ওটা একান্ত ভাবে বাঘের হাতে অকালে মরবে অথবা কোনও কসাইয়ের হাতে আড়াই পেঁচে জবেহ হবে।

নিজের রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে নিজেই একদফা খিক-খিক শব্দে হেসে সারা হলেন দাস-সরকার, তারপর হস্তবদ্ধ গঞ্জিকার কল্কেটি তুলে বারকয়েক ফুস্ ফুস্ করে টেনে শেষবারে সজোরে টান মেরে কল্কেটি দাসীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে দম ধরে বসে রইলেন। দাসী টানতে লাগল কল্কে। চিত্ত বিকৃত না হলে ব্যভিচার উল্লসিত হয় না। তারও নেশার প্রয়োজন হয়। দমটা ছেড়ে আবার বললেন দাস-সরকার, সেই কাটোয়ার ঘাট থেকে ভেগেছিলেন মহাগরুটি। কত খোঁয়াড় ঘুরে আবার দেখা দিয়েছেন। এবার আরও এককাঠি চড়ে এসেছেন গো। ছিলেন ষাঁড়,

হয়েছেন ধর্মের ষাঁড়। সন্ন্যাসী হয়েছেন। কেউ বলে গুরু মিলেছে, সন্ন্যাসী গুরু। কেউ বলে, গুরু-টুরুর ধারই ধারেন না, নিজেই স্বয়ম্ভু। বুদ্ধের মত নিজেই নিজের গুরু। এবার পরকীয়া তো পরকীয়া, স্বকীয়াও নয়; কড়াকিয়া কাঠাকিয়া সেরকিয়া সব বরবাদ, ও ধারাপাতই বাদ। একের পর দুই নেই। শুধু শ্যাম। বোয়েচ না! জয়পুর থেকে মূর্তি গড়িয়ে এনেছে শুনছি। ভাইয়ের কাছে গিয়েছিল। ভাইটা ভাল। বিষয়ের বদলে মোটা টাকা দিয়েছে। শ্যামরূপোর গড়ের অংশ কিনেছে। সেইখানে মঠ করে শুধু শ্যামের তপস্যা হবে। এই মাধবপক্ষে প্রতিষ্ঠা হবে। উনি হলেন তিনি। লগন-চাঁদা। রাধা বাদ দিয়ে শ্যাম, রূপ বাদ দিয়ে রস, বোয়েচ দাসী—সে রস বানায় ময়রারা; ওটা বামুন নয়, সাধকও নয়, সন্ন্যেসীও নয়, ওটা ময়রা। কিন্তু!—লাল চোখ মেলে দাসীর মুখের দিকে চাইলেন দাস-সরকার।

—কী?—হাসলে দাসী।

—তোমার এত খোঁজ? লক্ষণ তো ভাল নয় কেষ্টদাসী। কী বলে, তোমার বুকের মধ্যে প্রাণ-ভোমরার যেন গুনগুনানি শুনছি সখী?—খিক-খিক করে হাসতে লাগলেন দাস-সরকার।

—এতও জানেন আপনি! কী গুনগুনানি?—কটাক্ষ হেনে দাসীও মুচকি হাসল।

হাতখানির আঙুলে মুদ্রা করে দাসীর মুখের সামনে ধরে সরকার যথাসাধ্য সুরে গাইলেন—

"সখি রে—মুঞি কেন গে'লু কালিন্দীর জলে।
কালিয়া নাগর চিত হরি নিল ছ—লে।
রূপের সাগরে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গে—ল॥"

দাসী চতুরা নায়িকা। সে কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উদাস ভাবে বললে, তাই তো হয়। পুরুষেরা তাই চিরকাল বলে। অথচ—

—অথচ কী?

—আমাদের এক কথা সরকার মশায়; আমাদের জীবন দিলে আর ফেরে না। ফাঁসি লাগে। সঙ্গে সঙ্গে সেও সুরে গান ধরে—

তোমারই চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি !

দাস-সরকারের চোখ দিয়ে জল পড়ে না, কিন্তু পিট-পিট করে। দাসী কয়েক কলি গাইতে গাইতেই সরকার ঘন ঘন চোখ মোছেন, এবং সেই ঘর্ষণে বাধ্য হয়ে জল আসে। এবং বার বার বলেন, রাধে—রাধে—রাধে ! জয় রাধে, জয় রাধে !

বাইরে মধ্যরাত্রির ঘোষণা করছে শৃগালেরা। প্যাঁচা ডাকছে বাড়ির পাশের আম-কাঠালের বাগানের গাছের কোটরে। বন্দরের ঘাটে মত্তপের স্খলিত কণ্ঠের গান টুকরো-টুকরো ভেসে আসছে সত্ত-আগত দক্ষিণা বাতাসে। অজয়ের ওপারে শালবনে ফেউ ডাকছে। চিতাবাঘ বেরিয়েছে বোধ হয়।

দাসী বলে, রাত্রি অনেক হল সরকার মশায়। মোহিনী একলা আছে।

হেসে সরকার বলেন, তোমার ঘরবন্ধন মন্ত্রের গণ্ডী পার হবে কে ? ভয় কেন এত ? আখড়ার মধ্যে তো যমের অধিকার নেই কৃষ্ণদাসী। তার উপর যে পাহারা রয়েছে কেলে সর্দার, কোন ভাবনা নেই।

কৃষ্ণদাসী চমকে উঠল। কেলে সর্দারকে পাহারা রেখেছে ? কে রেখেছে ? অক্রূর ? কেন ? ভুরু দুটি তার কুঁচকে উঠল। বললে, কেলে সর্দারকে পাঠিয়েছে অক্রূর, মোহিনীকে আগলাতে, না, আমাদের উপর নজর রাখতে ?

—না না না। অক্রূর পাঠায় নি। দিব্যি করে বলছি। সে বেটার মোহিনীকে মনে ধরেছে, কিন্তু মনের টান ওই সব বুনো জাতের মেয়েদের উপর বেশী। পাঠিয়েছি আমি কৃষ্ণদাসী। তোমার মন্ত্র-তন্ত্র আখড়ার মহিমা—সবই জানি। তবু বোয়েচ না, এমন একটা লোক পাহারা দিলে অনেক নিশ্চিন্তি। বেটাকে বলেছি তিনজন শাকরেদ নিয়ে গাছের উপর চড়ে বসে থাকবে। আর বোয়েচ কিনা, তুমি এসেছ আমার কুঞ্জে, এ সময় আখড়ায় কিছু ঘটলে দুঃখ তুমি পাবে, কিন্তু আমার যে অপবাদের সীমা থাকবে না গো ! রাধে রাধে—এ যে আমার কর্তব্য সখি !

কৃষ্ণদাসী শান্ত হল। শান্ত স্বরেই বললে, আমাকে বলে রাখলেই হত।

—হত। কিন্তু আমার নিজের কি জোর নেই তোমার উপর কৃষ্ণদাসী ?

শুধু তুমি নও—মোহিনী—! সেও তো ধর গা মেয়ে—আমার ছেলের সাধন-সঙ্গিনী হবে! না কি?

কৃষ্ণদাসী চুপ করে রইল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল অক্রুরের কুৎসিত চেহারাখানা।

সরকার প্রশ্ন করলেন এবার, কত বয়স হল মোহিনীর?

—এই পনের।

—তবে আর কি! গর্ভ ধরে যোল করে ক্রিয়াটা করে ফেল। ছেলেটা বড় বে-বগ্‌গা হয়ে উঠছে। ওকে আর রাখতে পারছি না। বোয়েচ না, কোন্ দিন কোন্ যবনী নটীর খপ্পরে পড়বে!

—না না। এখনও—

—না নয়। আমি অনেক অর্থ দিয়েছি। দিয়েও যাচ্ছি। আমার ছেলের নজরের কথা যদি লোকে না-জানত কেষ্টদাসী, তা হলে এতদিন তোমার মন্তর-তন্তর তোমার আখড়ার ঠাকুরের ভয় এ সব অগ্রাহ্যি করে অনেক ধাক্কা তোমার দরজায় পড়ত। বোয়েচ না? এখন আমার ছেলে নটীপাড়ায় ইতর লোকের হাতে ধরা পড়লে, বোয়েচ না, আমার মাথা হেঁট হবে। তা ছাড়া পাপ স্পর্শ করবে।

পুষ্পমাল্য, চন্দন, চুয়া, গুয়াপান ইত্যাদি উপকরণে সাজানো থালাখানি আসরের সামনে নামিয়ে দিল কেষ্টদাসী। কুঞ্জভঙ্গের ইশারা এটি। বললে, নটীরাও তো কিছু প্রত্যাশা করে আপনার ছেলের কাছ থেকে! আমার মেয়ের মনটা এখনও বড় কাঁচা সরকার মশায়। এ সব বললে বড় লজ্জা পায়। এখন কিছুদিন যাক।

বেশ শক্ত ভাবেই ঘাড় নাড়লে সে। অক্রূরের বীভৎস মূর্তিটা যেন তার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কুকুর-দাঁত দুটো বের করে হাসছে। শুধু কদাকার নয়, তার উপরেও কিছু।

শ্বাপদের মত হিংস্র দেখায় তার ওই প্রকট শ্বাদন্তের জন্য। বন্য জাতের মেয়েদের উপর তার আসক্তিও তাদের বন্য দেহোন্মত্ততার জন্যই শুধু নয়, কৃষ্ণদাসী শুনেছে ওই মেয়েগুলোর সঙ্গে সমানে সে তাদের রান্না-করা মাংস গেলে গোগ্রাসে। তাদের সঙ্গে তাদের তৈরী দেশী পচাই মদ্য পান

করে। আহার করে শূকরের মত। ভালুকের মত রোমশ দেহ। কর্কশ স্থূল। রসিকতায় কৌতুকে মুখখানায় মুহূর্তে যেন বানরের মুখের সাদৃশ্য ফুটে ওঠে। চিৎকার করে গর্দভের মত। কিন্তু ক্রোধে সে বাঘের মত ভয়ঙ্কর।

এই সরকারেরই তো ছেলে! সরকার যখন তাকে প্রথম তার এই ঘরে সাধনের নামে এনে তার জীবনটাকে মহিষের স্নানে পঙ্কিল পল্বলের মত করে তুলেছিল, সে স্মৃতি তার মনে আছে। আজ তার সব সয়ে গেছে। কিন্তু মোহিনীর বোধ করি তা সহ্য হবে না। ছেলেটা বাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। তার মেয়ে তার চেয়েও কোমল। সে হয়তো প্রথম দিনেই শুকিয়ে যাবে। মরে যাবে মোহিনী।

দৃঢ়ভাবে ঘাড় নেড়ে কৃষ্ণদাসী বললে, না। তা হয় না সরকার মশায়। আমি স্বপ্ন দেখি। প্রায় স্বপ্ন দেখি। আমার শ্বশুরকে দেখি। তিনি শাসান। বলেন—অনিয়মে ফেটে মরে যাবে মেয়ে। আর যে সে অনিয়ম করবে, তার সর্পাঘাত হবে।

দাসী জানে সাপকে সরকারের বড় ভয়।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

অজয়তটে কেন্দুবিল্বের কদমখণ্ডীর ঘাট ইতিহাস-বিখ্যাত—বিখ্যাত, শাস্ত্রমতে পুণ্যমহিমায় মহিমান্বিত। কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়নদস্নানে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য। কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব প্রভু এবং কবিপ্রিয়া পদ্মাবতী এই ঘাটেই নিত্য স্নান করতেন। প্রবাদ, কবিরাজ গোস্বামীর প্রার্থনায় মা-গঙ্গা উজান বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে আবির্ভূতা হতেন। গল্প আছে, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, অর্থাৎ পৌষ মাসের শেষ দিনে জয়দেব গোস্বামী গঙ্গাস্নানে যেতেন। একবার ঘটনাচক্রে যাওয়া ঘটে নি। যাওয়া না-ঘটায় কবিরাজ গোস্বামীর ক্ষোভের আর শেষ ছিল না। সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে চোখের জল ফেলে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন। শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলেন দেবী-জাহ্নবীকে। মকরবাহিনী হেসে বলেছিলেন—ক্ষোভ দূর কর; তুমি যেতে পারলে না যখন, তখন আমি আসব অজয়ের স্রোত বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে। তোমার স্পর্শে আমি ধন্য হব। ঘুম ভেঙে কবির আর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। মনের মধ্যে সে এক প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। এ কি স্বপ্ন? না, সত্যই দেবীর প্রত্যাদেশ? কী করে বুঝবেন? সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে গোস্বামী কদমখণ্ডীর ঘাটে গিয়ে উপনীত হতেই ঘাটের সম্মুখে অজয়ের জলধারা থেকে দিব্য-মণিময়-কঙ্কণ-পরা দুখানি অমলধবল বর্ণাভ হাত বেরিয়ে ঊর্ধ্বে উঠেছিল—কবিকে সংকেত জানিয়েছিলেন, আমি এসেছি। অন্য প্রবাদে বলে, গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল থেকে সেদিন গঙ্গার জল উজানে অজয়ের খাত বেয়ে কদমখণ্ডীর ঘাটে এসে আছাড় খেয়ে পড়েছিল। এবং সেই অবধি কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়-জলে স্নানে গঙ্গাস্নানের

পুণ্য হয় বলে লোকের বিশ্বাস। সে বিশ্বাস আজও এই বিংশ শতাব্দীতে যায় নি। আজও উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে দলে দলে স্নানার্থীরা ভিড় করে আসে। সুতরাং আজ হতে প্রায় দু শো পঁচিশ বৎসর পূর্বে মানুষের এ বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা এবং প্রচণ্ডতা অনুমান করতে কষ্ট হবে না। প্রতিটি স্নানপর্বেই এ অঞ্চলের লোকেরা হাজারে হাজারে ছুটে আসত।

তার উপর কবিরাজ গোস্বামীর কাল থেকে দীর্ঘ কয়েক শত বৎসর সমারোহ-সমৃদ্ধি-হীনতার পর কেন্দুবিল্ব তখন সদ্য-সদ্য অভাবনীয় সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে রাধারমণ ব্রজবাসী কেন্দুবিল্বে তীর্থদর্শনে এসে এখানে মহান্তের গদি স্থাপন করেছেন। বর্ধমান-রাজবাড়ির দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বর্ধমানের রাজসরকারের ব্যয়ে ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে নূতন নচূড়ার মন্দির তৈরী হয়েছে। ওপারের শ্যামরূপার গড়ের যে শ্রীরাধাবিনোদজীউ বিগ্রহ অধিকারী ব্রাহ্মণদের বাড়িতে ছিলেন, সেই বিগ্রহ এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ওই নূতন মন্দিরে। কবিরাজ গোস্বামী তাঁর রাধামাধবকে নিয়েই বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন—সে বিগ্রহ বৃন্দাবনে—এতদিন কেন্দুবিল্বের পাটে কোন দেবতা ছিলেন না; রাধাবিনোদ এসে সেই স্থান পূর্ণ করেছেন। এবং রাধাবিনোদও কবিরাজ গোস্বামীর পূজা নিয়েছেন, তাঁর গীতগোবিন্দ-গীত-সুধা শুনেছেন। লোকে বলে, শ্যামরূপার গড় তখন জঙ্গল ছিল না—ছিল একটি সমৃদ্ধ দুর্গ এবং মহারাজ বল্লালসেনের সঙ্গে বিরোধ করে কুমার লক্ষ্মণসেন এখানে এসে বাস করেছিলেন। তখনই কবির সঙ্গে মহারাজকুমারের পরিচয় হয়। রাধাবিনোদ কবিরাজ গোস্বামীর পূজা তখনই গ্রহণ করেছিলেন। তারপর কালক্রমে গড় ধ্বংস হল, অরণ্য এসে গ্রাস করলে ধ্বংসস্তূপকে; রাধাবিনোদ তখন গিয়েছিলেন পূজারী ব্রাহ্মণদের ঘরে; এইবার এসে অধিষ্ঠিত হলেন জয়দেবের পাটে, নূতন প্রতিষ্ঠিত নবরত্নের মন্দিরে। মন্দিরের পশ্চিমেই ব্রজবাসী মহান্তের গদি ও দেবালয়। চারিপাশে বসেছে বাজার। ওদিকে ইলামবাজার জয়বাজার সুখবাজার বাণিজ্যের সমারোহে পরিণত হয়েছে জমজমাট বন্দরে। কাজেই নিত্যই মেলা বসত কদমখণ্ডীর ঘাটের উপরে চারিপাশে। কারণ, পঞ্জিকায় ছোটখাটো স্নানপর্বের তো অভাব নেই, দু-দশদিন অন্তর লেগেই আছে

এবং মানুষের পুণ্যকামনারও শেষ নেই। অসহায় মানুষ দৈনন্দিন জীবনের অপচয় করে অপব্যয় করে। আবার অন্য দিকে শুদ্ধ সুস্থ জীবনের সর্ববিধ ব্যভিচারে জীবনের অপচয় করে অপব্যয় করে। আবার অন্য দিকে শুদ্ধ সুস্থ জীবনের আনন্দের জন্য লালায়িত হয়; সত্য-ন্যায়-সংযম-আত্মত্যাগে আলোকিত জীবন তার মনে পুষ্পিত বৃক্ষশীর্ষের মত নিজেকে সুন্দর করে বিকশিত করে তোলবার স্বপ্ন দেখে। কোনটাই তার মিথ্যা নয়। তাই একটি স্নানে বহুপাপক্ষয়ের সুযোগ সে ছাড়ে না। এমন সহজ প্রায়শ্চিত্তের পথ ছাড়লে সে বাঁচবে কী করে? আরও আছে, এই স্নানপর্ব উপলক্ষ্যে সমারোহের মধ্যে সে পায় উচ্ছৃঙ্খল উল্লাস আস্বাদনের নূতন ক্ষেত্র, পরোক্ষ প্রশ্রয়। তাই সমৃদ্ধ অঞ্চলটির মধ্যে সদ্য-সমৃদ্ধ কেন্দুবিল্বে কদমখণ্ডীর ঘাটে মেলা লেগেই আছে।

সেদিন চৈত্র মাসে মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। এ আখ্যায়িকার আরম্ভ দোলযাত্রা শুক্লপক্ষের প্রতিপদে; মধ্যে দোলপূর্ণিমা চলে গেছে; তারপর আজ কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী। কেন্দুবিল্বের মন্দির-প্রাঙ্গণে গাছপালার পত্রপল্লবে কাণ্ডের গায়ে, গৃহস্থের বাড়ির দেওয়ালে এখনও আবীরের প্রলেপ ও রঙের দাগ মুছে যায় নি। লোকজনের কাপড়-চোপড়ে এখনও লালচে আভা ফুটে রয়েছে। মাত্র চব্বিশ-পঁচিশ দিনে এত আবীর এত রঙ মুছবার নয়। আবার এল মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী। পঞ্জিকাকারেরা লিখেছেন, এই ত্রয়োদশীতে বারুণী-গঙ্গাস্নান পর্ব। বহু শত সূর্যগ্রহণে গঙ্গাস্নানের পুণ্য একত্রিত করলে যে ফল হয় এক বারুণী-গঙ্গাস্নানে সেই পুণ্যফলের অধিকারী হয় মানুষ। সুতরাং হাজারে হাজারে সেদিন যাত্রী এসে সমবেত হচ্ছে কদমখণ্ডীর ঘাটে। পণ্যসম্ভারের নৌকা নিয়ে ইলামবাজার জয়বাজার থেকে ব্যবসায়ীরা গতকাল থেকেই হাজির হয়েছে। মুরশিদাবাদ অঞ্চল থেকেও নৌকা এসেছে কয়েকখানা। কেউ এনেছে নৌকা-বোঝাই মাদুর শীতলপাটি; কেউ এনেছে কাঁসা-পিতলের বাসন; কেউ পাথরের বাসনের নৌকা—পশ্চিম অঞ্চলের পাথর থেকে তৈরী থালা বাটি ঘটি ইত্যাদি; আর স্থানীয় তন্তুবায়েরা এনেছে মশারি; চাষীরা এনেছে বাবুই-ঘাসের আঁটি। গ্রীষ্মকাল আসছে, এ সব জিনিস গৃহস্থেরা প্রয়োজনমত কিনবে। মন্দিরের

সেবাইতরা মাথায় নামাবলী পাগড়ির মত বেঁধে বসেছে; তারা মন্দিরে প্রণামী কুড়াচ্ছে, তাদের লোকজনেরা চারিপাশের দোকানে খাজনা আদায় করে ফিরছে; মোহন্তের লোকজনেরাও নিজেদের এলাকায় ঘুরছে। কালটিও মনোরম; শীত যাই-যাই করছে, বসন্তের বাতাস মধ্যে মধ্যে দমকা মেরে ছুটে আসছে; গাছপালায় নতুন পাতা দেখা দিয়েছে; ঝরাপাতা শিমুলের গাছগুলি রাঙা—রাঙা আর রাঙা; পলাশ দু-চারটে গাছে এখনও ফুটে আছে। জয়দেব-মন্দিরের পিছনেই বড় মাধবীলতার সুদীর্ঘ নমনীয় ডালগুলির গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পুষ্পস্তবকের সমাবেশ। আমের মুকুল প্রায় ঝরে এল। গুটি ধরেছে। বহড়ার মুকুল দেখা দিচ্ছে।

অজয়ের ওপারে গড়জঙ্গলের বিশাল শালবন কচিপাতার শ্যামলারণ্যে নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। এপার থেকে মনে হয় বসন্তের ফিকে নীল আকাশের প্রান্তদেশে কোন চিত্রকর যেন তুলির টানে কোমল সবুজ রঙের দীর্ঘ একটি পোঁচ বুলিয়ে দিয়েছে। ওদিকে চোখ পড়লে আর ফিরতে চায় না; জুড়িয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণা বাতাসের দমকায় শালফুল মহুয়া ও বহড়া-মুকুলের মিশ্রিত গন্ধ ভেসে আসছে। ওপারেও একটি ঘাটে ছোটখাটো ভিড় দেখা যাচ্ছে; নৌকাও জমে রয়েছে কতকগুলি। ওই ঘাটে নেমে যাবে সব শ্যামরূপার গড়। মা শ্যামরূপার স্থানে প্রণাম করে আসবে, মানস সিদ্ধির জন্য ঢেলা বাঁধবে। এপার থেকেও লোক যাচ্ছে ওপারে। প্রতি বৎসরই যায়; এবার ভিড় বেশী। কারণ আছে। গড়ে শ্যামরূপার স্থান থেকে খানিকটা পূর্বদিকে ইছাই ঘোষের দেউলে নাকি এক নবীন গোস্বামী এসে নতুন মঠ তৈরি করছে।

নবীন গোস্বামী এসেছে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে, ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে। গোস্বামীর নাকি দেবতার মত রূপ, তেমনি তার মহিমা। সাক্ষাৎ দেবতা। মুখের দিকে তাকানো যায় না। ধর্মমতে সে বৈষ্ণব; কিন্তু সে মত অদ্ভুত। সঙ্গে এনেছে এক অনুপম বিগ্রহ। কেউ বলে গোবিন্দ, কেউ বলে দ্বিভুজ বিষ্ণু, কেউ বলে উদ্ভট বিগ্রহ। কারণ রাধা বিহনে কি গোবিন্দ থাকেন? অবশ্য বৃন্দাবনে বাঁকেবিহারী আছেন, কিন্তু সে তাঁর গোপাল অর্থাৎ বাল্যভাব। আর বিষ্ণু কি দ্বিভুজ হন? না, তাঁর হাতে বাঁশী থাকে? এ

মূর্তির এক হাতে বাঁশী, অপর হাতে চক্র। মুখমণ্ডলে আশ্চর্য একটি ভাবব্যঞ্জনা। হাসির মাধুর্যের চেয়ে যেন তেজ বেশী। ঠাম বঙ্কিম নয়; ঋজু মহিমায় পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

কতকালের ইছাই ঘোষের দেউল; চারিদিকে ধ্বংসাবশেষ, শত শত বৎসর ধরে শালবন ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করেছে। গাঁথনির ফাটলে ফাটলে বীজ পড়ে গাছ জন্মেছে, মোটা শিকড়ের চাড়ে ফাটিয়েছে, সূক্ষ্ম শিকড়ের জাল বিস্তার করে—শত সহস্র গ্রন্থি দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছে, মাথার উপরে কাণ্ড শাখা বিস্তার করে পত্র-পল্লবের আবরণে দৃষ্টির অগোচর করে ছেয়ে ফেলেছে। পারে নি শুধু মূল দেউলটিকে কুক্ষিগত করতে; সে দেউল আজও শাল-বনস্পতির মাথা ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এবং আশ্চর্য গাঁথনি, এতটুকু ফাটে নি, কোথাও একটি বীজ অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পায় নি, জন্মেছে শুধু কালো শ্যাওলা—চূড়া থেকে বনিয়াদ পর্যন্ত। শত শত বৎসরের বর্ষার ধারায় ধূলি-ধূসর অবস্থায় ভিজেছে; ফলে ওই সিক্ত ধূলি-আস্তরণটিকে অবলম্বন করে জন্মেছে শ্যাওলা। অনেক দূর থেকে মনে হয়, মন্দিরের চূড়ার আকারের এক টুকরো কালো মেঘ। কাছে গেলে মনে হয়, কালো-পাথর-কেটে-গড়া এক বিশাল মন্দির। একেবারে কাছে গেলে বোঝা যায়—না, পাথর নয়, ইটেরই মন্দির, শ্যাওলা পড়েছে।

* * *

ধর্মমঙ্গলের কালের শক্তি-উপাসক গোপভূমের মহাবীর ইছাই ঘোষ। শ্যামরূপার গড় তাঁরই দুর্গ। আজ অরণ্যভূমের কুক্ষিগত। চারিপাশেই অরণ্য। পশ্চিম এবং উত্তর দিকের বন পাতলা, বন ঠিক বলা চলে না—জঙ্গল বলতে হয়। উত্তর দিকে খানিকটা বিক্ষিপ্ত জঙ্গলের পরই চাষের মাঠ, তারপর অজয়ের বন্যারোধী প্রশস্ত বাঁধ; সেকালে এই বাঁধই ছিল যুদ্ধের সময় নগরীর প্রাচীর, আবার সাধারণ সময়ে পথের কাজও করত। বাঁধের পরই অজয়ের চরভূমি। পশ্চিমে খানিকটা দূরে মৌজা গৌরাঙ্গপুর, আরও খানিকটা পশ্চিমে মূল গড় বা ইছাই ঘোষের পুরী এবং বিশাল দুর্গ—গভীর অরণ্যের মধ্যে ধ্বংসাবশেষে পরিণত। দেউলের পূর্বে এবং দক্ষিণে ঘন শালবন। এই আবেষ্টনীর মধ্যে অভগ্ন অটুট দেউলটি চারিপাশের জঙ্গল কেটে ইটের স্তূপ

পরিষ্কার করে সেকালের পাকা মেঝে বের করা হয়েছে। প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর অতি দ্রুত গতিতে শালকাঠ বাঁশ খড় দিয়ে সারি সারি ঘর তৈরী হচ্ছে। দেউলের দক্ষিণ দিকে একটি পুকুর। এককালে হয়তো সরোবর ছিল। এখন সাধারণ জলাশয় ছাড়া কিছু বলা চলে না। পূর্বদিকে পূর্বকাল থেকেই ছিল দেউলচত্বরে প্রবেশের তোরণ বা সিংহদ্বার। দু দিকে দুটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মত ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্য দিয়েই চলে গেছে গাড়ি চলবার মত প্রশস্ত পথ, অরণ্য ভেদ করে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটের দিকে। সেইখানেই দুটি পাকা মজবুত থাম তৈরি করে প্রবেশদ্বার করা হয়েছে এবং পুষ্করিণী সমেত সমস্ত এলাকাটিকে ঘন শালখুঁটির বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। শালকাঠের খুঁটি, বাখারির বেড়ার দেওয়াল, খড়ের চাল, পাকা মেঝে, শালকাঠের তৈরী আগড়, সামনে শালের খুঁটির উপর টানা কাটা পরচালা। যেন ফৌজী ছাউনি। অবশ্য বাখারির বেড়ার দেওয়ালে ভিতরে বাহিরে মাটির প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যেই ছাউনির চেহারা পালটে গিয়ে—আশ্রমের চেহারা নেবে। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটনা ঘটেছে অনেক—লোকজন এসে এদিক-ওদিক দেখে কিছুক্ষণ থেকেই চলে গিয়েছে। অস্বস্তি বোধ করেছে।

এখানকার সমস্ত-কিছুর মধ্যেই তারা যেন নিজেদের জীবনের ছন্দ মেলাতে পারে না। এখানে উল্লাস আনন্দ মানুষজন, আবেষ্টনী সবই যেন গভীর গম্ভীর স্থির। স্থির শান্ত দহের মত; নামতে ভয় করে; অনুমান করতে পারে না, কী আছে ওর তলদেশে! নামবার মত শক্তিও নেই; ভয় হয় বোধ করি বা তলদেশে নামতে নামতে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। আরও আছে। এই গোস্বামী শুধু গোস্বামী নন, ইনি এখানকার ভূস্বামী হয়ে এসেছেন। এখানকার জমিদারী স্বত্বের ইজারা নিয়ে এসেছেন। খাস নবাব-দপ্তর থেকে নজর-সেলামী দিয়ে বন্দোবস্ত নিয়েছেন। ব্যবস্থা পাকা করেই সব করছেন তিনি, কিন্তু তবু পাকা মঠ করবার কল্পনা এখনও স্থগিত রেখেছেন। তার কারণ রাজসরকারের ভয়। বেণীমাধবের ভাঙা ধ্বজার উপর তৈরী মিনার, বিশ্বনাথের পুরনো মন্দিরের মাথায় মসজিদের গম্বুজ মাধবানন্দ চোখে দেখেছেন; বৃন্দাবনের অর্ধভগ্ন গোবিন্দ-মন্দিরের কথা

বহুজনের কাছে শুনেছেন। বাংলা দেশে জাফর কুলীখাঁর মত ন্যায়পরায়ণ নবাবের আমলেও মানুষের এ ভয় দূর হয় নি। জাফর কুলীখাঁ এবং তাঁর আমীর-ওমরাহদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ লোক অনেক আছে; কিন্তু 'শরফ' কাজীর মত লোকেরও অভাব নেই। নিষ্ঠুর ধর্মান্ধ 'কাজী-শরফ'; ভণ্ড-ফকিরের অভিযোগে চুনাখালির জমিদার বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ড বিধান করেছিলেন। নবাব জাফর কুলীখাঁ—সম্রাট আলমগীরের পৌত্র সুলতান আজিমুশ্বান পর্যন্ত এ বিচারকে ন্যায়বিচার বলতে পারেন নি। জমিদার বৃন্দাবনের প্রাণরক্ষার জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন করবেন বলে কাজীকে অনুরোধ করেছিলেন প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখতে। কাজী তা শোনেন নি। বরং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং স্বহস্তে তীর মেরে বৃন্দাবনকে বধ করে শান্ত হয়েছিলেন। সংবাদ শুনে সম্রাট আলমগীর স্বহস্তে লিখেছিলেন, "কাজী-শরফ খোদাকা তরফ।" অন্যদিকে সমস্ত বাংলার সামন্ত শক্তি তখন জাফর কুলীর প্রবল শক্তির চাপে নিস্তেজ; বহু স্থলে আঘাত খেয়ে নির্জীব। আজ মঠ-মন্দির গড়তে হলে নবাব-দরবারে যথারীতি অনুমতি ইত্যাদি নিয়ে করাই যুক্তিসঙ্গত। শুধু বাংলার নবাবের নয়—দিল্লীর বাদশাহের ফরমানের জন্যও যথারীতি চেষ্টা হচ্ছে। ফরমান এলেই পাকা মঠ শুরু হবে।

প্রথম দিন যেদিন মাধবানন্দ এখানে এসে উপস্থিত হন, সেদিন দেউলের আশ্রমে আসবার আগে প্রথম এসে নেমেছিলেন কদমখণ্ডীর ঘাটে। কবিরাজ গোস্বামীর সাধনায় পবিত্র কেন্দুবিল্বে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদজীউকে প্রণাম করে তারপর এসে নেমেছেন এপারে নিজের আশ্রমে। জয়দেব গোস্বামীর মন্দির, রাধাবিনোদজীউ ঠাকুর ব্রাহ্মণ সেবায়েতদের। তার ওপাশে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের সাধুরা এসে এক মঠ তুলেছেন। সেখানেও তিনি গিয়েছিলেন। তাঁরই সঙ্গে পরিচয়ের পর কথা-প্রসঙ্গে কথাগুলি প্রকাশ করেছিলেন। শুধু আশ্রমের স্বত্বের কথাই নয়—তত্ত্ব নিয়েও কথা হয়েছিল।

কেন্দুবিল্বের মহান্ত ভরত দাস সেদিন প্রথম পরিচয়ের পর মাধবানন্দের নৌকায় এসে বিগ্রহ দর্শন করেছিলেন। তাঁর কৌতূহল হয়েছিল নৌকার ধ্বজা দেখে। ধ্বজার প্রতীক তাঁর কাছে নতুন বলে মনে হয়েছিল।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এ ঝাণ্ডার অর্থ কী গোস্বামীজী? কৌন্ কুলকা ঝাণ্ডা? অর্থাৎ কোন্ গুরুকুলের ধ্বজা?

মাধবানন্দ হেসে বলেছিলেন, আমার গুরুই নিজের কুল প্রথম প্রতিষ্ঠা করেছেন মহান্ত মহারাজ। দেবতা তাঁকে দর্শন দিয়েছেন, বহুরূপের মায়াকে সম্বরণ করে শুদ্ধ স্বরূপে দেখা দিয়ে এই ধ্বজা তাঁকে দিয়েছেন।

এ কথায় প্রথমটা বেশ কিছুক্ষণ স্থির অথচ কৌতুক-মেশানো দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহান্ত; কিন্তু সে ব্যঙ্গ সে কৌতুকের উপহাসে এই তরুণ গোস্বামীটিকে কিছুতে উপহাসাস্পদ বলে মনে করতে পারলেন না। হঠাৎ মাধবানন্দের হাত ধরে বললেন, দেবতাকে দর্শন করাও ভাই; দেখি সমঝাতে চেষ্টা করি।

দেবতা দর্শন করে বলেছিলেন, পরমাপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষোত্তম? রাধা বাদ দিয়ে শ্যাম? এ যে ভ্রান্তি!

কানে আঙুল দিয়ে মাধবানন্দ বলেছিলেন, সে মীমাংসা হতে পারে আমার গুরুর সঙ্গে। আমাকে ও-কথা শুনতে নেই।

—ভাল। তুমি কী বুঝেছ ভাই আমাকে বল?

—নিজে যা বুঝি তা যখন সকল জনকে বোঝাতে পারব, তার আগে আমার সাক্ষাৎদর্শন হবে মহারাজ। তখন আমিই হব গুরু।

—তার অর্থ তুমি ভাই বলতে চাও না।

—যোগ্যতা না থাকলে বলতে নেই মহারাজ।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ভরত দাস বলেছিলেন, তোমার কথা শ্রীখণ্ডের বাউল সাধক উদ্ধব আমাকে বলছিল। কৃষ্ণদেবের সঙ্গে তুমি স্বকীয়া পরকীয়া তত্ত্ব-বিচারের সময় মেলেটিতে উপস্থিত ছিলে। কৃষ্ণদেব হার মেনে দীক্ষা নিলেন, তুমি পালিয়ে গেলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে।

শান্তস্বরে বাধা দিয়ে মাধবানন্দ বললেন, আমি কোনও প্রতিজ্ঞা করি নি মহারাজ। চুক্তিনামায় আমি স্বাক্ষর দিই নি।

—তোমার গুরু দিয়েছিলেন।

শান্তস্বরেই আবার মাধবানন্দ বললেন, কৃষ্ণদেব কোন কালেই আমার গুরু ছিলেন না মহান্তজী।

—ছিলেন না ?

—না। কৃষ্ণদেব সন্ন্যাসী নন; আমি দীক্ষার পূর্ব থেকেই সন্ন্যাসের পথ অনুসরণ করছি। তিনি আমার আচার্য মাত্র।

—হুঁ। কিন্তু—

—কী বলুন ?

—আচার্য রাধামোহন পরকীয়াতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন সে শোনবার পরও তোমার সন্দেহের নিরসন হয় নি ? সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভুর উপলব্ধি তাঁর নির্দেশ, একেও তুমি ভ্রান্তি মনে কর ?

মাধবানন্দ একটু হাসলেন শুধু। কোনও উত্তর দিলেন না।

অসহিষ্ণু হয়েই ভরত দাস ব্রজবাসী প্রশ্ন করলেন, জবাব তো দেনা চাহি ভাই। বাতাইয়ে।

মাধবানন্দ বললেন, ভ্রান্তি আমারই মহারাজ। যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা তিনি এবং সত্যরূপিণী অভিন্ন তাঁর ভ্রান্তিরূপিণী রূপ তিনিই সম্বরণ করে আমাকে তাঁর সত্যরূপ দেখাবেন।

—অর্থাৎ এখন এই তোমার কাছে পরম সত্য।

—মহারাজ, ব্রহ্মকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরাই বিশ্বদহনকারী সূর্যের দাহিকাশক্তিকে অতিক্রম করে তাঁর মধ্যস্থিত পুরুষের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। যাঁরা পারেন নি, তাঁরা ওই বিশ্বাসে সূর্যের সমীপস্থ হবার চেষ্টা করলে পুড়ে ছাই হয়ে যান। তর্ক আমি করব না, কিন্তু মহাপ্রভু যে পরকীয়াতত্ত্বের সাধনার মধ্যে অহরহ আনন্দময় সত্তার সঙ্গে বিরহ-মিলনের অমৃতরস আস্বাদন করেছেন, সাধারণ বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বাউল বৈরাগী মোহগ্রস্ত গৃহস্থের পক্ষে সে সাধনা কি সম্ভব? চোখে কি দেখছেন না দেশের অবস্থা ?

মহান্ত ভরত দাস আবার নবীন গোস্বামীর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সেই কারণেই শ্যামসুন্দরের মুখের হাসি মুছে দিয়েছ, আনন্দময় প্রেমময়কে তেজোময় করে নির্মাণ করেছ ?

উত্তর দিলেন না মাধবানন্দ।

ভরত দাস বললেন, ওই তেজে যদি তোমাকেই দগ্ধ করে গোস্বামীজী !

মাধবানন্দ হেসে বললেন, তাতে দুঃখ করব না। দগ্ধ হতে হতে বলব—"বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং ওঁ ক্রতোস্মর কৃতংস্মর ক্রতোস্মর কৃতংস্মর।"

ভরত দাস আপন মনে বলে গেলেন, হুঁ। প্রাণবায়ু মহাবায়ুর অমৃতে লীন হোক, এ দেহ ভস্মে পরিণত হোক। হে অগ্নি, হে তেজ, আমার যা স্মরণীয় তা স্মরণ কর; আমার কৃতকর্মও স্মরণ কর। তুমি জ্ঞানবাদী পণ্ডিত, ভাল কথা। অগ্নি নিয়ে যজ্ঞের ছলে খেলা করতে ভালবাস। ভাল ভাই, তোমার পথ তোমার। কিন্তু এখানে তুমি এলে কেন? এই কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দের পাটে? জান, এখানে তিনি নিজে হাতে গীতগোবিন্দের পাদপূরণ করে লিখেছিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্"! রাধার চরণ মাথায় ধরে পরকীয়া-তত্ত্বকে মানুষের শিরোধার্য করে দিয়ে গিয়েছেন। এ তো তোমার তীর্থ নয়।

মাধবানন্দ বললেন, যেখানে সাধনপীঠ সেখানেই তীর্থ। সব সাধনাই সমান পবিত্র। তাই এখানে যখন এলাম, তখন সর্বাগ্রে কবিরাজ গোস্বামীর পাটেই প্রণাম জানাতে নামলাম। এইবার ওপারে যাব।

—ওপারে? চকিত হলেন মহান্ত ভরত দাস।—ওপারে কোথায়?

—ইছাই ঘোষের দেউলে। মৌজা গৌরাঙ্গপুরে। ওখানেই মঠ স্থাপনের ইচ্ছা আছে।

—গৌরাঙ্গপুর—দেউল এলাকা—তা হলে—

—আমরাই বন্দোবস্ত নিয়েছি।

—গড় এলাকাও বন্দোবস্ত নিয়েছেন তা হলে?

—হ্যাঁ।

—বন্দোবস্ত পাকা করেই এসেছেন তা হলে! কিন্তু—

—কী?

—ওই বনের মধ্যে মঠ করবেন? কেন, বনের মধ্যে কেন লোকালয় ছেড়ে?

মাধবানন্দ হেসে বললেন, তপস্যার জন্য তো অরণ্যই প্রশস্ত স্থান মহারাজ।

—তা হয়তো বটে। কিন্তু এ এলাকা যে গীতগোবিন্দের এলাকা। বিপরীত সুর হলেই বেসুর বাজে ভাই। বেসুর বাজলেই যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

হেসে মাধবানন্দ বললেন, কিসের বেসুর, কিসের বিরোধ মহারাজ? ব্রজলীলার পর তো মথুরা। কংসবধ। এপারে ব্রজধাম—ওপারে মথুরা—মধ্যে যমুনা। এখানেও সেই লীলার নতুন প্রকাশ যদি হয় তো হোক না মহান্ত মহারাজ, ক্ষতি কী?

মহান্ত স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন—সে দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে আবার মাধবানন্দ বললেন, তপস্যা মানুষের একান্তভাবে নিজস্ব মহান্ত মহারাজ; তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ আমি করব না।

মহান্ত স্তব্ধ হয়েই রইলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা ভাই, দেখা যাক।

নৌকা থেকে নেমে চলে গেলেন তিনি।

মাধবানন্দের নৌকা কদমখণ্ডীর ঘাট থেকে নোঙর তুলল। সরতে লাগল নৌকা, হাল ঘুরল—নৌকা বিপরীতমুখী হয়ে খানিকটা নীচের দিকে এসে এপারে দেউলের সামনের ঘাটে ভিড়ল।

মাধবানন্দ একখানি আসনের উপর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইলেন। তিনি ভাবছিলেন। ঠোঁট নড়ছিল তাঁর। একটি শ্লোক—বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই মৃদুস্বরে তিনি আবৃত্তি করছিলেন—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মিলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবা রোধোসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

চৈতন্যস্বরূপ প্রেমবিভোর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভোর হয়ে জগন্নাথদেবের রথের সামনে দাঁড়িয়ে দরবিগলিত ধারার মধ্যে গদগদ কণ্ঠে এই শ্লোক আবৃত্তি করেছিলেন।

এর মর্ম মাধবানন্দ উপলব্ধি করতে পারেন। পরকীয়া নায়িকার নায়ক-মিলনাগ্রহ এবং আবেগের কথা কে না জানে, অনুমান করতে পারে?

আত্মসমর্পণের গভীরতা যে অতলস্পর্শী! সে যে অকূলে ঝাঁপ দেওয়া। কূল না হারালে অকূলে ঝাঁপ দেয় কী করে? স্বকীয়া থাকেন কূলের মধ্যে। রুক্মিণীরূপিণী লক্ষ্মীকে পাশে নিয়ে যদুকুলপতি গোবিন্দ নিজেও সম্পর্ক এবং রক্তের সূত্রে বাঁধা; সর্বাগ্রে তিনি যাদবদের, সেখানে তিনি কারও পতি কারও পিতা কারও পুত্র; সেখানে তিনি রাজা—সেখানে তিনি পালন-কর্তা—সেখানে তিনি দণ্ডদাতা। যাদব-বংশের ধর্ম আর রাজধর্মের দুই বাঁধা কূলের মধ্যে নিজেকে বেঁধে রেখেছেন। কূল হারালে অকূলের যাত্রীর তরী বাঁধবার ভাসাবার ওখানে ঘাট কোথায়? পরকীয়াকে পাশে নিয়ে গোবিন্দ কূল ভাসিয়ে অকূল পারাবারের মত অপার প্রেমরঙ্গের তরঙ্গময়। সেখানে তিনি সবার। রাসবিলাসে—ষোল শো গোপীর সকলের পাশেই রাসবিহারী। জাত নাই কুল নাই মান নাই মর্যাদা নাই, অকূলের জন্য আকুল হয়ে কুল ছেড়ে তিমির-রাত্রে দুর্গমে বের হতে পারলেই শুনতে পাবে—ধীর সমীরে যমুনাতীরে বংশী বাজছে। তিনি জানেন। এ ভজনার মাধুর্য পঙ্কোদ্ভূত পঙ্কজের মত সর্বমালিন্য-মুক্ত, এ পুষ্পের মর্ম মধুর-আস্বাদ অমৃততুল্য। তবু এ সবার জন্য নয়। সাধারণের নয়। এ অধিকার নিষ্কাম ভক্তের।

রূপ গোস্বামীর শ্লোকও তাঁর মনে আছে। কিন্তু তবু তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি সে-কথাও জানেন। বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী ঈশ্বরের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী স্বামী-প্রেমের ঐশ্বর্য ও সকল গৌরবের অধিকারিণী হয়েও তৃপ্ত হন নি; মনে হয়েছিল এর চেয়েও মধুরতম মাধুর্য আছে। সেই মাধুর্যের আস্বাদনের জন্য তিনিই দ্বাপরে গোকুলে পরকীয়া রাধা হয়েছিলেন। তবু না। তবু না। তবু না। এ সাধনা বিকৃত হলে যে কী পরিণতি হয় সে তিনি জানেন; চোখে দেখেছেন; মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন। অমৃত বিষ হয়, জ্যোতি অন্ধ হয়; জীবনচন্দন গলিত পঙ্কে পরিণত হয়; নরকাসুরের উদ্ভব হয়।

যা চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্য, তা সাধারণের জন্য নয়। তিনি তো দেখেছেন তাঁর বাপের জীবনের ধর্ম-সাধনার স্বরূপ। সারা দেশে পরকীয়া এবং কিশোরী-ভজনের পরিণতি। এ ছাড়াও তাঁর মন চৈতন্যময় পুরুষের পাশে আর কোন রূপকে কল্পনা করতে পারে না। নিত্য-চৈতন্যে-

স্থিতিমান আনন্দ-ধ্যানে মগ্ন—চিরসুন্দর পুরুষোত্তম, তিনি যে পূর্ণ, মাধুর্য ঐশ্বর্য সবই তাঁর মধ্যে। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর মত। আজ কয়েক পুরুষের মোহাচ্ছন্নতায় সেই বিন্দুর ধ্যান বস্তুজগতে ছড়িয়ে পড়ে হারিয়ে গেছে। স্থির জ্যোতির্বিন্দুকে হারিয়ে আলো-আঁধারির মোহে দিক্‌ভ্রান্তি ঘটেছে। পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকার জমেছে বংশকে ঘিরে। পরলোকে ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা আলোক-তৃষ্ণায় আকুল হয়ে তাকিয়ে আছেন উত্তরপুরুষের দিকে। সেই হারানো বংশতপস্যাকে তিনি পুনরুদ্ধার করবেন। তাই তাঁর ধ্যান এক অদ্বিতীয় পূর্ণপুরুষের ধ্যান। সকল লীলার মধ্যে তিনিই লীলাময়। বৃন্দাবন থেকে প্রভাস পর্যন্ত তিনি একক; সকল-কিছুকে মিথ্যার মত অলীকের মত বর্জন করে পিছনে রেখে সম্মুখে অগ্রসর হতে মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে নি তাঁর। কুরুক্ষেত্রের রক্তপাতের এক বিন্দু তাঁর মন স্পর্শ করে নি। প্রভাসের তটে বংশলোপের খেলা তিনি নিজেই রচনা করে গেছেন। তিনি পূর্ণ। তাঁর উপাসনা পূর্ণ এককের উপাসনা।

শুধু গোবিন্দ। শুধু শ্যাম। পূর্ণপুরুষোত্তম। চৈতন্যের উৎস জ্যোতির্বিন্দু। গীতাতে তিনি স্বমুখে নির্দেশ দিয়ে গেছেন—মামেকং শরণং ব্রজ। দর্শন করবে সে তাঁর সেই বিশ্বরূপ—

"ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণ।"

ব্রহ্মচর্য তার প্রথম যোগ, দ্বিতীয় সন্ন্যাস, তৃতীয় ধ্যান। নারীকে দূরে রাখ। সে-ই ভাঙে ধ্যান—সে-ই ভাঙে সন্ন্যাস—সে-ই ভাঙে ব্রহ্মচর্য। বস্তু-জগতের মোহ সে, চৈতন্যকে সে আচ্ছন্ন করে, জ্যোতিকে সে শিখাময় বহ্নি করে তোলে ইন্ধনের মত। অনেক মর্মযন্ত্রণা ভোগ করে ভাগ্যক্রমে এই সত্যকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। মালিহাটিতে স্বকীয়া-মতের পরাজয়ের পর কাটোয়ার ঘাটে জয়পুরের কৃষ্ণদেব আচার্য থেকে তাঁর অনুচরবর্গ যখন পরকীয়া-মতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন—তাঁর দীক্ষাগ্রহণের পালা এগিয়ে আসছে, তখন তাঁর অন্তরাত্মা মর্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হয়ে উঠেছিল, আকাশে মাটিতে গঙ্গার জলে ভেসে উঠেছিল তাঁর মায়ের পাথরের মূর্তির মুখের মত মুখখানি। অনেক যন্ত্রণা তাঁর জীবনে তবু তাঁর মুখে পাথরের কাঠিন্য। বাতাসে অনুভব করেছিলেন তাঁর নিশ্বাসের উষ্ণস্পর্শ। তিনি পালিয়ে

গিয়েছিলেন সেখান থেকে। তারপর ঘুরলেন সারা ভারতবর্ষ। তীর্থে তীর্থে ঘুরলেন। চার ধাম পরিক্রমা করলেন। কোথায় আছে পথের সন্ধান? কোথায় পাওয়া যায় মৃতসঞ্জীবনী? মহারাষ্ট্রে গেলেন—নাসিকে। দেখলেন সেখানে হিন্দুকুল-তিলক ছত্রপতি শিবাজীর মারাঠা জাতিকে। ছত্রপতির সাধনা তখন বিগত; শম্ভাজী সুরা এবং নারীর আসক্তিতে ডুবে বিকৃত হয়ে মুঘল কারাগারে বন্দী হয়ে প্রাণ দিয়েছে। ছত্রপতির বংশধরেরা দু ভাগে ভাগ হয়ে দাবার ঘুঁটির মত পেশোবাদের হাতের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে। রাজপুতানা ঘুরলেন, বিস্ময়ের সীমা রইল না। এত বড় তেজ এত বড় বীর্য, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী ব্যাভিচারের ব্যাধি! কী ব্যসন! কী বিলাস! মীরার রণছোড়জীর মন্দিরে দাঁড়িয়ে কেঁদেছিলেন তিনি। কেন রণছোড়জী হলে তুমি? কেন পরিবর্তন করলে তোমার কুরুক্ষেত্রের সেই মহিমময় রূপ? পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভব কি আর তুমি হবে না? বৈষ্ণব পরকীয়া-তত্ত্বের প্রভাবে সমগ্র দেশের সাধারণ সমাজের মধ্যেও দেখে এলেন এই বিকৃতির প্রতিচ্ছায়া। মঠে দেখে এলেন এই বিকৃতি। ফেরার পথে গোকুলে হঠাৎ দেখা পেলেন এক গোস্বামী সাধুর। তাঁর কাছে তিনি পেলেন সান্ত্বনা।

তিনি বললেন, তোর আত্মা-নারায়ণ তো জেগেছে। সে যা বলে তাই কর্। দুনিয়া ঢুঁড়ে ঘুরে মরছিস তুই, আর সে তোর হৃদয়-মান্দলমে খাড়া হয়ে ফুকারছে, তু শুনতা নেহি?

তারপর হেসে বললেন, কাল তো আ গয়া। হামারা আঁখো কি সামনে মে দেখতা হুঁ কি ভৈরব তো নাচনেকো লিয়ে খাড়া হো গয়া হ-হ-হ মত। থৈ-তা থৈ—! হ-হ-হ!

সেদিন গোস্বামীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরের কথাগুলি তাঁর সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে ভেরীনাদের ধ্বনি যেমন প্রতিধ্বনি তোলে ধাতুপাত্রে ধাতুযন্ত্রে ধাতুখণ্ডে, তেমনি এক প্রতিধ্বনি তুলেছিল।

সেখান থেকেই তিনি নূতন তত্ত্ব নিয়ে ফিরলেন।

গোস্বামীর কাছেও তিনি দীক্ষা নেন নি। তাঁর দীক্ষা তাঁর অন্তরপুরুষের

কাছে। তবে গোস্বামীর সঙ্গে মাসখানেক ছিলেন তিনি। অনেক কথা তাঁর সঙ্গে হয়েছে। সে-সব কথা কাউকে বলবার নয়। কাল পার্শ্বপরিবর্তন করেন মধ্যে মধ্যে। কাল পার্শ্বপরিবর্তন করবেন, সময় এসেছে। সেই সব নিয়ে অনেক কথা। সে গোস্বামী আর কেউ নন—রাজিন্দর গিরি গোঁসাই।

সেখান থেকেই এই অভিনব গোবিন্দমূর্তি নিয়ে তিনি বাংলা দেশে ফিরেছেন। কিছুদিন নৌকায় নৌকায়ই কাটিয়ে অনেক সন্ধান করে এই গড় জঙ্গলের সন্ধান পেয়ে, এই জঙ্গলের একাংশ বন্দোবস্ত নিয়ে এখানে এসেছেন।

অর্থের অভাব তাঁর ছিল না। তাঁর পিতা বোধ করি পুত্রের এই সন্ন্যাস-প্রীতির কারণ অনুমান করে মনে মনে লজ্জা বেদনা দুই-ই অনুভব করেছিলেন, তাই মৃত্যুকালে তাঁর বিশ্বস্ত নায়েবকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন একটি পেটিকা; তাতে ছিল লক্ষাধিক টাকা মূল্যের কিছু হীরা-জহরত। লিখেছিলেন, "এগুলি পিতৃপুরুষ আমাদের গৃহদেবতাদের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবতারা তো ব্যবহার করেন না, দেবতাদের নামে চিহ্নিত হইয়া ঘরের সিন্দুকেই মজুত ছিল। ছিল অবশ্য আরও অনেক। যুগল-বিগ্রহের গোবিন্দের বুকে কৌস্তুভের মত ঝুলাবার জন্য একখানা দুর্লভ হীরা ছিল; সেখানা চোরে চুরি করিয়াছে। দুইছড়া পারস্য মুক্তার মালা ছিল; সে মালা দুইছড়ার একছড়া আমাদের এক পূর্বপুরুষ নাকি দিল্লীতে বাদশাহী দরবারে খেলাত দিয়াছিলেন, আর একছড়া অন্য একজন তাঁহার প্রণয়িনীকে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এ সব অবশ্য কানা-ঘুষা কথা। আমাদের হিসাব-নিকাশের খাতায় কোন খরচ নাই, অথচ মজুতও নাই। কিছু জড়োয়া বংশের ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় নিখোঁজ হইয়াছে। একখানি দুর্লভ ও ছোট তক্তির আকারের পান্না-বসানো বাজুবন্ধ ছিল রাধারাণীর। সেখানি নিখোঁজ হয় আমার পিতা ও পিতৃব্যেরা যখন পৃথক হন তখন। পান্নাখানি অবিকল তোমার বিমাতার সিঁথিতে যে পান্না আছে তারই অনুরূপ। অনেকে সন্দেহ করে এখানি সেইখানিই। আমি এখানি আমার ছোট খুড়ার সংকটের সময় কিনিয়াছিলাম। তোমার মা লন নাই, বিমাতা লইয়াছেন। বর্তমানে আমাদের দেবত্রের সকল শরিকের অংশ কিনিয়া দেবত্রের ষোল আনার মালিক হওয়া সূত্রে এই অবশিষ্ট দেবনামাঙ্কিত জহরতগুলির ষোল আনার মালিক

হিসাবেই তোমার কাছে পাঠাইতেছি। পিতৃত্বের দাবিতে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাদের বংশের যে সাধনায় দেবতা হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত সাক্ষাৎকার ও অনুভব হইত, যে সাধনা কয়েক পুরুষ ধরিয়া আমরা ভূসম্পত্তি ও স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের তলায় চাপা দিয়াছি, তুমিই যখন সেই সাধনা উদ্ধারে কৃতসংকল্প, খানিকটা উদ্ধারও করিয়াছ, তখন তুমি এইগুলি যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবার জন্যই গ্রহণ করিবে। আর আমাদের পূর্বপুরুষের পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞ হিসাবে অর্জন করা কয়েক শত বিঘা ব্রহ্মত্র জমি যাহা আমার ভাগে পড়িয়াছে আমার অন্তিম কালে তোমাকেই একমাত্র ন্যায্য উত্তরাধিকারী জানিয়া তোমাকেই একক দিয়া গেলাম। অন্যান্য জমিদারী সম্পত্তি তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রক্ষণাবেক্ষণের যোগ্য হিসাবে পাইবেন। এই ব্রহ্মত্রের সহিত কোন প্রকার বৈষয়িক চাতুরীর সংস্পর্শ নাই ; সুতরাং ইহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবে না। করিলে প্রকারান্তরে আমাকেও তোমার অস্বীকার করা হইবে জানিবে। ইতি।"

হীরা-জহরত এবং সম্পত্তি তিনি গ্রহণ করেছেন এই কর্মের জন্যই। তাঁর পিতার মৃত্যু হয় গোকুল-বৃন্দাবন থেকে ফেরার অব্যবহিত পরেই। কাশীতে এসে সংবাদ ও দানগুলি পান। হীরা-জহরতের অধিকাংশগুলি বিক্রয় করে প্রায় দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। তাঁর মায়ের দেওয়া অলঙ্কারের দরুন কিছু টাকা আগে থেকেই তাঁর হাতে ছিল। সেই অর্থ সম্বল করে কয়েকখানি নৌকা নিয়ে তিনি বাংলাদেশে এসে সর্বাগ্রে দেখা করেন ভাইয়ের সঙ্গে। ভাইকেই বললেন, ব্রহ্মত্র জমি থেকে নিত্য দু মণ চালের ব্যবস্থা কি সম্ভব? কৃষকের ন্যায্য অংশ দিয়ে তা কি পাওয়া যেতে পারে?

ভাই বললেন, বৎসরে পাঁচ শো মণ চালেরই বন্দোবস্ত আছে। নতুন বন্দোবস্ত করলে হয়তো ওটা ছ শো মণে অনায়াসে দাঁড়াতে পারবে। ওর সঙ্গে আমিও কিছু যোগ করে দিতে চাই।

মাধবানন্দ বললেন, না। প্রয়োজন হলে হাত পাতব। তখন দিও। এখন আর-একটি কাজ করে দাও। একটি নিভৃত নিরাপদ স্থান। যেখানে মঠ করে নিরুপদ্রবে থাকতে পারি—রাজকুল ভক্তকুল উভয় কুল থেকে।

তাই অনেক খুঁজে অনেক বিবেচনা করে শ্যামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দেউল এবং তৎসংলগ্ন স্থানগুলির স্বামিত্ব আয়ত্ত করে দলিল হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও।

মাধবানন্দ এর পরই পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে—সঙ্গে দিলেন বাপের আমলের ইমারত তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে। বললেন, সামান্য ভাবে আশ্রমের মত করে পত্তন করে দিন। সেখানে বসে ধীরে ধীরে মঠ তৈরী করে নেব আমি। আর নৌকার উপর থাকতে পারছি না। ভূমির উপর আসন কববার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছি আমি।

এই আশ্রম তাঁর সেই বহু আকাঙ্ক্ষার আশ্রম। এখানেই আসন করে বসে তিনি চৈতন্যময় পুরুষকে আহ্বান করবেন। ওপারে জয়দেব গোস্বামীর বৃন্দাবনলীলার নায়ক রাধাবিনোদকে বলবেন—বাঁশী ছেড়ে অসি ধর। কংসারি রূপে জাগ্রত হও।

*   *   *

আজ মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী।

মাধবানন্দ ভোরবেলায় অজয়ের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ওপারে কেন্দুলীর ঘাটে জনতার সমাবেশ দেখে বিস্মিত হলেন। এত লোক!

জনতা তিনি অনেক দেখেছেন। কৌতূহল তাঁর নেই। সামান্য উপলক্ষ্য পেলেই মানুষ যে কেন এমন করে ছুটে আসে তিনি জানেন।

খুঁজতে আসে। জীবনে যা চায় তাই খুঁজতে আসে।

স্নান সেরে উঠে আবার একবার ঘুরে দাঁড়ালেন।

ওটা? ও কার ধ্বজা উড়ছে?

একটা গাছের উপর একটা লাল রঙের ধ্বজা উড়ছে। নদীর ধারে একটা হাতী। কয়েকটা ঘোড়া। ধ্বজার প্রতীক-চিহ্ন কার?

গোস্বামী-সম্প্রদায়ের প্রতীক বলেই তো মনে হচ্ছে! সম্ভবত পুরীধামে দোলযাত্রার পর গোস্বামীদের কোন দল উত্তর-ভারতে ফিরছেন। দ্রুতপদে আশ্রমে ফিরে তিনি ডাকলেন, শ্যামানন্দ!

—গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দেরই সমবয়সী সবল ব্যায়ামপুষ্টদেহ একজন শিষ্য এসে দাঁড়াল।

মাধবানন্দ বললেন, আমি একবার ওপারে যাচ্ছি; কেন্দুলীতে রাধাবিনোদকে প্রণাম করে আসি। প্রভুর মঙ্গলারতি হয়ে গেছে, তুমি বাল্যভোগের ব্যবস্থা কর। একটু চুপ করে থেকে বললেন, মনে হচ্ছে ওপারে গোকুলের গোস্বামীদের একটি দল এসেছে, দেখে আসি।

গৈরিক উত্তরীয়খানি টেনে নিয়ে কাঁধে ফেললেন। গৈরিক নামাবলীর মস্তকাবরণটি মাথায় জড়িয়ে নিয়ে দণ্ড হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

গোপালানন্দ বিরাটদেহ সন্ন্যাসী; আশ্রমের দাওয়ায় অষ্টপ্রহরই বসে আছে তার লৌহদণ্ড হাতে নিয়ে—সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

মাধবানন্দ বললেন, না।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

আশ্রম থেকে বের হয়ে তিনি বনের পথ ধরলেন। বনে বনে শ্যামরূপার গড় পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে রক্তনালার মাঠ পার হয়ে কেন্দুলীর সামনা-সামনি অজয়ের ঘাটে গিয়ে উঠবেন। সেখান থেকে নৌকা নিয়ে ওপারে যাবেন। দেবতাকে দর্শন ও প্রণাম করতেই যেখানে বেরিয়েছেন, সেখানে শ্যামরূপাকে প্রণাম না-করে যাবেন—সে কি হয়? আদ্যাশক্তি, যোগমায়া চৈতন্যময় সত্তার আধারস্বরূপিণী; ফুলের যেমন বৃন্ত, চৈতন্যময় সত্তার তেমনি আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি; আধারের মত, বৃন্তের মত ধারিণী। নন্দগোপ-গৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভূতা। ইনি সেদিন আবির্ভূত হয়ে কংসাসুরের হিংসানলে নিজেকে আহুতি না-দিলে পৃথিবী দেবকীনন্দনকে পেত না। ভাগবতে সেই হিসাবে আদ্যাশক্তি পূর্ণ চৈতন্যস্বরূপ পুরুষোত্তমের ভগিনী। মাধবানন্দের নিজের সাধনায় এই শক্তিসত্তাকে বাদ দিয়া চৈতন্যসত্তার উপাসনায় সিদ্ধি নেই। সৎ শুদ্ধ সংযত শক্তির লালনেই চৈতন্যসত্তার জ্যোতির্ময় অমৃতময় প্রকাশ। আপন ভাবনাতেই মগ্ন হয়ে পথ চলছিলেন মাধবানন্দ। কিন্তু এ পথেও আজ লোকের ভিড়। ওপার থেকে এপারে এসে শ্যামরূপাকে প্রণাম করে মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর স্নানপুণ্যকে বাড়িয়ে ষোল আনাকে আঠারো আনা করে তবে ফিরবে। তিনি এ পথ ছেড়েও গভীর বনের পথ ধরলেন। নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে কাঠুরিয়াদের, ঔষধ-সংগ্রহকারীদের, শিকারীদের পায়ে-চলা পথ। চারিপাশে প্রাচীনকালের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। মজে-আসা পরিখা, সুদৃঢ় সুউচ্চ মাটির প্রাকার, ভাঙা পাঁচিল, খিলানের পর খিলান, ভাঙা মন্দির, নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বিশাল এক বটের ছায়ায়

নবতিপর জীর্ণ অসাড়দেহ পঙ্গু এক প্রাচীনের মত নিস্তরঙ্গ স্বপ্নহীন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে যেন পড়ে আছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে শালগাছ জন্মেছে। তার উপর অজস্র লতাজাল। নীচে অজস্র গুল্ম। অনন্তমূল শতমুখী কচু আলকুসী।

বনের এই মর্মস্থলে ঢুকেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অপরূপ শব্দঝঙ্কারে বনস্থলী ভরে গেছে। যেন একটা বিরাট সেতার বাজছে দ্রুনের গতিতে—জোয়ারীর তারগুলি ঝঙ্কার তুলছে। তার সঙ্গে গন্ধ। নিশ্বাস ভরে গেছে তাঁর। চোখ জুড়িয়ে গেছে। কচি সবুজের ঢেউ বইছে অরণ্যে, তার মধ্যে নানা বর্ণচ্ছটা। অরণ্যভূমিতে বসন্ত যেন পরিপূর্ণ প্রকাশে প্রকাশিত। বসন্তেরও আদি মধ্য অন্ত আছে—শৈশব যৌবন বার্ধক্য আছে। অরণ্যের তৃণাঙ্কুর থেকে শালশীর্ষের রক্তাভ কিশলয়-বৃন্তে, নবোদ্গত মঞ্জরীর মধ্যে বসন্ত যেন নবকিশোরের মূর্তি ধরে আসন পেতেছে। পাতায় পাতায়, ফুলে ফলে রূপ রস গন্ধের শব্দের সে যেন মহোৎসব। শব্দ সঙ্গীত হয়ে উঠেছে, কত পাখির কত গানে সে এক সঙ্গীতের ঐকতান ঝঙ্কৃত হচ্ছে; তার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মৌমাছি এবং ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জন। সেতারের জোয়ারীর তারগুলির ঝঙ্কারের মত। দুটো ভ্রমর তাঁর কানের পাশ দিয়ে একটানা ভোঁ—ওঁ শব্দ করে পরস্পরকে তাড়া করে উড়ে চলে গেল। ঠিক কানের পাশটিতে শব্দ অকস্মাৎ উচ্চ হয়ে উঠে—তাঁকে ঈষৎ চকিত করে তীরের মত সামনের দিকে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে তিনি একটু হাস্‌লেন। মাথার উপর বিরাট মৌমাছির ঝাঁক। এখানে অজয়-তীরের মাটির রঙ গৈরিক, গৈরিক বনতলের উপর টপ-টপ করে মধু ঝরে পড়ছে; ঝরা পাতাগুলি আঠালো হয়ে উঠেছে, পায়ে আটকাচ্ছে। স্থানটায় অনেকগুলি বহড়ার গাছ। বহড়ার মঞ্জরী থেকে মধু ঝরছে। উগ্র মধুর গন্ধের মধ্যে মাদকতার আভাস। ঝরা পাতার উপর অসংখ্য মৃত পতঙ্গ; কয়েকটা ভ্রমরও পড়ে রয়েছে। মধ্যে মধ্যে গলগলে ফুলের পত্রহীন গাছগুলি ফুলে ভরে গিয়েছে; জবা ফুলের মত আকার, গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ রঙ, বনের শ্যাম-অঙ্গে স্বর্ণভূষণের মত। ফুলগুলিকে ঘিরে এখানে মৌচুটকি পাখিরা নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্ছে। কোথায় পত্রপল্লবের অন্তরালে কোকিল ডাকছে; মধ্যে মধ্যে কোথায় কোন গুল্মের অন্তরালে তিতির ডেকে উঠছে। ক্রমোচ্চ

স্বরগ্রামে একটানা ডেকে চলেছে—চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল। এবার আসছে শালফুলের গন্ধ। শালবন শুরু হল। সরল দীর্ঘতনু শিশু বনস্পতির দল, তলায় অজস্র অসংখ্য চারা, তারই মধ্য থেকে উঠেছে কত লতা—গুঞ্জলতা, শতমূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, আরও কত লতা। যে বনস্পতিকে ধরেছে তাকে পাকে পাকে পিষে ধরেছে, কাণ্ডের গায়ে সর্পিল বেষ্টনের চিহ্ন এঁকে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—সহস্র বিস্তারের জাল রচনা করে তাকে আচ্ছন্ন করে তার আলোকপথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নারী। লতারাই এখানে নারী।

সামনেই একটা পথ। বনটার ভিতর দিয়ে চলে গিয়েছে অজয়ের ঘাটে। লোক চলেছে। দল বেঁধে চলেছে। এক এক দলে পাঁচজন সাতজন। চলেছে ওপারে কেন্দুবিল্বে, অধিকাংশই তিলক-ফোঁটা-কাটা বৈষ্ণব, কিন্তু গৃহস্থ এরা। মধ্যে মধ্যে দুজন, তিনজন বা চারজনের দলে বাউল বৈরাগী আর বৈষ্ণবী। মন বিমুখ হয়ে ওঠে মাধবানন্দের। অন্ধকূপের পঙ্কস্তরে পড়ে মানুষ যখন নেশার ঘোরে বা মস্তিষ্কের বিকৃতিতে পুষ্পশয্যার আনন্দ অনুভব করে, এবং ওই গাঢ় অন্ধকারকে জ্যোতির ভাস্বরতায় দৃষ্টি অবরুদ্ধ হল মনে করে পুলকিত হয় তখন চৈতন্যময় পুরুষেরও চেতনা বিলুপ্ত হয়—অন্ধ তামসী আদিম উল্লাসে অট্টহাস্য করে। এদের কেন্দ্র করে সেই তামসী জাগছে। একটা গাছের ছায়ায় বসে একটি এমনি দল গঞ্জিকা সেবনের আয়োজন করছে। মাধবানন্দ দিকটা পাশে করে মোড় ঘুরলেন। তিমিরান্ধ অসহায় হতভাগ্যের দল। কৃমিকীট পঙ্কপল্বলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় আর আকণ্ঠ পঙ্ক পান করে অমৃতাস্বাদনের তৃপ্তি অনুভব করে; এরা তাই। মধ্যে মধ্যে মাধবানন্দের মনে করুণা জেগে উঠতে চায়, কিন্তু করুণা করতে পারেন না তিনি। করতে গেলেই তাঁর মায়ের কঠোর শীতলদৃষ্টি চোখ দুটি তাঁর মনশ্চক্ষুর সম্মুখে জেগে ওঠে। মনে হয় পরপার থেকে মা তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন—এই ভঙ্গিতেই তিনি তাঁকে তাঁর অবাঞ্ছিত কর্ম থেকে নিরস্ত করতেন। না, করুণা করতে পারেন না তিনি। তবে, ঘৃণা! না, ঘৃণাও তিনি করেন না।

হঠাৎ এসে পড়লেন এক টুকরা খোলা জায়গায়। চারিপাশে ঘন বন-

বেষ্টনীর মধ্যে ঘন সবুজ ঘাস কোমল লাবণ্যে ঝলমল করছে। যেন একটি শ্বেতচন্দনের তিলকবিন্দুর মত প্রসন্ন। তারই পাশে পাশাপাশি কটি লাল কাঞ্চনের গাছ; অষ্টাবক্রের মত আঁকাবাঁকা-ডাল খর্বাকৃতি গাছগুলি একেবারে পত্ররিক্ত; শুধু একেবারে মাথায় দুটি ডালে রক্তাভ কাঞ্চনবর্ণ দু-চারটি করে ফুল ফুটে আছে; যেন কোন শবরী ফুলের অর্ঘ্য মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কিছু ফুল পেড়ে নিলেন মাধবানন্দ। মা শ্যামরূপাকে কয়েকটি, রাধা-বিনোদকে কয়েকটি ভেট দিয়ে আসবেন।

*　　　　*　　　　*

মন্দিরে আজ অনেক যাত্রীর সমাগম। বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এবং এক শ্রেণীর বিলাসী গৃহস্থ বৈষ্ণবের ভিড় বেশী। তাদের ভিড়ের আর অন্ত নাই। সঙ্গে আশ্রিতা সেবাদাসী। কারও একটি, কারও দুটি, কারও কয়েকটি। এমন আখড়াধারী বৈষ্ণব মহান্ত আছে যাদের কয়েক গণ্ডা। তাদের আখড়ায় লীলা চলে। দোলযাত্রায় দোললীলা, ঝুলনে ঝুলনলীলা, রাসে রাসলীলা, এমন কি বিশেষ গোপনতার মধ্যে বস্ত্রহরণলীলাও নাকি হয়ে থাকে। একটা কথা আছে, দারিদ্র্য দোষো গুণরাশিনাশী—কথাটা অস্বীকারের উপায় নাই; কিন্তু ধন সম্পদ যেখানে, সেখানে বিকৃতি একবার শুরু হলে আর রক্ষা নাই। মাধবানন্দের এক অধ্যাপক বলেছিলেন, দেখ বাবা, এই কুচো মাছ পচনে পলাণ্ডু রশুন লঙ্কার বাঁটনা বেশী পরিমাণে দিলে খাওয়া যায়; আমি অবশ্য মাছ খাই নে, তবে গন্ধে রসনা সরস হয়ে ওঠে এ সত্য অস্বীকার করব না এবং পরিতোষ সহকারে অনেককেই খেতে দেখেছি। কিন্তু বাবা, বড় রোহিত মৎস্য যখন পচে তখন পৃথিবীর কোন উপাদান-সংযোগেই তাকে আর খাদ্যে পরিণত করতে পারা যায় না। তখন ওকে নেবুগাছের তলায় চাপা দিতে হয়। রস যে রস, তাও অম্লরসেই ওর পরিণতি হয়। তবে হজমী যদি বল তো বলতে পার। সাধারণ দরিদ্র ভিক্ষুক বৈষ্ণবদের বিকৃতি সমাজকে তত বিকৃত পঙ্গু করে নি, যত করেছে এই সম্পন্ন অবস্থার বৈষ্ণব গৃহস্থেরা—বৈষ্ণব মহান্তেরা। দরিদ্রদের তবু একটা বিশ্বাস কোথাও-না-কোথাও আছে, সম্পন্নদের কোন বিশ্বাসই নেই।

তারা শুধু বিলাসী, শুধু ব্যভিচারী। হায়, বৈষ্ণব ধর্মের পরিণতি! মহাধর্ম বৈষ্ণব ধর্ম! তার আদি কবি তুমি কবিরাজ গোস্বামী!

কবিরাজ গোস্বামী পদ্মাবতীরমণ জয়দেব সরস্বতী, তুমি নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে তোমার সখী-সচিব-পত্নী পদ্মাবতীর রূপসাগরে, যৌবন-জলধিতে; তোমার কবিচিত্ত বিলাস-কলাকুতূহলে এমনি মগ্ন হয়ে গেল যে, চৈতন্যময় পুরুষোত্তমের আর কোন মহিমা দেখতে পেলে না। প্রভাসে সমুদ্রের কূলে নিমগাছের ছায়ার তলায় দ্বাপরের জীবচিত্ত-তিমির-হরণ জ্যোতির্ময় পুরুষটি যাদবহীন নির্বংশ দ্বারকাপুরীর দিকে তাকিয়ে যে নিরাসক্ত প্রসন্ন মুখে বসেছিলেন সে মুখশ্রীর মহিমাও কি তোমাকে মুগ্ধ করে নাই? হায় কবি, হায়! শুধু তুমিই বা কেন? মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের পর তোমার কবিরা যেদিন থেকে তপোবনের তপস্যাকে বহুমহিষীপরিবৃত রাজাদের রাজসভাশ্রিত করিয়েছে সেদিন থেকেই তোমরা কবিচিত্তকে বিলাসকলাতরঙ্গমুখর আদি-রসের ঘাটে ডুব দিইয়ে গলিয়ে দিয়েছ। সমুদ্রতটে ঘাটে বসেই তরঙ্গ-স্নানের সঙ্গে বালি মেখে উল্লসিত হলে। জীবনে সমুদ্রের মহাগভীরে অনন্তের ধ্যান-মহিমার সন্ধান হারালে।

কেন্দুলীর মন্দিরে রাধাবিনোদজীকে দর্শন করে ফিরছিলেন মাধবানন্দ। ওই কথাগুলি তাঁর মনের মধ্যে ফিরছিল। গলায় রাধাবিনোদজীর প্রসাদী মালা, সাদা টগরফুলের মালাগাছির মধ্যে মধ্যে ওই কাঞ্চনফুলের পরন; যেন শিলাফলকে সাদা রঙে লেখা ললিত-কাব্যের একটি শ্লোকের এক-একটি চরণের শেষে আলতার লাল কালিতে টানা এক-একটি পদচিহ্ন। চমৎকার নিপুণ হাতের রচনা মালাগাছি; একেবারে মধ্যস্থলে কয়েকটি কাঞ্চনের একটি স্তবক।

বাইরে এসে দাঁড়িয়ে তিনি তাকিয়ে দেখলেন চারিদিক। কোথায় সেই ধ্বজা, যে ধ্বজা তিনি ওপার থেকে লক্ষ্য করেছেন? সামনে অজয়ের ঘাট পর্যন্ত এক পোয়া পরিমাণ প্রশস্ত চরভূমি ও বালুচর। এ-পারের মন্দির থেকে ও-পারে শ্যামরূপার সামনের বাঁধ পর্যন্ত ভূমি প্রায় দেড় ক্রোশব্যাপী। এই দেড় ক্রোশ স্থানের মধ্যে দুর্দান্ত অজয় পার্শ্বপরিবর্তন করে। যেকালে শ্যামরূপার বাঁধ তৈরী হয়েছিল সেকালে ওরই কোণ ঘেঁষে অজয়

বোধ হয় প্রবাহিত হত। প্রবাদে রয়েছে, কবিরাজ গোস্বামী তাঁর মহাসমস্তার পদ স্মর-গরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং অসমাপ্ত রেখে চিন্তিত মনে কদমখণ্ডীর ঘাটে স্নানে বেরিয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে দেখেছিলেন বিগ্রহের সেবা ভোগ হয়ে গেছে, তাঁর ছদ্মবেশধারী পরমপুরুষের আহার হয়ে গেছে, তিনি শুয়েছেন এবং পদ্মাবতী প্রসাদ ভক্ষণ করছেন। সুতরাং এই সময়ে যে পথটা অতিক্রম করা যায় সেটা কম পথ নয়। এখন হয়তো ততটা নেই, অজয় সরে এসে খেয়ে নিয়েছে, কিন্তু যেটা আছে সেটাও কম নয়। ওদিকে শ্মশান ও বাউল-সমাবেশের বটতলা। এদিকের অংশটা শুধুই বালুচর। এই চরেই বসেছে মেলা। পথে বসে গিয়েছে সারি দিয়ে ভিক্ষুকের দল।

ওই—ওই তো দেখা যাচ্ছে! একটা তরুণ অশ্বত্থগাছের মাথায় ধ্বজাটা উড়ছে। ওই যে কয়েকটা হাতী চলেছে অজয়ের ধারার দিকে! পিছনে চলেছে ছেলের দল!

অগ্রসর হলেন তিনি। দু দিকেই ভিক্ষুকের সারি।

ভিক্ষুকের সারির মধ্যে বসে রয়েছে 'কয়ো'; ইলামবাজারের কয়ো। কয়োকে তিনি চেনেন। কয়ো নিজেই চিনিয়েছে। ভিক্ষুকের সারির মধ্যে বসে সামনে একখানি গামছা পেতে মুড়ি চিবুচ্ছে এবং মুড়ি মুখেই যাত্রীদের উদ্দেশ করে তার নিজস্ব ভিক্ষার বুলিটি উচ্চারণ করে চলেছে—কয়ো, আমি কয়ো বোরেগী মা সকল—বাবা সকল—গোবিন্দের এঁটোকাটা ছিটিয়ে দিয়ে যাও। কয়ো এঁটোর ভিখেরী মা।

অর্থাৎ প্রসাদ। চালের মুষ্টিভিক্ষা, দুটো চারটে কড়ি, কখনও বা একটা আধটা কপর্দক আপনিই পড়ছে। কিন্তু তাতে কয়োর বিশেষ আনন্দ নাই। কয়েকখানা বাতাসা বা আধখানা মণ্ডা বা একটা কলা পড়লে মুখ তার খুশিতে ভরে উঠছে। তেলেভাজা পড়লে আরও খুশী। মুড়ি চিবুনো বন্ধ করে আগে সেইগুলি মুখে পুরে অভ্যাসমত চোখ বন্ধ করে উপভোগ করে চর্বণ করে।

মাধবানন্দ হাসলেন কয়োকে দেখে। এর মধ্যে কয়েকদিনই সে তাঁর আশ্রমে গিয়ে প্রসাদ পেয়ে আসছে। প্রথম দিনই যে কথাটি কয়ো বলেছিল, সে কথাটি ভারি তাঁর ভাল লেগেছিল, কৌতুকরসের সঞ্চার করেছিল—

তিনি হেসে ফেলেছিলেন। কয়ো গিয়ে হেঁকে বলেছিল—জয় গৌর নিতাই হে! শোনলাম বনের মাঝে প্রভুর পেসাদের পাতা পড়ছে। আমি বাবা কয়ো, কয়ো বোরেগী। দু মুঠো এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে দিতে মন হোক গোঁসাইয়ের।

ওই 'মন হোক' কথাটা এবং 'কয়ো' নাম তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। লোকটি বিয়ে করে নি শুনে খুশী হয়েছিলেন। নিজে দাঁড়িয়ে ওকে খাইয়েছিলেন। কিন্তু কয়ো তাঁর ওখানকার প্রসাদে সন্তুষ্ট হয় নি। কারণ তাঁর ওখানকার আশ্রমের ভোগ-রাগে বিলাসিতা নেই। দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করার পঞ্চামৃতের মধ্যেই দেব-ভোজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট। তারপর সকল ভোগই ব্রহ্মচারী তপস্বীর উপযোগী উপকরণ ও পদ্ধতিতে প্রস্তুত। হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। এ সবই মাধবানন্দের নিজের কল্পনা।

তিনি আশ্রম গড়ছেন, শুধু ধ্যানী তপস্বী দিয়ে নয়। কয়েকজন জ্ঞানী পণ্ডিত আছেন, কিন্তু সংখ্যায় বেশী কর্মীর দল। তার মধ্যেও কয়েকটি স্তর অবশ্যই আছে। কেউ কেউ করে আশ্রম পরিচালনা, কেউ দেখে আশ্রম গঠনের কাজ; কেউ করে আশপাশ গ্রামের লোকেদের সঙ্গে পরিচয় আলাপ; তারা ধ্যানী তপস্বী বা জ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তা না হলেও অশিক্ষিত নয়। বরং কর্মের সঙ্গে তাদের শিক্ষার কাজ আজও চলছে। একটা অধ্যয়নের সময় আছে, সে-সময় ওই জ্ঞানী-গুণীদের কাছে তারা পাঠ গ্রহণ করে। এ ছাড়া আরও কিছু সেবক আছে—তারা অক্ষরপরিচয়হীন, কিন্তু বিচিত্র মানুষ। শিক্ষিত নয়, জ্ঞানী নয়, কিন্তু তারা শুদ্ধচিত্ত মানুষ। তারা আসন করে যৌগিক নিয়মে ধ্যান করে না, কিন্তু চোখ বুজলেই ইষ্ট-মূর্তিকে দেখতে পায়। তারা চিন্তা করে না, শুধু আদেশ পালন করে যায়। তারা কর্ম কখনও অসমাপ্ত রাখে না। কোন তত্ত্বকে তারা ব্যাখ্যা করতে পারে না; কিন্তু অদ্ভুত জন্মগত প্রকৃতি বা শক্তি যে, তত্ত্ব শুনবামাত্র বিশ্বাস করে ধারণ করতে পারে। কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি রিপু দমনের জন্য এদের কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় না; সে শক্তি যেন চরিত্রগত; এরা বাঁচার জন্য খায়, খাওয়ার জন্য বাঁচে না; এরা রূপ চোখে পড়লে দেখে, কিন্তু রূপ দেখার জন্য চোখ চেয়ে বসে থাকে না; রূপের পিছনে ছোটে না। এরা

সব মোটা কাজ করে। গোসেবার কাজ, কৃষিক্ষেত্রের কাজ এরাই করে। সবচেয়ে বড় কাজ এদের সেবা। আশ্রমবাসীদের অসুখের সময় সেই পরিচয় সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে ওঠে। মাধবানন্দ নিজে মনে মনে প্রণাম করেন। কয়োকে দেখে, তার বিচিত্র কথা শুনে তিনি ভেবেছিলেন তাকে তাঁর আশ্রমে নিলে হয়। ধাতুটা মনে হয়েছিল খাঁটি। অনেক আবর্জনা মিশে আছে, কিন্তু তপস্যার হোমবহ্নির সংস্পর্শে এলেই আবর্জনা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। তাই তিনি বলেছিলেন—এই আশ্রমে তুমি থাক না। থাকবে?

অভ্যাসমত কয়ো চোখ বন্ধ করেই খাচ্ছিল। মুখে তখন একমুখ ভাত আর কচুসিদ্ধ; সে নীরবে ঘাড় নেড়ে দিয়েছিল—না।

—কেন?

এবার ঘাড় নাড়ার সঙ্গে জিভ নাড়তে হয় না, এমন একটি উত্তর দিয়েছিল—উঁহু। উঁহু

—কেন?

কোঁত করে গ্রাসটার খানিকটা গিলে বলেছিল, রামঃ! তোমাদের এখানে ঠাকুরের চরণ আছে, বদন নাই। এখানে কে থাকবে?

—তার মানে?

—মানে—এটা গয়াক্ষেত্র, পিণ্ডির ব্যবস্থা। পিণ্ডি ঠাকুর পায়ে ছোঁয়, চটকায়, মুখে তোলে না, চটকানো পিণ্ডি প্রেতে খায়। এখানে কয়ো থাকতে পারবে না। কয়ো কয়ো বটে কিন্তু দাঁড়কয়ো নয়; অর্থাৎ দাঁড়কাক।

কয়োর কথা শুনে তিনি রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারেন নি; তার কারণ তার এই বিচিত্র বাগ্‌ভঙ্গি। তিনি হেসে ফেলেছিলেন। শুধু এইটুকুই নয়—খেয়ে-দেয়ে কয়ো তার গামছার খুঁট খুলে মটরদানার মত একটি পাথর তাঁর সামনে রেখে বলেছিল, দেখেন তো গোঁসাই, এটা কী? জঙ্গলের মধ্যে পেয়েছি।

—জঙ্গলের মধ্যে? পাথরটি হাতে তুলে নিয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। এ তো নীলা! বেশ মূল্যবান নীলা! অভিজাত বংশের সন্তান মাধবানন্দ অনেক জহরত দেখেছেন। আজও মায়ের ও বাপের দেওয়া কিছু মূল্যবান জহরত তাঁর আছে।

কয়ো বলেছিল, হ্যাঁ, জঙ্গলের মধ্যে এই তোমার আখড়ার কাছেই। রোদের ছটায় জল-জল করছিল। কুড়িয়ে নিলাম। তোমারই বটে কিনা তা দেখ।

—না, আমার নয়।

—তা হলে? তা হলে হয়তো সেই বিবির হবে।

—বিবির? বিবি কে?

—এই।—চোখ বুজে ভেবে নিয়ে কয়ো বলেছিল, চার-পাঁচ মাস হবে—এক শ্যাখ আর এক বিবি কোথা থেকে এসে এই তোমার দেউলের এইখানে এয়েছিল। শ্যাখের বয়েস এই তোমার পারাই হবে আর বিবি মোহিনীর চেয়ে বেশী বড় নয়—তবে বড় বটে। আর মোহিনীর চেয়ে অ্যানেক সোন্দর। গোলাপফুলের মত রঙ।

—মোহিনী? কে মোহিনী?

—মোহিনী? ইলেমবাজারের আমাদের মাজীর বিটী গো। ভারি ভাল মেয়ে। সেদিন তোমাকে দেখেছিল লদীর ঘাটে। তুমি দেখ নাই?

—না। কিন্তু এই বিবি আর শেখ যাদের কথা বলছ, তারা কোথায় গেল?

—তারা হ্যাতমপুর গিয়েছে। ওই যে লগরের রাজা লতুন গড় করেছে। বুড়ো হাতেম খাঁ তার ফৌজদার; তার কাছে গিয়ে নকুরি করছে। সেই বিবির কানে নাকে এমুনি পাথর ছিল! তা তুমি পাথরটা রাখ। উ নিয়ে আমি কী করব? লোকে জানলে আমাকে মেরে কেড়ে লেবে। মাজী জানলে ভুলিয়ে লেবে। মহান্ত জানলে ধরে নিয়ে যাবে। রাধাবিনোদকে দিলে বামুনরা বেচে খেয়ে দেবে। আর মরলে সুপুরের গোঁসাইরা লেবে। তার চেয়ে তুমি রাখ। তুমি লোক ভাল গোঁসাই। তুমি অনেক লোককে অন্ন দাও।

মাধবানন্দ বলেছিলেন, তা তুমি একদিন হাতেমপুর গিয়ে শেখের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞেস করে এস না—এটা তাদের কি না?

—বাবা রে, ছ-সাত কোশ পথ। যেতে আসতে বার-চোদ্দ কোশ। কয়োর পায়ে তা কিছুই লয়, কিন্তু হ্যাতমপুরে একঘরও হিন্দু নাই। "হেতমপুর হিঁদু নাস্তি মুলুকে অভিরামপুর"—সব মোগল, সব মোগল। জল খাব

কোথায়? তা ছাড়া হাতমপুর আমি যাব না। যে প্যাজ গোস্তের খসবু ছুটিয়ে পাকায় ওরা, আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আমি খাই চাই না-খাই গেলে জাত-জ্ঞাতে আমাকে পতিত করবে।

—কিন্তু এ পাথর আমি নেব কেন? তুমি বিক্রি করে টাকা নিয়ে ঘর-সংসার কর। পাথরটি তিনি নামিয়ে দিয়েছিলেন।

—উঁহু। ঘর সংসার আমার হবে না গোঁসাই। আমি একেবারে আনাড়ী। তা—। তা তুমি যদি না লাও তবে যেখানে পেয়েছিলাম সেইখানে ফেলে দেব। সেই ভাল।

মাধবানন্দ বলেছিলেন, আচ্ছা রাখ, আমি একবার খোঁজ করব হেতমপুরে। নতুন বিদেশী শেখ চাকরি করছে। নাম জান?

—হাফেজ মিয়া গো। ওই যে হাতেম খাঁয়ের খুব পেয়ারের লোক হয়েছে, সেই গো।

লোকটিকে এই একটি ঘটনা থেকেই তিনি স্নেহ করেছেন অন্তরে অন্তরে। তাই কয়োকে দেখে সস্নেহ হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। আজও একটি কপর্দক তার গামছায় ফেলে দিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ওই সন্ন্যাসীদের আড্ডার দিকে।

* * *

পতাকায় প্রতীক-চিহ্ন শৈব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের। কিন্তু শঙ্কর মঠের নয়। অশ্বত্থগাছটির তলায় সন্ন্যাসীরা ত্রিশূল গেড়ে আসন পেতেছেন। গাছটির গোড়াতে হাতীর পিঠের হাওদায় গদি পেতে তার উপর মৃগচর্ম বিছিয়ে বসে আছেন সম্প্রদায়ের প্রধান। পরনে মাত্র বহির্বাস, ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন—মুখে দাড়ি গোঁফ, মাথায় বড় বড় চুলগুলি সদ্য-স্নানের পর খোলা রয়েছে। সর্বাঙ্গে ভস্মমাখা শেষ করে সন্ন্যাসী ত্রিপুণ্ড্রক তিলক রচনা করছেন। গলায় ছোট-বড় রুদ্রাক্ষের কয়েকগাছা মালা; রুদ্রাক্ষের মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট স্ফটিক-গুলি ঝিকমিক করছে। বাহুতে রুদ্রাক্ষের তাগা। শরীরখানি সিংহের মত। প্রশস্ত পেশী, সবল বক্ষস্থল, ক্ষীণ কটি, আশ্চর্য সবল দুটি বাহু। ডান দিকের বুকের পাশে দীর্ঘ একটি ক্ষতচিহ্ন; ভস্মাচ্ছাদনেও তা ঢাকা পড়ে নি। তীক্ষ্ণদৃষ্টে দেখছিলেন মাধবানন্দ। যেন সন্ধান করছিলেন কিছুর।

হঠাৎ সন্ন্যাসী মুখ তুললেন, চোখাচোখি হতেই মাধবানন্দ হাত তুলে অভিবাদন জানালেন, নমো নারায়ণায় !

সন্ন্যাসী হাত তুললেন না, শুধু মুখে বললেন, নমো নারায়ণায় ! তারপর আবার ত্রিপুণ্ড্রক রচনায় মন দিলেন।

মাধবানন্দ বললেন, অনুমতি হলে বসব মহারাজ।

—বয়ঠিয়ে মহরাজ। সব ভূমি হ্যায় ভগবানকে। বয়ঠিয়ে।—বলেই ডেকে উঠলেন, শিব শম্ভো !

মাধবানন্দ বললেন, মহারাজ আসছেন শ্রীক্ষেত্র থেকে ? এ পথে ? তাই প্রশ্ন করছি। পঞ্চকোটের পথ ছেড়ে এ দিকে ? কোন্ ক্ষেত্রমুখে চলেছেন ?

সন্ন্যাসী বারেকের জন্য মুখ তুলে আবার মুখ নামিয়ে বললেন, বঙ্গদেশে নাকি অনেক শক্তিপীঠ আছে শুনেছি। মহাপীঠই পাঁচ-সাতটি। আমি স্বপ্নাদিষ্ট হয়েছি এই পীঠগুলি পরিভ্রমণ করবার জন্য। এখানে শুনেছি শ্যামরূপা দেবীর পীঠ ছিল একদা, এদিকে জয়দেব গোস্বামীর সাধনপীঠ, তাই এখানে—দুদিন থাকবার বাসনা।

মাধবানন্দ বললেন, বঙ্গদেশের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি হলেন কালিকা। 'কালিকা বঙ্গদেশে।' কিন্তু শক্তি এখানে এখন নিজেই নিদ্রামগ্ন। এখানকার লোকে বলে—শ্যামা এখন শ্যাম হয়ে অসি ফেলে বাঁশী ধরেছেন। এতটা ঘুরলেন, শক্তির সাক্ষাৎ পেলেন কোথাও ?

বলতে বলতেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন—সন্ন্যাসীর কয়েকজন অনুচর এসে দাঁড়াল। চমকে উঠলেন তাদের অভিবাদনের ভঙ্গি দেখে। ঠিক গুরু-শিষ্যের অভিবাদন নয়। এ যেন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি সৈনিকের অভিবাদন।

সন্ন্যাসী বললেন, তামাম হিন্দোস্তানেরই এই হাল। বঙ্গদেশের লোকেরা তার উপর ভীরু শান্তিবিলাসী। কিছু মনে করো না—এই জাতিটাই চরিত্র-ভ্রষ্ট জাতি। এরা নাচতে জানে গাইতে জানে, তাও ধ্রুপদ ধামার নয়—খেমটা। হাসলেন সন্ন্যাসী।

মাধবানন্দ বললেন, বাঙালীর চরিত্রে অনেক ত্রুটি আছে। তার ধর্মে পর্যন্ত ব্যভিচার ঢুকেছে। কিন্তু এক এক সময় ভাবি, প্রকৃতির এ দুর্বলতা কোথায় নেই ? এত বড় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ, ভবানীর বরপুত্র, এমন

সাধনা এমন চরিত্র—তাঁর জীবনে জীবনেই শেষ? তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র যুবরাজ শম্ভাজী—

—শিব শম্ভো শিব শম্ভো! বলে সন্ন্যাসী ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করে উঠলেন অকস্মাৎ।

মাধবানন্দ বললেন, সাক্ষাৎ শিবতুল্য রামদাস স্বামীর দেওয়া ভগোয়া জেন্দা নিশান; সেই নিশান আজ—

—রহে দেও মহারাজ। উ সব বাত থাক্। পরের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। তার পর হেসে বললেন, মহারাজের দেখি ধর্মচর্চা থেকে রাজনীতির চর্চাতেই আসক্তি বেশী।

—না না। হেসে মাধবানন্দ বললেন, আমি ভেবেছিলাম মহারাজের এ চর্চা ভাল লাগবে। আচ্ছা মহারাজ, আমি উঠলাম। যদি ওপারে শ্যামরূপার পীঠ দর্শনে যান তবে অবশ্যই আমার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হবে। ওপারে ওইখানেই আমার আশ্রম। নমো নারায়ণায়!

—নমো নারায়ণায়!

* * *

এরা সাধুর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র সৈনিক। গুপ্তচর। মাধবানন্দের মনে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'ওদিকে দিল্লীতে মুঘলশক্তি পতনোন্মুখ। সিংহাসন অধিকারের কলহে সব হারিয়ে বসে আছে। সুবায় সুবায় সুবাদারেরা, নবাব রাজারা প্রত্যেকেই স্বাধীন হয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীরা এক বিরাট শক্তি। তারা অবশ্য সে শক্তি দিয়ে কোনদিন দেশ অধিকার করতে চেষ্টা করে নি; রক্ষা করতেও অগ্রসর হয় নি। তারা ধর্ম এবং দেবস্থান এবং মহাভারতের অন্তররাজ্য নিয়েই বসে আছে। এবার তারাও চঞ্চল হয়েছে। গোকুলে মাধবানন্দ তার কিছু আভাস পেয়েছেন। সেই প্রত্যাশাতেই তিনি শৈব সাধুর ঝাণ্ডা দেখে এসেছিলেন, যদি তেমন কোন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুর সাক্ষাৎ পান! কিন্তু সে দূরে থাক্, তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এরা সন্ন্যাসীই নয়। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে মহারাষ্ট্র গুপ্তচর। তিনি মহারাষ্ট্র ভ্রমণ করে এসেছেন। এরা বড় নিষ্ঠুর। ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শ ভুলে গিয়ে লুণ্ঠনের নেশায় এরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ—কৌটিল্যের নীতিকে অবলম্বন করবার সময়, শঠকে শাঠ্যের দ্বারা পরাভূত করবার কথাটাই মনে হয়েছিল, নিজেদের শঠে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তাদের ঘুণাক্ষরেও মনে জাগে নি। আশ্চর্য! সর্বত্রই সেই এক সত্য। জীবন—সেই অদৃশ্য অব্যক্ত প্রাণস্রোতে নিজেকে ব্যক্ত করে মানবজন্মে এসে নিজেকে প্রকাশ করছে, অহং বলে; প্রকৃতিধর্ম থেকে সে উপনীত হয়েছে চরিত্রধর্মে। ধর্মে কর্মে বাক্যে মর্মে সে ওই চরিত্রকেই প্রকাশ করে। অন্ধ প্রকৃতির যত আক্রোশ ওই চরিত্রের উপর। চরিত্রভ্রষ্ট করে অন্ধ প্রকৃতি প্রবৃত্তি-পল্বলে টেনে ফেলে তার এক নিষ্ঠুর আনন্দ। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের মধ্যে সে তামসী অনুপ্রবেশ করেছে; রামদাস স্বামীর শিষ্য ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতির শাক্তধর্মের মধ্যেও তার অনুপ্রবেশ।

জীবনের সকল দ্বারকে রুদ্ধ করে তপস্যা কর। সিদ্ধিলাভ করে সেই শক্তি নিয়ে তামসীর সঙ্গে যুদ্ধ কর। অকস্মাৎ তাঁর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল অদূরবর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। একজন ঘোড়সওয়ার মহোল্লাসে ঘোড়া ছুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে নিজেই চিৎকার করে সমবেত যাত্রীদের ভীত এবং সন্ত্রস্ত করে চলে আসছে।—হো—হট যাও। হট যাও! হা-রা-রা-রা!—তার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে অট্টহাসি হেসে উঠছে—হা-হা-হা-হা! হাসির কারণ, কোন ভয়ার্ত গ্রামবাসী সরে যেতে গিয়ে পড়ে গেছে। অথবা মেয়েদের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। লোকটা হাতের চাবুক নিয়ে শূন্য মার্গে ঘোরাচ্ছে।

লোকটার অদ্ভুত বর্বর চেহারা! বয়স অল্প, যৌবনমদমত্ত, বেশেবাসে উচ্ছৃঙ্খল ধনীপুত্র বলেই মনে হয়। ওঃ! রক্তাভ গোল চোখ, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, কালো রঙ, লোকটা যেন বর্বরতার প্রতিমূর্তি। পান চিবচ্ছে। লোকটা ব্রতও করে নি, দেবদর্শন করতেও আসে নি; এসেছে মেলা দেখতে, নারী-সন্ধানে।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। একজন সন্ন্যাসী পড়ল সামনে। ওই আগন্তুক সম্প্রদায়ের একজন। বর্বর লোকটা চিৎকার করে উঠল। সন্ন্যাসীটি যেন ইচ্ছে করেই সামনে থেকে সরে গেল না। আর ঘোড়াটাকে সামলাবার

সাধ্য নেই। চাপা পড়ে মরবে। সেই কারণেই বর্বর সওয়ারটা এমন চিৎকার করে উঠেছে। মুখে মেরে ফেলবার ভয় দেখায় সংসারে নিরানব্বুই জন, কিন্তু সত্যই মেরে ফেলা বা হত্যা করা এত সহজ নয়—সে হয়তো একজন পারে; সে একজন অন্তত এ লোকটা নয়। কিন্তু সন্ন্যাসীটি হয়তো সেই একজন। এ জনেরা শুধু মারতেই পারে না, মরতেও পারে। আশ্চর্য শক্তি এবং কৌশলের সঙ্গে ঘোড়াটার লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ঘোড়াটাকে এমন ভাবে ঘুরিয়েছে যে নিজের গতিবেগের সঙ্গে এই বিপরীত-মুখী প্রচণ্ড টানের সামঞ্জস্য রাখতে না পেরে পিছনের পা হড়কে ঘোড়াটা গেল পড়ে এবং বর্বর অশ্বারোহীটাও সশব্দে তার সঙ্গে পড়ে গেল—ঘোড়ার তলায় একটা পা পড়ল চাপা।

প্রথমে উঠল একটা হাসি—হো-হো-হো! দৃশ্যটা সত্যই উপভোগ্য রকমের হাস্যকর। তারপরই কোলাহল উঠল চারিদিকে। চারিদিকে ভিড় জমে গেল। রব উঠল—ছোট সরকার! ছোট সরকার! ইলেমবাজারের ছোট সরকার!

পর-মুহূর্তেই ভিড়টা ফাঁক হয়ে গেল। আরোহীবিহীন ঘোড়াটা ছুটে বেরিয়ে গেল।

মাধবানন্দ সেই পথে ভিতরে ঢুকে গেলেন। লোকটা পড়ে চিৎকার করছে। যে সন্ন্যাসী তার এ দুর্দশা করেছে সে কিন্তু চলে গেছে। কাতর চিৎকার, না ক্রুদ্ধ চিৎকার ঠিক বোঝা যায় না—হয়তো দুইই। মাধবানন্দ গিয়ে তার হাত ধরে বললেন, আগে ওঠ, আগে ওঠ। পরে গালাগাল করবে। কোথায় লেগেছে দেখি।

কুৎসিত গালিগালাজ দিয়ে উঠল লোকটা। পর-মুহূর্তেই থু-থু করে থুতু ছিটতে আরম্ভ করল। মাধবানন্দের মাথার মধ্যে যেন আগুন জ্বলে গেল। ইচ্ছা হল—। কিন্তু সে ইচ্ছাকে দমন করে তিনি বাইরে এলেন। মনে পড়ে গেল মহাভারতে বর্ণিত মহারাজ নলের কথা। বনবাসী মহারাজ নল একদিন দেখলেন, চারিদিকে বনের আগুনের মধ্যে এক নাগ মৃতকল্প হয়ে পড়ে আছে। নাগের দৃষ্টি দেখে মনে হল, সে তাঁর কাছে যেন করুণা ভিক্ষা করছে। নল করুণাপরবশ হয়েই একটা বৃক্ষশাখার সাহায্যে তাকে তুলে

আগুনের গণ্ডীর বাইরে নিরাপদ স্থানে রেখে দিয়ে বললেন, যা, চলে যা। নাগ চলে গেল না। সে মুহূর্তে মহারাজ নলকেই আক্রমণ করলে। যার যা স্বভাব! এরাই সমাজের বিকৃতির কুৎসিততম প্রকাশ; কটুতম বিষফল। সমাজের পচ-ধরা জীবনের কৃমিকীট।

ক্রোধ দমন করেই ঘাটে এসে তিনি নৌকায় চড়লেন। মাঝি লখাই ডোম লগি ঠেলে নৌকাটা স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বললে, ছোট সরকার ঘোড়াচাপা পড়ে মরেছে গোঁসাইবাবা ?

—না, মরে নি। কিন্তু ছোট সরকার লোকটা কে ?

—বাপ রে, অক্রূর দাস-সরকার। ইলেমবাজারের বড় গদির মালিকের বেটা।

—হুঁ।

—একটা গোটা পাঁঠা সরকারের নস্যি। তিন-চার বোতল মদ খেয়ে একটুকুন টলে না। ভারি ঘোঁড়স'র (ঘোড়সওয়ার)। গায়ে ক্ষ্যামতাও খুব। এখানকার যত লেঠেল দাঙ্গাবাজ—সব বড় সরকারের তনখা খায়। কতক ছোট সরকারের সঙ্গে খুব ভাব। নাগা সন্ন্যাসীটা ভাল কাজ করে নাই গোঁসাইবাবা। অক্রূর সরকার সহজে ছাড়বে না। হাঙ্গামাএ কটা লাগাবেই। ওই—ওই বুঝি লাগল—

পিছনে কেন্দুলীর চরে মেলার মধ্যে কোলাহল সত্যই প্রবল হয়ে উঠেছে। ঘুরে মুখ ফিরিয়ে বসলেন মাধবানন্দ। দেখলেন, ভিড় সরে গেছে এক পাশে; বর্বরদর্শন ওই অক্রূর সরকার উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, কোন্ হ্যায় রে হামারা—কোন্ হ্যায় ?

কয়েকজন শক্ত সমর্থ জোয়ানও এসে জমেছে তার পাশে। অন্য দিকে সমবেত জনতার মধ্যে রোল উঠেছে, পালা—পালা—পালা !

লখাই বললে, হল। নাগা সন্ন্যাসীদের হল।

লখাই ওই সন্ন্যাসীদের নাগা সন্ন্যাসী বলে মনে করেছে।

লখাই তখনও বলছিল, সরকারের ভয়-ডর নাই। আজলগরের (রাজ-নগরের) ফৌজদার সাহেব হাতেম খাঁয়ের সঙ্গেও খুব দহরম-মহরম। আঘব-পুরের (রাঘবপুরের) আঘব-ঠাকুরের সাঁতে হাঙ্গামার সময় অ্যানেক সাহায্য

করেছিল দাস-সরকারেরা। একটা দুটো ক্যানে সাতখুন মাপ ওদের। সন্ন্যাসীদের আজ হল।

মাধবানন্দের কপালে সারি সারি চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠল। হাঙ্গামা বাধলে—! লখাই জানে না, ওই ছোট সরকারও জানে না, ওই সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকে নিপুণ যোদ্ধা। শুধু তাই নয়, মহারাষ্ট্র ভ্রমণের সময় আরও অনেক জায়গা তিনি ঘুরেছেন; গোয়াতে গিয়েছিলেন বর্গীদের লুণ্ঠন-অভিযানের কিছুদিন পরেই। সেখানে যা শুনে এসেছেন—। শুনে নয়, দেখেও এসেছেন। এক হতভাগিনীকে দেখে এসেছিলেন। তার বুকের সুধাভাণ্ড দুটির চিহ্নমাত্র নাই; সে নগ্ন বক্ষেই পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। শুনেছিলেন বর্গীরা তাকে শাস্তি দিয়ে গেছে, স্তন দুটি কেটে দিয়েছে! ওরা যদি—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, চল, তুমি তাড়াতাড়ি চল।

বেলা বেড়েছে। সূর্যের আলোতে উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। স্রোত পার হয়ে অজয়ের বালি অতিক্রম করে বনভূমে এসে ঢুকলেন। মঞ্জরী-জাতীয় ফুলে মধু বেশী এবং গুণে ও গন্ধে অপেক্ষাকৃত উগ্র। রৌদ্রোত্তাপে এরই মধ্যে মাধ্বীগন্ধের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভ্রমরগুলি মাতাল হয়েছে; পরস্পরকে তাড়া দিয়ে তাদের ছুটাছুটির আর অন্ত নাই। বনতল আলো-ছায়ার টুকরো টুকরো ছাপে ছাপে বিচিত্রিত হয়ে উঠেছে। গাছে চড়ে সাঁওতাল-ছেলেমেয়েরা মহুয়া সংগ্রহ করছে। কেউ কেউ কাঠ ভাঙছে। ছোট কয়েকটা ছেলে তিতির-খরগোশের সন্ধানে তীরধনুক হাতে পা টিপে টিপে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বনে কোথায় কে গাছ কাটছে! কুড়ুলের শব্দ বিচিত্র গতিতে গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছুটে গিয়ে দিকে দিকে পর পর প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। আরও একটু অগ্রসর হয়েই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। অদূরেই তাঁর আশ্রম। অতি মধুর নারীকণ্ঠের গান শুনতে পাচ্ছেন তিনি।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিত ললিত বনমাল।

জয় জয় দেব হরে।

বারেকের জন্য থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপরই গতি দ্রুততর করলেন। দ্রুতপদে আশ্রমে এসে তাঁর আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। একটি যুবতী, একটি কিশোরী দেবতার গৃহের সামনে বসে গান গাইছে। দেখে বুঝতে

তাঁর বাকি রইল না যে এরা সেই ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবী; বেশ-ভূষা দেখে আরও একটু সন্দেহ হয়। সাদা থান কাপড়ের মধ্যে থাকে যে পরিচ্ছন্ন বৈরাগ্য, পরিধান-পারিপাট্যে তা বিলাস মনে হচ্ছে। মেয়ে দুটি স্নান করেই এসেছে, চুলে কোন বিন্যাস নেই—এলানো চুল পিঠের উপর পড়ে আছে, কিন্তু অবিন্যস্ত চুলের মধ্যেও অভ্যস্ত বিন্যাসের শাসন ফুটে রয়েছে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। মুখে শুধু যৌবন ও স্বাস্থ্যের সহজ রূপের সৌন্দর্যই নেই—প্রসাধন-মার্জনার ছটাও রয়েছে সেখানে। যুবতীটির চোখের কোণে দুটি কালো দাগের আভাস আরও কিছুকে যেন ব্যক্ত করছে।

আশ্রমের সকলে যেন সম্মোহিত হয়ে গিয়েছে। কয়েকজন পাঠে রত। তাদের সামনে পুঁথি শুধু খোলাই আছে। তাদের চোখ দুটি বন্ধ হয়ে গেছে। দেবতার ঘরে দেবতার সম্মুখে আসনে বসে কেশবানন্দ ধ্যানে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার করগণনায় আঙুল আর চলছে না। বাসুদেবানন্দ সন্থ ফিরে এসেছে, সে হাত পা ধুচ্ছে এবং গুনগুন করে ওই সুরের সঙ্গে সুর মেলাতে চেষ্টা করছে। শুধু গোপালানন্দ হৃষ্টপুষ্ট শ্যামাঙ্গী গাভী শ্যামলীর পিঠে হাতখানি রেখে চোখ বুজে বিভোর হয়ে গান শুনছে। কারণ গানের তালে তালে তার সর্বাঙ্গে দোলা লাগছে।

ঠাকুরঘরের সামনে একখানি শালপাতার উপর একটি ছোট ডালায় মনোরম করে সাজানো ভেট নামানো রয়েছে। তার মধ্যে লাল কাঞ্চন-ফুলগুলি ঝলমল করছে। এরাই নামিয়ে দিয়েছে তা বুঝতে বাকি থাকে না।

মাধবানন্দ নীরবে দেবগৃহের দাওয়ায় উঠে গেলেন। কোন দিকে ফিরেও তাকালেন না।

* * *

গান গাইছিল কৃষ্ণদাসী এবং মোহিনী। গাইছিল কৃষ্ণদাসী, মোহিনীর তরুণ স্বরখানি সরলগতি বাতাসের সঙ্গে বনের কচি শালের পল্লবান্দোলনের বেগের মত মিলে মিশে যাচ্ছিল। মাধবানন্দকে দেখে দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মা-মেয়ে পরস্পরের মুখের দিকে বারেকের জন্য তাকিয়ে আবার তাকালে নবীন গোস্বামীর দিকে। অপরূপ নবীন গোস্বামী। শুধু রূপই নয়, আরও যেন কী আছে! হাপরের মধ্যে গলা সোনার দীপ্তি আর হাপরের

ফুঁয়ে গনগনে হয়ে জ্বলে ওঠা কয়লার ছটার মধ্যে তফাত আছে। এ রূপে ওই গলানো সোনার মত একটি মহিমা আছে। ওঁকে দর্শন করতেই তারা এসেছে এখানে।

কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী কেন্দুলী থেকে নবীন সন্ন্যাসীর মঠ দেখতেই এসেছে। তাঁকে দেখতেই এসেছে। কয়ো বোরেগী মেলায় এই কথাটাই মাধবানন্দকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘোড়সওয়ার আসায় বলা হয় নি।

আজকের স্নান-পার্বণে রাধাবিনোদজীকে দর্শন করতে তারা প্রতি বৎসরই আসে। অন্যবারের আসার সঙ্গে কিন্তু এবারের আসার একটা পার্থক্য আছে। এবার সকালে সকালে এসেছে। অন্যবার আসে পায়ে হেঁটে দলের সঙ্গে। এবার এসেছে দল বাদ দিয়ে নৌকায়, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওই কয়োকে। মেলা পর্যন্ত এসে কয়ো আর আসতে রাজী হয় নি। বলেছে, মা-জী, কয়ো নেহাতই কয়ো—বাঘও নয়, হাতীও নয়, ডালকুত্তাও নয়। বিপদ হলে কয়ো কয়োর মতই উড়ে পালাবে। আর পথ চেনাতেও তোমাকে হবে না। তুমি এদেশ তো এদেশ—পুরী বিন্দাবন ঘেঁটে এসেছ। আর তোমার আছে মন্তর-তন্তর। তোমার ভয় কী? চলে যাও, দেখে এস গা সন্ন্যেসীকে, তার আশ্রমকে। তবে বড় কড়া লোক। একটুকুন সাবধান। বুয়েচ? মানে—বেশী হাসি—কী চোখটোক—

বাধা দিয়ে কৃষ্ণদাসী বলেছিল, বুঝেছি রে মড়া মুখপোড়া, তোকে আর মানে বুঝাতে হবে না। বেশী হাসি—! হাসি কাঁদি যা করি, তু কয়ো তার মর্ম কী বুঝবি? বেশী হাসি! আমি যেন হাসতেই যাচ্ছি!

মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে কৃষ্ণদাসী।

নারীচরিত্র বিচিত্র। তারও মধ্যে বিচিত্র কৃষ্ণদাসীদের মত মেয়েদের চরিত্র।

এই নবীন অপরূপ সন্ন্যাসীটিকে দেখা অবধি কৃষ্ণদাসীর অন্তর আশ্চর্যভাবে উতলা হয়ে উঠেছে। সে উতলা ভাবটি অনেকটা অন্তরের আগুনের অকস্মাৎ জ্বলে ওঠার মত। কিন্তু কৃষ্ণদাসী জানে, তার জীবনের আগুনে আর সে দীপ্তি সে উত্তাপ নেই যাতে সন্ন্যাসীর মত সোনা গলে। তবু তাকে গলাতে

তার বড় বাসনা, বড় কামনা। কত কল্পনাই সে এ কয়দিন করেছে! অজয়ের কোন দহে, কোন বিশেষ লগ্নে স্নান করে উঠে বাড়ি এসে বার বার আয়না নিয়ে নিজেকে দেখেছে। কিন্তু যা চেয়েছে তা পায় নি। নিজের জানা মন্ত্রতন্ত্র জড়িবুটি অতি সংগোপনে ব্যবহার করেও দেখেছে। কিন্তু ফল হয় নি। অবশেষে সে নিজের সেই হারানো দীপ্তি ও উত্তাপ খুঁজে পেয়েছে মোহিনীর মধ্যে। এই তো—এই তো। মেয়ের মধ্যে দিয়ে কামনার ধনকে পাওয়ার বাসনা জেগে উঠেছে ধীরে ধীরে। বার বার দিনের মধ্যে শতবার মেয়ের কাছে গল্প করেছে ওই সন্ন্যাসীর।

মানুষটি যেন তেজোময় মণি। মাটির বুকের মণিতে ছটা আছে, দীপ্তি আছে, এ মণিতে তার সঙ্গে তেজ আছে। মণির সঙ্গে তেজ; সে যে দিনমণির ভগ্নাংশ! ওই মণির তেজে আকৃষ্ট হয়ে তার কাছে উড়ে যাবার ব্যগ্র কামনায় তার মনোপতঙ্গের যেন পক্ষোদ্গম হয়েছে। মনে মনে মনের সঙ্গে অনেক কথা বলে ক্লান্ত হয়েছে, মনের কথা বলবার মানুষ না-পেয়ে অবশেষে মেয়েকেই বলেছে। নিজের মনের বিস্ময় মেয়ের মনে সঞ্চারিত করেছে। একদিনে বলে নি, দিনে দিনে খানিকটা খানিকটা করে বলেছে। তার মনের রঙে সন্ন্যাসীর আসল রঙ আরও অনেক গাঢ় হয়েছে। তাই আরও গাঢ়তর করে মেয়ের মনে ছবি এঁকে দিয়েছে। দাস-সরকার বলেছিল একগুণ, সে তাকে দশগুণ করে তুলেছে। রমণ সরকার ওদের বাড়ি ঘর-দোরের কথা বলে নি; দাসী মেয়েকে সাতমহলা বাড়ির নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিংখাবে-মোড়া ষোল বেহারার পালকি, হাঙরমুখো নৌকা, পাইক-বরকন্দাজের হিসেবনিকেশ দিতেও বাকি রাখে নি। সবশেষে উদাসভাবে আকাশের দিকে চেয়ে ঘাড় নেড়ে বলেছে, সেই স—ব ছেড়ে চলে এসেছে নবীন গোঁসাই।

মোহিনী শুনে অবাক হয়েছে। দাসী নিজে বলতে বলতে বিস্ময়ে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে বসে নতুন করে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। হাতী ঘোড়া থাকার বিস্ময় তো সংসারে কম নয়, অনেক। রাজার ছেলে রথে যায়—পথে ভিড় জমে, কিন্তু এসব ছেড়ে আসার বিস্ময় যে তার চেয়ে অনেক বেশী। এর সীমা আছে, তার সীমা নেই। দাসী বলতে বলতে এবং মোহিনী শুনতে

শুনতে একসঙ্গে কেঁদে ফেলেছিল। আপনা-আপনি যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল।

কাল সন্ধ্যায় অকস্মাৎ দাসীর মনের বাসনা আগুন হয়ে জ্বলেছে। মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর পুণ্যস্নানে কেন্দুলী তারা প্রতিবৎসরই যায়। তারই আয়োজন করতে করতে হঠাৎ মনে হয়েছে, কেন্দুলীর ওপারেই তো শ্যামরূপার গড়—ইছাই ঘোষের দেউল; ওখানে গেলেই তো দর্শন মেলে নবীন সন্ন্যাসীর। নূতন আশ্রম গড়ছে; কয়ো তার বিবরণ বলেছে; সে সব তো চোখে দেখা হয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য মনের মধ্যে হাঁ-না করে দ্বন্দ্ব চলেছিল, মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তার পরই 'না' শব্দটা মনের দিগ্বলয়ে কোথায় কোন্ অকূলে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। 'হাঁ' ধ্বনিতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল অন্তরলোক। সঙ্গে-সঙ্গেই ডেকেছিল, মোহিনী!

মোহিনী আকাশে তারা দেখছিল গুনছিল—এক তারা নাড়াখাড়া, দুই তারা কাপাসের খাড়া, তিন তারা চাষীভুষী, চার তারা পাটে বসি, পাঁচ তারা ঘোরমোর—

মায়ের ডাক শুনে তারা গনায় ক্ষান্ত দিয়ে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাকে ডাকছ?

—শোন্। শিগ্রি! শিগ্রি! একেবারে সখীর কৌতূহল তার কণ্ঠে।

মোহিনীও আহ্লাদী মেয়ে, সেও ছুটে গিয়ে বলেছিল, কী মা?

মেয়ের চোখে চোখ রেখে অকারণে চুপি চুপি দাসী বলেছিল, মোহিনী, কাল কেন্দুলীতে চান করে প্রভুকে দর্শন করে অজয় পেরিয়ে শ্যামরূপা যাবি? সেই নবীন গোঁসাইকে দেখে আসব, নতুন মঠ গড়ছে দেখে আসব। যাবি? যেন মেয়ের সম্মতির উপরেই যাওয়াটা নির্ভর করছে।

আর বলে দিতে হয় নি। মোহিনীর মনে দাসীর মনের কথা প্রতিধ্বনি তুলেছিল সঙ্গে সঙ্গে।—নবীন গোঁসাইয়ের মঠে? সত্যি, মা, যাবি?

—হাঁ।

তারপরই খুব চুপি চুপি বলেছিল, কিন্তু খবরদার, কাউকে বলিস না। বুঝলি? আমরা দলের সঙ্গে যাব না। দুজনাতে যাব শুধু। কয়োকে নিয়ে ভোর ভোর নৌকো করে চলে যাব; কেউ জানতে পারবে না। চানটি করে

রাধাবিনোদজীকে পুজো ভেট দিয়ে আড়ে আড়ে চলে যাব। দলবল নিয়ে গেলে হৈ-চৈ হবে। ভাল করে দর্শন হবে না। দুটো কথা নিবেদন করতে পাব না। ভাল করে চরণ ছুঁয়ে পেনাম করতেই দেবে না সবাই।

আনন্দের আর পরিসীমা ছিল না মোহিনীর। রাত্রিতে তার ভাল ঘুম হয় নি। বুকের ভিতরটা একটা আশ্চর্য উদ্বেগে অস্থির হয়েছে, কেঁপেছে। চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করবে, গোঁসাই মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করবেন—তখন কেমন হবে তার?

কৃষ্ণদাসীর মনে শেষের দিকে একটা শঙ্কা হয়েছিল। অজয় পার হয়ে বনে ঢুকে সে বার দুয়েক থমকে দাঁড়িয়েছিল। রাধা মানে না গোঁসাই। পরকীয়া-মতের উপর বিরাগ। যদি—। মোহিনী সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, দাঁড়ালি যে? চল্‌ না কেন! কতবার বলি, এত করে দুধ খাস না, আর ওই কল্কে। দিন দিন মোটা হচ্ছিস।

মেয়ের উৎসাহে তার শঙ্কার অবসন্নতা কেটে গিয়েছে। শঙ্কাতে মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়। অভয়ের চেয়ে বল নাই।

অভিনব জলধর সুন্দর। ধৃতমন্দর। শ্রীমুখ চন্দ্রচকোর॥
জয় জয় দেব হরে॥
তব চরণে প্রণতাবয়। মিতি ভাবয়। কুরু কুশলং প্রণতেষু॥
জয় জয় দেব হরে॥

গান গাইতে গাইতেই তারা এসে আশ্রমে ঢুকেছিল। ওপার থেকেই ভেট নিয়ে এসেছিল। ওই টগরের স্তবকের মধ্যে কাঞ্চনফুলের পরন দেওয়া মালা। কিছু মাধবীফুল; কিছু চিনির মুড়কি; কিছু মিষ্টান্ন; তার সঙ্গে একটি ছোট বাটিতে ঘষা চন্দন, অগুরুচন্দন লেপন।

কিন্তু কই, নবীন সন্ন্যাসী কই?

মাধবানন্দ তখন শ্যামরূপা হয়ে ওপারের মুখে চলেছিলেন।

অন্য একজন সন্ন্যাসী এসে বিগ্রহের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেছিলেন, কী চাই? কারণ তিলক ফোঁটা সত্ত্বেও ভিক্ষুকের বেশ তাদের ছিল না।

দাসী বলেছিল, নবীন গোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব হয়েছে, দর্শন করতে এসেছি, গীতগোবিন্দ শোনাতে এসেছি। শিষ্যটি অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়েছিল।

দাসী হেসে বলেছিল, প্রভুকে, নবীন গোঁসাইকে দর্শন করব।

এবার শিষ্যটি বলেছিল, তিনি তো এখন আশ্রমে নেই। ওপারে গেছেন।

—ওপারে? তবে? পর-মুহূর্তেই বসে পড়ে বলেছিল, তা হলে বসি। ঠাকুরকে গান শোনাই। বলেই আরম্ভ করেছিল গান। কৃষ্ণদাসী নিজেকে ভাল করে জানত। সে জানত তার রূপের দীপ্তি উত্তাপ যতই কমে থাক্, তার কণ্ঠস্বরের সুরের তেজ মাধুর্য একবিন্দু কমে নি। এ গান, এ সুর কানে ঢুকলে তাকে বসতে দিতেই হবে। হয়েছিলও তাই। তাদের গান শুনে গোটা আশ্রমের অধিবাসী কয়েকজন একেবারে সম্মোহিত হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এমনি একটি মুহূর্তেই মাধবানন্দ এসে আশ্রমে ঢুকলেন। —তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। নারীকণ্ঠের গান তাঁর আশ্রমে?

বারেকের জন্য তিনি ওদের দেখলেন। কৃষ্ণদাসীর রূপ তাঁকে পীড়িত করে তুলল। এদের তিনি চেনেন; বাল্যকালে এদের দেখেছেন। তাঁর জ্ঞাতিদের ঘরের যুবকদের সঙ্গে এদের একটা গোপন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এই কৃষ্ণদাসীর মত পরিণতযৌবনা বৈষ্ণবীরা—তাদের চোখের নীচে যে কালি পড়েছে, সেই কালি দিয়েই বৈষ্ণব-প্রেমের কাজল এঁকে দিত তাদের চোখে। সদ্য-ফোটা ফুলের মত কিশোরী মেয়েটিকে দেখে করুণা হল, একেও দীক্ষা দিতে শুরু করেছে ওই বর্ষীয়সী! মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের

দাওয়ার উপর উঠলেন। কৃষ্ণদাসী এবং মোহিনীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন নিবে-আসে-আসে এমন দুটি প্রদীপ—নূতন করে ঘৃত-অভিষিক্ত হয়ে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কৃষ্ণদাসী ডাকলে, প্রভু!

বারেকের জন্য আবার একবার ফিরে তাকালেন মাধবানন্দ।

কৃষ্ণদাসীর বুকে আবেগ জমে উঠেছে, সেই আবেগে কথাও এসে জমেছে মনের মধ্যে। সে বলতে চাচ্ছে—ঠাকুর, আমাদের বাঁচাতে পার? উদ্ধার করতে পার?

এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে যে কাহিনী সে শুনেছে, তার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তার চোখের সম্মুখে মাধবানন্দ যেন আর লালসার জন নয়; এ যেন উদ্ধার-কর্তা। এর কাছে কটাক্ষ হেনে কোনমতেই বলা যায় না—"চাও করুণা-নয়নে।" ও কথা বলতে হলে সজল চোখেই বলতে হয়, পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলতে হয়। কৃষ্ণদাসী সত্য সত্যই সেই মুহূর্তে, উদ্ধারের আশায় আকুল-ভাবে আর্ত। কিন্তু মাধবানন্দ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। তাঁর অবসর নেই। তিনি ডাকলেন, কেশবানন্দ! কেশবানন্দ কোথায়? তাঁর চিত্তে এদের জন্য বিরক্তির চেয়েও আরও গুরুতর চিন্তা রয়েছে। প্রধান শিষ্য কেশবানন্দকে বলতে হবে—সাবধান, সাধুর ছদ্মবেশে বর্গীদের দেখে এসেছি ওপারে।

কৃষ্ণদাসীর মনে তখন অনেক কথা জেগে উঠেছে।—উদ্ধার করতে পার প্রভু, রমণ দাস-সরকারের মত অজগরের পাক থেকে। বাঁচাও গোঁসাই, কিশোরী হরিণীর মত এই আমার মোহিনীকে অক্রূরের মত চিতে বাঘের গ্রাস থেকে।

সে আবার ডাকলে, গোঁসাই! ঠাকুর! প্রভু!

মোহিনী স্তব্ধ; তার মুখে কথা নেই, কোন চাঞ্চল্য নেই, সে নিষ্কম্প প্রদীপ-শিখার মত জ্বলছে, তার সকল ছটা গিয়ে পড়েছে দেবতার মত ওই মানুষটির পা থেকে মুখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গে। একটিমাত্র অস্ফুট কামনা—সে শুধু প্রণাম করবে, তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবে গোঁসাই, তার সারা অঙ্গ সেই আশীর্বাদে থরথর করে কেঁপে উঠবে।

দাসী আবার ডাকলে, গোঁসাই! বেরিয়ে এলেন আর-একজন। মাধবানন্দের একজন শিষ্য—বয়সে প্রৌঢ়। ইনিই দেবতার পূজা করে থাকেন। হাতে তাঁর নির্মাল্য এবং কিছু প্রসাদ।

—নাও।

ওরা কথা বলতে পারল না। নির্বাক হয়ে কলের পুতুলের মত হাত পেতে গ্রহণ করল। প্রৌঢ় সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছিলেন, দাসী তাঁকেই ডাকলে, প্রভু!

—বল, কী বলছ? বলেই আবার বললেন, এখানে পূজায় কোন মানস সিদ্ধি হয় না। কোন কবচ-টবচ আমাদের নেই। যা নির্মাল্য আর প্রসাদ দিয়েছি, এর বেশী কিছু দেবার নেই বাছা।

হাতখানি বাড়িয়ে কৃষ্ণদাসী বললে, গোস্বামী প্রভুকে একবার প্রণাম করব। কটি কথা বলব।

—উনি খুব ব্যস্ত এখন।

—খুব ব্যস্ত!

—হ্যাঁ। চলে যাবার জন্য উদ্যত হলেন সন্ন্যাসী।—কেশবানন্দজী! মহারাজ!

—প্রভু! আবার ডাকলে কৃষ্ণদাসী।

—আরে মায়ী, ফের ডাকলে উনি গোস্সা হয়ে যাবেন। জরুরী কাজ।

—না ঠাকুর। সে কথা বলি নি। বলছি, আমরা গোবিন্দের জন্য ভেট এনেছি। ওই রেখেছি। ওই কটি তা হলে নিবেদন করে দিন।

দাওয়ার ওপর নামানো ভেটের ডালাটি সে দেখিয়ে দিল। সবার উপরে টগরফুলের গাঁথনির মধ্যে লাল কাঞ্চনের পরন-দেওয়া সেই মালাখানি অম্লান মাধুর্যে উজ্জ্বল রয়েছে, কয়েকটি মৌমাছি তার উপর উড়ে উড়ে ফিরছে।

শিষ্য কিছু বলবার বা করবার আগেই মাধবানন্দ নিজেই বেরিয়ে এলেন, তিনি সব শুনেছেন। বললেন, ওখান থেকেই নিবেদন করা হয়ে গেছে। নিয়ে যাও প্রসাদ।

দাসী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, আমাদের আনা ফুল ফল ঠাকুর ছোঁবেন না? অর্থ সে বুঝেছে।

শান্ত গম্ভীর স্বরে মাধবানন্দ বললেন, দেবতার দৃষ্টি সর্বত্র প্রসারিত।

সব জায়গায় পড়ে, দেওয়ালের ঘেরে তো আটকায় না; ওঁর ভোগ তো দৃষ্টিতে। দৃষ্টি নিশ্চয় পড়েছে তোমাদের নৈবেদ্যের উপর।

দাসী বললে, রাধাবিনোদের দরবারে, জগন্নাথ প্রভুর দরবারে কোথাও তো এমন নিয়ম নাই গোঁসাই। ওই তো, ওই তো তোমার গলায় রাধা-বিনোদজীর প্রসাদী মালা, ও মালা তো আমার মেয়ের হাতের—এই মোহিনীর হাতের গাঁথা। কই, সেখানে তো—

তার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল; মাধবানন্দ গলা থেকে মালাগাছি খুলে ফেলেছেন দেখে তার সমস্ত দেহমন যেন পঙ্গু হয়ে গেল। পর-মুহূর্তেই মেয়ের হাত ধরে সে টানলে, আয়, সঙের মত দাঁড়িয়ে থাকিস না। মোহিনী!

মোহিনী নির্বোধের মত প্রশ্ন করলে, আমরা কী করলাম?

মাধবানন্দ মালাগাছি তার দিকে বাড়িয়ে দিলেন: নাও। ধর। রাধা-বিনোদের প্রসাদ।

মোহিনী হাত বাড়ালে, সে সব কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। বুক দুরু দুরু করে ভয়ে কাঁপছে।

ওদিক থেকে দাসী সবলে তাকে আকর্ষণ করলে: না।

তারা চলে গেল।

মাধবানন্দ মালাগাছি দরজার চৌকাঠের মাথায় খোদাই হাতীর শুঁড়ের উপর ঝুলিয়ে দিলেন। কাল অজয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দেবেন।

ঠিক এই মুহূর্তেই লখিন্দর মাঝির উৎকণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠে নিঃশব্দ শান্ত আশ্রম-খানি যেন চকিত হয়ে উঠল—ফুলে ফুলে মধুপানরত মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে উড়ল, ভ্রমরেরা উচ্চতর শব্দ করে প্রচণ্ড বেগে উড়ে চলে গেল এক দিক থেকে অন্য দিকে; কয়েকটা বিশ্রামরত কোকিল চকিত কুহু কুহু শব্দ করে পাখার শব্দ ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে গেল। গাই কটি নড়ে চড়ে উঠল—যে কটি বসে রোমন্থন করছিল তারা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। আশ্রমের সন্ন্যাসীরা বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

লখিন্দর শঙ্কিত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে এসে আশ্রমে ঢুকল—মহারাজ—গুরু মহারাজ! গোস্বামী মহারাজ!

—কী ? মাধবানন্দ ঘর থেকেই প্রশ্ন করলেন।

—ওপারে দাঙ্গা লেগে গিয়েছে মহারাজ !

—দাঙ্গা ? কার সঙ্গে ? কোথায় ? প্রশ্ন করলেন কেশবানন্দ।

—নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছোট সরকারের দলের। ওপারের চরে লেগেছিল। নাগারা এই পারে চলে আসছে বনের বাগে (দিকে)।

—কেশবানন্দ ! মাধবানন্দ আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারলেন না, বেরিয়ে এলেন।

লখাই তখনও বলছে—ওরে বাপ রে। নাগারা কোথা থেকে সড়কি-তরোয়াল তীর-ধনুক বার করলে, তার পরেতে সে কী কাণ্ড ! হাতীতে চড়ে ঘোড়ায় চড়ে সরকারের লেঠেলের দলকে কচু-কাটা করে মেলা লণ্ডভণ্ড করে চলে আসছে এই দিকে। বন্দুকও রয়েছে গো ওদের সঙ্গে !

—প্রস্তুত হও কেশবানন্দ। এরা সন্ন্যাসী নয়। আমার বিশ্বাস এরা ছদ্মবেশী বর্গী ! মহারাষ্ট্রে এদের হিন্দুস্থান লুঠের উদ্যোগের কানাঘুষো আমি শুনে এসেছি। এদের সঙ্গে কথা কয়ে, এদের কথার টান শুনে, এদের চেহারা দেখে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে এরা বর্গী। বর্গীদের কাছে লুঠতরাজের সময় পৃথিবীর কোন বাধাই বাধা নয়। আমাদের আশ্রম পথে পড়বে; আশ্রম লুঠ করতে ওরা দ্বিধা করবে না। তোমরা তৈরী হও। ওদের সঙ্গে হাতী আছে।

কেশবানন্দ ডাকলেন, গোপালানন্দ !

ভীমকায় গোপালানন্দ তার আর-দুজন সঙ্গীকে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

—এস। বের কর।

দণ্ড খানেক সময়ের মধ্যে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। কোথা থেকে বের হয়ে এল গোটা বিশেক পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীদের তৈরী বন্দুক, বারুদ, গুলি। আরও বের হল রাজপুতানার ভীলদের তৈরী ধনুক-তীর। তার সঙ্গে তরবারি। বের করে আনলে বড় বড় মই। মইগুলি লাগানো হল কয়েকটা বিরাটশীর্ষ গাছের গায়ে। গাছগুলির ডালের উপর কবে কখন মাচা বাঁধা হয়েছে বাইরের লোক ঘুণাক্ষরে টের পায় নি, এমন কি লখিন্দর পর্যন্ত পায় নি।

তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ও জেগে উঠল মনে। এরা কারা? এরা কী? ওপারে কেন্দুলীর মহান্তদের গদি অবশ্য সে দেখেছে—তাদের পাইকদের বহরও দেখেছে, লাঠি সড়কি প্রভৃতির সরঞ্জামও না-দেখা নয়, কিন্তু এদের এ-সব ব্যবহার ধারাধরন রকমসকম সবই আলাদা।

চারটে মাচায় আট জন লোক উঠে গেল। আটটা বন্দুক বারুদ গুলি উঠিয়ে নিল তারা। তার সঙ্গে তীর ধনুক। আশ্রমের ঘের শক্ত শালখুঁটি দিয়ে তৈরী, তার মধ্যে দুটি ফটক; ফটক দুটির মুখে শক্ত আগড় টেনে এনে ঠিক করে রাখল, যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই বন্ধ করে দেওয়া যায়।

মাধবানন্দ বললেন, দেখতে পাচ্ছ কিছু?

পশ্চিম দিকের সব চেয়ে উঁচু শালগাছটির মাচা থেকে তরুণ সন্ন্যাসী শ্যামানন্দ বললে, পাচ্ছি, ওরা অজয়ের স্রোত পার হয়ে এপারের চরে উঠছে। দুটো হাতী, দশটা ঘোড়া, লোক প্রায় পঁচিশ জন।

—ওপারের অবস্থা?

—ওপারে কাতারে কাতারে লোক জমছে। দাঁড়িয়ে দেখছে। গুরু মহারাজ!—কথা বলতে বলতেই শ্যামানন্দ অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠস্বরের বলে উঠল, গুরু মহারাজ! কণ্ঠস্বরের উত্তেজনার মধ্যেও শঙ্কার আভাস। অকস্মাৎ একটা কিছু যেন ঘটেছে!

মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, কী?

—বালুচরের ওপর দুটি মেয়ে! ছুটছে—পালাচ্ছে। ওদের চরের উপর উঠতে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে। সেই মেয়ে দুটি। যারা এখুনি এখান থেকে গেল। মহারাজ, ওরাও মেয়ে দুটিকে দেখেছে। বর্বর আনন্দে চেঁচাচ্ছে। মহারাজ—দুজন নাগা, ছুটেছে।

লখিন্দর বলে উঠল, ইলেমবাজারের মা-জী!

মাধবানন্দ বললেন, গোপালানন্দ! তোমরা চারজন এস আমার সঙ্গে। বন্দুক নাও সঙ্গে। আমি বন্দুক ছুঁড়লে, তোমরা এক সঙ্গে চারটে বন্দুকের আওয়াজ করবে। গুলি পৌঁছবে না, কিন্তু শব্দে কাজ হবে।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি যাবেন মহারাজ?

—নারীকে রক্ষা করতে না পারলে ধর্ম চঞ্চল হবেন। প্রভু মুখ ফেরাবেন। আর তুমি জান না কেশবানন্দ, আমি নিজে চোখে গোয়াতে দেখে এসেছি, মেয়েদের কী নিষ্ঠুর নির্যাতন করে এরা!

তিনি শিউরে উঠলেন। পরক্ষণেই 'জয় চক্রধারী, জয় নারায়ণ!' বলে তিনি দ্রুত পদে বেরিয়ে গেলেন। হাতে নিলেন একখানি তরবারি। বিপুলকায় গোপালানন্দ চার জন সঙ্গী নিয়ে বাঘের মত লাফ দিয়ে তাঁর সঙ্গ নিল।

যাবার সময় মাধবানন্দ চিৎকার করে বললেন, তোমরা নাকাড়ায় ঘা দাও। ঘাটে বজরার ওদের সাবধান করে দাও।

সামনে অজয়ের ঘাটে আশ্রমের কয়েকখানা নৌকা বাঁধা আছে। যে বজরায় তিনি এসেছেন, সেখানা এবং তার সঙ্গে আরও কয়েকখানা—তার মাল্লা-মাঝিরাও আশ্রমেরই লোক। তবে ঠিক সন্ন্যাসী নয়। তারাও লড়তে জানে। উত্তরবঙ্গের পাকা মাঝি এবং সড়কিবাজ নমশূদ্র তারা। মাধবানন্দ, তাঁর পিতৃকুলের অনুগত মাঝি-সম্প্রদায় থেকে এদের সংগ্রহ করে এনেছেন। যারা নৌকায় পদ্মায় ডাকাতি করে ফেরে, চর নিয়ে দাঙ্গা করে, এরা তাদেরই সন্ততি। মাধবানন্দ এদের নতুন জীবনে শিক্ষা দিচ্ছেন। দীক্ষা এখনও হয় নি। লখিন্দরের মত কয়েকজন এখানকার লোকও সম্প্রতি নিয়েছেন এদের সঙ্গে।

অজয়ের জলস্রোতকে মাঝখানে রেখে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় দক্ষিণ তীরে বালির উপর তাদের দলবল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারে কেন্দুলীর তীরে প্রায় সারা মেলাটার লোক জমেছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বিশেষ করে যারা হাতী ঘোড়া এবং শিষ্যসেবকের দল নিয়ে দেশ ভ্রমণ করে, তারা প্রয়োজন হলেই ত্রিশূল এবং চিমটেকে অস্ত্র হিসেবে উদ্যত করে লড়াই করে থাকে। তীর্থপথে দলে দলে সংঘর্ষ হয়, যাত্রীদলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, আবার স্থানীয় লোকেদের সঙ্গেও হয়, কিন্তু এমন হয় না। তাদের সঙ্গে বড় জোর তলোয়ার বাঘনখ থাকে, বন্দুক থাকে না। সারা মেলাটার লোক চমকে গেছে। যতক্ষণ না তারা নদী পার হয়ে এপারে এসেছে, ততক্ষণ পর্যন্তও তারা পশুর মত ছুটোছুটি করেছে। সারা চরটা প্রায় জনশূন্যই হয়ে পড়েছিল। ওরা জলে নেমে মাঝ নদী পর্যন্ত যাওয়ার পর লোকেরা উকিঝুঁকি মারতে

শুরু করে। এপারের কাছাকাছি হতেই বেরিয়ে এসে নদীর পাড়ে দাঁড়ায়; এখন এসে নদীর চরভূমে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করছে—গেল! গেল! গেল! গেল ওই মেয়ে দুটো!

এপারে কৃষ্ণদাসী আর মোহিনী ভয়ে প্রাণপণে ছুটছে। ছুটে পালিয়ে চলেছে বিপরীত মুখে। লক্ষ্যস্থল বোধ করি মনের মধ্যে স্থির করবারও অবকাশ হয় নি; বাঁয়ে অজয়, ডাইনে অদূরে বন—তার মধ্যে শরবন কাশবন ও নানান তৃণে আচ্ছন্ন সেই চরভূমি ধরে তারা ছুটছে। এই মুহূর্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এইটি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থান তাদের আর নাই, মনে পড়ছে না।

দেউলের ঘাটে বাঁধা বজরাখানা এবং অপর নৌকাগুলি ঘাট ছেড়ে নিরাপত্তার জন্য গভীর জলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—মাল্লারা সড়কি-হাতে নৌকার উপর এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক জনের হাতে তীর ধনুক।

দুজন সন্ন্যাসী পলায়নপর মেয়ে দুটোর দিকে বর্বর উল্লাসে চিৎকার করে ধরবার জন্য ছুটেছে। হাতীর হাওদার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই প্রধান সন্ন্যাসী। নিষ্ঠুর ক্রোধে তার মুখখানা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। চিৎকার করে বলছে, আমার অভিশাপে একদিন এই তামাম মুলুক ছারেখারে যাবে। ঘর জ্বলবে। শিবের অনুচরের তাণ্ডবে তছনচ হয়ে যাবে সব। পঙ্গপালের মত ছেয়ে ফেলবে দেশ। হাঁ! আর মধ্যে মধ্যে এদিকে মুখ ফিরিয়ে বলছে—পাকড়কে লাও। পাকড়কে লাও।

মাধবানন্দ সঙ্গীদের নিয়ে যেখানে দাঁড়ালেন—সে স্থানটি ঠিক পলায়নপর কৃষ্ণদাসীর ও অনুসরণরত সন্ন্যাসী দুজনের মধ্যে পূর্বপশ্চিমে সরলরেখা টানলে তার প্রায় মাঝখানে, কিন্তু অনেকটা দক্ষিণে। একটি স্থূলকোণ ত্রিভুজের মত অনেকটা। ওই স্থূলকোণের বিন্দুটির উপর মাধবানন্দ এবং সামনে অতিভুজের দুই প্রান্তে অপর দুই কোণের এক কোণে কৃষ্ণদাসী ও মোহিনী, অন্য কোণে সন্ন্যাসী দুজন। মাধবানন্দ বললেন, এক বন্দুক দাগো গোপালানন্দ। জলদি।

গোপালানন্দ মুহূর্তে বন্দুক দেগে দিল। অজয়ের গর্ভে গর্ভে একটি শব্দ এপারে-ওপারে প্রতিহত হতে হতে দুপাশে ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত যেতে না যেতে, পর পর আটটি বন্দুকের শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল তখন আকাশ-লোকে, প্রায় বনভূমির মাথার উপর।

দুই পারের দুই পক্ষই চকিত হয়ে উঠল। ওপারের জনতা ঘটনাটা ঠিক কী বুঝতে না পেরে ছুটতে লাগল। পালাতে লাগল। এপারে অনুসরণরত সন্ন্যাসী দুজন থমকে দাঁড়াল। ওদিকে হাতীর হাওদার উপর খাড়া সন্ন্যাসী চকিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে মাধবানন্দদের দেখে দাঁতে দাঁত ঘষে কঠোর কিছু উচ্চারণ করল। একবার হাতীটা মাহুতের ইঙ্গিতে কয়েক পা অগ্রসরও হল মাধবানন্দের দিকে, কিন্তু তারপরই পর পর আটটা বন্দুকের শব্দে চমকে উঠে কিছু বলতেই হাতী থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল নাকাড়ার শব্দ—ডুম-ডুম-ডুম-ডুম, ডুম-ডুম-ডুম-ডুম। ওদিকে বজরা এবং নৌকা থেকে মাল্লারা ঝপাঝপ জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার দিয়ে এসে কূলে উঠে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বাংলার বহুবিখ্যাত কুক অর্থাৎ যুদ্ধধ্বনি দিয়ে উঠল—মুখে হাতের তালু সঞ্চালনের ফলে সে ধ্বনি অতিবিচিত্র—আ-বা-বা-বা-বা-বা। ঠিক সেই মুহূর্তটিতে মেয়ে দুটিও বারেকের জন্য ফিরে তাকিয়ে সব দেখে থমকে দাঁড়াল; একটি আর্তস্বরের চিৎকার উঠল, পর-মুহূর্তেই কিশোরীটি চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল সেইখানে। কৃষ্ণদাসীও বসে পড়ে চিৎকার করে উঠল।—হে গৌর, রক্ষা কর। বাঁচাও। ওগো ঠাকুর!

মাধবানন্দ তাঁর দল নিয়ে ততক্ষণে এগিয়ে এসেছেন খানিকটা। মাল্লারাও এগিয়ে আসছে। ওদিকে পিছনে বনের মধ্যে নাকাড়ার শব্দ গাছে গাছে ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ধ্বনি-তরঙ্গ তুলেছে। আকাশে ভয়ার্ত পাখিরা উড়ছে। অজয়ের চরভূমের কাশ ও শরবনের আশ্রয় থেকে সজারু খরগোশ কয়েকটা ছুটে পালাল। একটা ঝোপ থেকে একসঙ্গে চার-পাঁচটা বুনো শুয়োর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

মাধবানন্দ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, এরা সন্ন্যাসী নয়, এরা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে বর্গীর দল। তোমরা ওপারে কাপুরুষের মত দাঁড়িয়ে থেকো না, এগিয়ে এস। কোন ভয় নেই। দেউলের আশ্রমের সন্ন্যাসী আমরা—আমরা থাকব সর্বাগ্রে—সামনে।

কথায় ফল হল। কিছু সবল সুস্থ জোয়ান চিৎকার করতে করতে অজয়ের জলে নামল। মার্—মার্ বেটাদের। মার্—

সন্ন্যাসীর দলের প্রধান দাঁড়িয়ে ছিলেন হাওদার উপর, তিনি বসে পড়লেন।

একটা শিঙা তুলে বাজিয়ে দিতেই দলের পদাতিকেরা বনের দিকে চলতে লাগল; অনুসরণকারী সন্ন্যাসী দুজনও ফিরল। পদাতিকের পিছনে চলল ঘোড়সওয়ারেরা। তার পিছনে হাতী। হাতীর হাওদার উপর আরোহীরা পিছন দিকে অনুসরণকারীদের জন্য বন্দুক প্রস্তুত রেখে চলতে লাগল। হঠাৎ অনুসরণরত সন্ন্যাসী দুজনের একজন একটা চিৎকার করে হাত দুটোকে উপরের দিকে তুলে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। গোপালানন্দ জানু পেতে বসে রাজপুতানার ভীলদের ধনুকে আকর্ণ জ্যা টেনে নিপুণ লক্ষ্যে তীর ছেড়ে-ছিল। সে তীর ছুটন্ত মানুষ দুটির একটিকে বিদ্ধ করেছে। হাতীর উপর থেকে প্রধান সন্ন্যাসী কিছু বললেন। সঙ্গে সঙ্গে আহত সন্ন্যাসীর সঙ্গী তার হাতের তলোয়ারখানি সঙ্গীর বুকে আমূল বিদ্ধ করে তাকে নিশ্চিত-রূপে হত্যা করে তলোয়ারখানা আবার টেনে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। গোটা দলটি তখন বনের প্রান্তদেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নাকাড়ার শব্দ যে-দিক থেকে আসছে সে দিকটা যথাসম্ভব দূরে রেখে দিক নির্ণয় করে বনের মধ্যে ঢুকছে।

মাধবানন্দ এগিয়ে গিয়ে কিশোরী মেয়েটির শিয়রে দাঁড়ালেন। চমকে উঠলেন তিনি। ভীরু কিশোরী কি আতঙ্কেই মরে গেছে? বসে তিনি তার হাতখানি তুলে ধরলেন। নাড়ী পরীক্ষা করলেন। অতি ক্ষীণ ভাবে নাড়ীর গতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মধ্যে মধ্যে কেটেও যাচ্ছে। এখনও জীবন আছে। কিন্তু অবিলম্বে কোন সঞ্জীবনী ওষুধ না-পড়লে বিপদ ঘটবে। মকরধ্বজ বা মৃগনাভি।

—গোপালানন্দ! শিগগির একজন এখানে এস। শিগগির। আর তোমরা অনুসরণ কর। আশ্রম থেকে বন্দুকধারীদের কয়েকজনকে নাও। বনের আশ্রয়ে বাঘ বড় ভয়ঙ্কর শত্রু। যতদূর পারা যায় ওদের তাড়িয়ে দিয়ে এস। লোক জড়ো কর। লোক চাই। নাকাড়া বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চল।

কৃষ্ণদাসী চিৎকার করে উঠল, রক্ষা কর গোঁসাই, ওগো গৌর, রক্ষা কর।

* * *

অনেকক্ষণ পর মোহিনী চোখ মেলল।

চৈত্রের সূর্য তখন অপরাহ্ণের দিকে চলেছে। মাধবানন্দ তাকে একখানি নৌকার উপর শুইয়ে দিয়েছিলেন। আশ্রম অনেক দূর; বালুচরে ছায়া নেই; তাই একখানি নৌকাকে কাছাকাছি এনে সন্তর্পণে তার ছইয়ের নীচে পাটাতনের উপর শুইয়ে দিয়েছিলেন। একজন সেবককে আশ্রমে পাঠিয়ে চিকিৎসা-বিদ্যায় অভিজ্ঞ রামানন্দকে সংবাদ দিয়েছিলেন। রামানন্দ শঙ্কিত হয়েছিলেন প্রথমটায়। ভেবেছিলেন হয়তো যে কোন মুহূর্তে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সে আশঙ্কা দূরে গেল, মোহিনী চোখ মেলে চাইল।

মাধবানন্দ ভাবছিলেন, চলে যাবেন। তাঁর তো আর করার কিছু নেই! ওদিকে কৃষ্ণদাসী যেন পাথর হয়ে গেছে। স্থাণুর মত বসে আছে। শুধু চোখের দৃষ্টি তার অস্বাভাবিক রূপে উজ্জ্বল। নৌকার উপর মোহিনীকে তুলবার আগে পর্যন্ত সে বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলেছে। অচেতন মোহিনীর অদূরে দাঁড়িয়ে বলেছে, চোখ মেল, মোহিনী, চোখ চেয়ে দেখ—, ওরে নবীন গোঁসাই—দেবতা তোর মুখের দিকে চেয়ে। ভয় নাই, আর ভয় নাই। চোখ চা মা, চোখে চা।

মাধবানন্দ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, চিৎকার কোর না তুমি।

কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ থেকে আবার কৃষ্ণদাসী শুরু করেছিল, তোর অনেক ভাগ্যি—তোর অনেক ভাগ্যি! সাতজন্মের তপস্যা না থাকলে দেবতার সেবা কেউ এমন করে পায় না।

মাধবানন্দ এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে তাকিয়েছিলেন শুধু। চুপ করে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসী।

এর পর মোহিনীকে শিশুর মত দুই হাতের উপর তুলে নিয়ে নৌকার উপর তাকে সযত্নে শুইয়ে দিতেই, কৃষ্ণদাসী তাঁর কাছে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বলেছিল, দয়াল তুমি ওকে চরণে রাখ—

এবার মাধবানন্দ তাঁর পা টেনে নিয়ে সরে এসে বলেছিলেন, দূর থেকে প্রণাম কর। পায়ে হাত দিয়ে নয়।

তারপরই যে কথাটি বলেছিলেন—সে কথা কথা নয়—সে কথা মর্মচ্ছেদী উত্তপ্ত লৌহশলাকা। বলেছিলেন, পাপিষ্ঠা কোথাকার!

কৃষ্ণদাসীর কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ছিল না। এদের এই বাক্‌ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর পরিচয় বাল্যকালের। তাঁর বাল্যকালে ঠিক এমনি একটি বৈষ্ণবী ছিল তাঁদের গ্রামের কাছে। তারও ছিল একটি পালিতা কন্যা। গান গাইতে আসত। তাঁদের কাছারিতে বৈষ্ণব-পর্ব বৃত্তি নিতে আসত; দোলে-ঝুলনে-রাসে-জন্মাষ্টমীতে দু আনা হিসেবে বৃত্তি। মেয়েটি তোতাপাখির মত কথা বলত—বৈষ্ণবী বুলি, গানের সময় মন্দিরা বাজাত, সুরে সুর মেলাত। মাধবানন্দের সঙ্গে বয়সের অল্পই পার্থক্য ছিল ভামিনীর; মেয়েটির নাম ছিল কৃষ্ণভামিনী। সে-ই কিছু বড় ছিল। কৃষ্ণভামিনী গান গাইত, তিনি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন। তের-চোদ্দ বছর বয়সে কৃষ্ণভামিনী ঠিক মোহিনীর মত হয়ে উঠল। মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে সে রাঙা হয়ে উঠত। মাধবানন্দের বয়স তখন বারো-তেরো। কিন্তু বাড়ির কুস্তিগীরের সঙ্গে আখড়ার মাটি মেখে এবং দুধ ঘিয়ের প্রাচুর্যে তখনই তিনি মাথায় বেড়ে উঠেছেন, দেহে শক্তির জোয়ার এসেছে। অস্ফুট ভাবে অনেক আভাস দূরে-ফোটা নাম-না-জানা ফুলের গন্ধের মত তাঁর নাকে আসতে আরম্ভ করেছে। গভীর রাত্রে আধোঘুমের মধ্যে দূরে-ফোটা কামিনীফুলের গন্ধে চঞ্চলতার মত একটা চঞ্চলতা তিনি অনুভব করতেন ভামিনী কাছে এলে।

ভামিনীর পালিকা মা প্রৌঢ়া বৈষ্ণবী ঠিক এমনি ধরনের কথা বলত। বলত, গোবিন্দের চেয়ে রাধা কিছু বড়ই ছিল গো, কিশোর ঠাকুর। বলে হাসত।

গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক ওই বৈষ্ণবীই তাঁকে প্রথম শুনিয়েছিল। বলেছিল, জান কিশোর ঠাকুর, কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দে আছে—সে দিন আকাশে খুব মেঘ করেছে, সে ঘনঘটায় নীল আকাশ ঘনশ্যাম হয়ে উঠেছে। গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকছে, বৃন্দাবনের বনে একে কালো তমাল-গাছের ভিড়, তার উপরে রাত্রিকাল। মহারাজ নন্দ যুবতী রাধাকে ডেকে তার হাতে কিশোর কৃষ্ণকে দিয়ে বললেন—রাধে, তুমি আমার দুলাল মাধবকে নিয়ে ঘরে দিয়ে এস। বল তো কিশোর ঠাকুর, ভামিনী তোমাকে দাঁড়িয়ে আসে বাড়ি পর্যন্ত।

সন্ধ্যাবেলা সেদিন মা ও মেয়ের সঙ্গে তাঁর গ্রামপ্রান্তে দেখা হয়েছিল।

কয়েকটা কথা তিনিই বলেছিলেন ডেকে ; তারপর অকস্মাৎ সন্ধ্যার কথা মনে হতেই বলেছিলেন, আজ বাড়ি যাই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। মা বকবেন।

বৈষ্ণবী ওই কথাই বলেছিল সে দিন ; অবশ্য ভামিনীকে দাঁড়িয়ে দেবার জন্য সঙ্গে নেন নি তিনি—সলজ্জ ভাবে 'ধেৎ' বলে নিজেই চলে এসেছিলেন। কিন্তু সে কথা মনে আজও আছে। এবং আরও মনে আছে—তাঁর মা সেদিন তাঁকে মৃদু ভৎর্সনা করেছিলেন, চোখ দিয়ে তাঁর জল পড়েছিল, কথা বলতে বলতে সেইদিনই তাঁর বাপের, তাঁদের বংশের অন্ধকার ঘরের ইতিহাস ছেলের সামনে খুলে ধরেছিলেন। সে অন্ধকার ঘর—বাইরের নাটমন্দির দেবমন্দির কীর্তিকলাপ সব-কিছুর চেয়ে অনেক বিপুল অনেক বিশাল ; বিরাট এক গ্রাস বিস্তার করে সে এগিয়ে আসছে, একদিন উদরসাৎ করে নিশ্চিন্ত হবে। ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত চোখের জল তাঁর সর্বাঙ্গে ঝরে পড়েছিল। সেই বৎসরই হল তাঁর উপনয়ন। মা দিলেন দীক্ষা। শিক্ষার ভার নিলেন এক আচার্য। এবং সেই বৎসরই তাঁরই জ্ঞাতি দাদার কুঞ্জে কৃষ্ণভামিনী দাদার সাধনসঙ্গিনী হয়ে প্রবেশ করল। অমাবস্যার অন্ধকারে—এরা জোনাকীপোকার মত মেকী জ্যোতির ছলনা, তেমনি দুর্গন্ধময়—তেমনি বিষাক্ত। সেই কারণেই জিহ্বা তাঁর অসঙ্কোচে উচ্চারণ করেছিল—পাপিষ্ঠা কোথাকার !

মোহিনী চোখ মেলে চাইল।

সামনেই দাঁড়িয়ে মাধবানন্দ। তিনি ভাবছিলেন, চলে যাবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে মোহিনী। আশ্বাসের দীর্ঘনিশ্বাস। সামনে নবীন গোঁসাই, তা হলে আর ভয় নাই। তারপর তার চোখে পড়ল, সে নৌকোর উপর শুয়ে আছে। তা হলে নবীন গোঁসাই তাকে বাঁচিয়েছেন ! সে ছবি যে তার চোখের উপর ভাসছে। বন্দুকের শব্দ শুনে চোখ ফিরিয়ে সে দেখেছিল, নবীন সন্ন্যাসীকে তলোয়ার হাতে অভয়দাতা দেবতার মত। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। তারপর আর তার মনে নেই। চেতনা আসায় তাঁকে এত কাছে সামনে দেখে তার আর কোন ভয় রইল না। সংশয় রইল না। গৌর তাকে বাঁচিয়েছেন ! তার চোখ ফেটে জলধারা বেরিয়ে এল, টলমল করে উঠল চোখ দুটি। পরম নিশ্চিন্ত

ভয়ে সে চোখ বুজলে, ভয় নেই—গৌর তাকে রক্ষা করেছেন, তাঁরই নৌকায় তাকে ঠাঁই দিয়েছেন, সামনে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন—আবার কী? চোখের নেমে-আসা পাতা ছুটির চাপে চোখের কূলে কূলে ভরা জল দরদর ধারায় বেরিয়ে এল—

—জ্ঞান হয়েছে। কে কথাটা বললে, বুঝতে পারলে না মোহিনী। তবে গৌর নয়। তার হাত তুলে নিয়ে নাড়ী দেখে বললে, দুর্বলতা কমে আসছে। তবে বিশ্রাম প্রয়োজন। আকস্মিক দুরন্ত ভয়ে হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

—এই নৌকাতেই এদের—কোথায় বাড়ি সেই গ্রামের ঘাটে পৌঁছে দাও।—এ কণ্ঠস্বর তাঁর, চোখ মেললে মোহিনী। দেখলে, পিছন ফিরে চলে যাচ্ছেন তিনি। নৌকাটি অল্প দুলছে। মাধবানন্দ নৌকা থেকে নেমে পড়লেন।

মোহিনী উঠে দেখবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রৌঢ় সন্ন্যাসী বারণ করলেন, উঠো না। উঠো না।

মোহিনী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল—জেদ করবার মত তার মনের ধাতুর দৃঢ়তাই নেই, একবার কাতর অনুনয়ে বলতেও পারলে না—গৌরের চরণের একটু ধুলো!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে শুয়ে পড়ল। এতক্ষণে সে প্রশ্ন করলে, মা? আমার মা?

—আছে। এই যে বসে আছে।

কৃষ্ণদাসী সেই থেকে পাথরের মত বসে আছে; চোখে শুধু নিষ্পলক দৃষ্টি।

দূরে বনের মধ্যে তখনও নাকাড়া বাজছে। ওপারের ভিড় কমে এসেছে, কিন্তু এখনও অনেক লোক জমে রয়েছে। কিছু লোক এপার পর্যন্ত এসেছে। চারিদিকে উত্তেজনার চিহ্ন এখনও বিকীর্ণ হচ্ছে—পুড়ে-যাওয়া ঘরের ভস্মস্তূপের উত্তাপের মত। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করছে।

মাধবানন্দ তীরে উঠবামাত্র একদল লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। সেদিন যারা তাঁকে নৌকার উপর সূর্যবন্দনার সময় সকালের আলোয় তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, আজ তারা তাঁকে আর একরূপে দেখেছে। রূপে মানুষ মুগ্ধ হয়—বীর্যে মানুষ অভিভূত হয়ে নত হয়। তারা দুইই হয়েছে। মাধবানন্দ

প্রশ্ন করলেন, ওপারে কী হয়েছিল—কেউ বলতে পার? আমি সূত্রপাত দেখে এসেছিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার—একজন সন্ন্যাসীর প্রায় ওপরে পড়বার উপক্রম হতেই সন্ন্যাসী ঘোড়ার লাগাম ধরে এমনি টান দিয়েছিল যে ঘোড়াটা পড়ে যায়—

—হ্যাঁ। ইলেমবাজারের ছোট দাস-সরকার।

—হ্যাঁ, কয়েকবারই নামটা শুনেছি। ইলামবাজারের খুব বড় গদিওয়ালার ছেলে। খুবই দুর্ধর্ষ! চিৎকারও করছিল, হামারা কোই হ্যায় রে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এখানকার লেঠেল-টেটেল সবই ওদের টাকা খায়। তা ছাড়া ছোট দাস-সরকার ওদের নিয়ে ইয়ার বক্সীর মত ওঠে বসে। মদটদ খায়। আর কাছেই লাউসেন তালাওয়ের চারিপাশে অনেক ডোম লেঠেল আছে। তারা খবর পেয়ে 'হারে রে' করে ছুটে আসে। ওরা লাঠি-বাজি পেলে আর কিছু চায় না, দাঙ্গাতে ভারি নেশা—

—থাক্ সে কথা। ওপারের ঘটনাটা শুধু জানতে চাচ্ছি।

ছোট সরকারের হাঁকে তারা এসে জমেছিল। তারপর বচসা গালাগাল। সরকার খুব গালাগাল করে হুকুম দিয়েছিল—দে বেটাদের পিটে ভাগিয়ে। কেড়ে নে হাতী ঘোড়া যা পারিস। ওরে বাবা, সঙ্গে সঙ্গে নাগারা সড়কি তলোয়ার বার করে—

—কেউ কি মরেছে? জখম হয়েছে?

—সরকারের দলের একজন মরেছে। জখম হয়েছে পাঁচ-সাত জন। সরকারের পাখানা আগেই জখম হয়েছিল, দাঙ্গার সময় পালাতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে নাকে খুব চোট খেয়েছে। আর যাত্রীদের মধ্যে পালাতে গিয়ে পায়ের চাপে জন কতক জখম হয়েছে। হাতীর পায়ের চাপে এক বুড়ী মারা গিয়েছে।

মাধবানন্দ ভিড় ঠেলে বাইরে এলেন।

নৌকাটা তখন ইলেমবাজারের ঘাটের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। ওপারের চরের পায়ে-হাঁটা পথ ধরে একজন লোক ছুটছে আর চিৎকার করছে।

—কয়ো ঠিক যেছে মা-জী—তুমি ভেবো না। কয়ো ঠিক চলছে সঙ্গে সঙ্গে মা-জী।

ঘটনাটার কয়েকদিন পর। মাধবানন্দ ভোরবেলা উঠেই প্রবীণ সন্ন্যাসী কেশবানন্দকে ডেকে বললেন, এ কয়েকদিন দুশ্চিন্তায় আমার নিদ্রা হচ্ছে না কেশবানন্দ। আমি বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

কেশবানন্দ বড় ধীর মানুষ, পশ্চিমদেশীয় লালা-বংশের লোক; জীবনে রাজকর্মে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী বংশের সন্তান। সংসারে নিঃসন্তান পত্নীর অনাসক্তি এবং গুরুর প্রতি ভক্তির বাহুল্য দেখে তিক্ত হয়ে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মাধবানন্দের সঙ্গে পরিচয় হয় কাশীতে। মাধবানন্দের নূতন সাধনা তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। আশ্রম সংগঠনের কল্পনা-বুদ্ধি সবই তাঁর। মাধবানন্দের এই কথা কটি শুনে তিনি চুপ করেই রইলেন। প্রতীক্ষা করে রইলেন চিন্তার কারণ শুনবার জন্য। উত্তর তার পর দেবেন।

মাধবানন্দ বললেন, কালকের ঘটনার কথাই বলছি। ঘটনাটা লোকের মুখে মুখে অনেক বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। আমি ভাবছি আমাদের বন্দুক এবং অন্যান্য অস্ত্রের কথা, আমাদের লোকবলের কথা নবাবী কাছারিতে গিয়ে না পৌছয়। ওপারে কেন্দুলীর মহান্তের গদিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি না করে।

আবার কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, স্থানীয় লোকের কাছেও খানিকটা সন্দেহের স্থল হয়ে পড়বে আমাদের আশ্রম। কী মনে কর তুমি?

—অসম্ভব তো নয়ই এবং তাই সম্ভব। কিন্তু—

—বল।

—তাতে বিচলিত হলে বা ভয় পেলে তো চলবে না।

—না। তা চলবে না।

কেশবানন্দ বললেন, স্থানীয় লোকের সন্দেহ কেন্দুলীর মহান্তের চাঞ্চল্য বা শত্রুতাও যদি হয় তাতে আমাদের বিচলিত হবার কোন হেতু নেই। ভয় শুধু নবাবের। কিন্তু সুজাউদ্দীন যতদিন গদিতে আছে ততদিন নবাব-দরবারেও খুব আশঙ্কা আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ নবাব সুজাউদ্দিন বিলাসী এবং অলস, নিতান্তই দেহলালসায় আবদ্ধ জীব। এই সব কারণে তিনি শান্তিপ্রিয়। তার উপর লোকটি হিসাবী। উড়িষ্যায় নায়েব তকীখাঁর অত্যাচারে পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথ-বিগ্রহমূর্তি চিল্কা হ্রদের অপর পারে স্থাপন করবার সংকল্প করেছিল। এক বছর নিয়েও গিয়েছিল। তাতে উড়িষ্যায় তীর্থযাত্রীর অভাবে রাজস্ব কমে গিয়েছিল। নবাব সুজা সঙ্গে সঙ্গে তকীখাঁকে সরিয়ে দিয়ে কুলিখাঁকে পাঠিয়েছেন। আপনি আমার উপর ভরসা রাখুন—এই ঘটনা উপলক্ষ্য করেই আমি উপঢৌকন নিয়ে মুরশিদাবাদ গিয়ে আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কিছু অস্ত্র রাখবার অনুমতি নিয়ে আসি।

—আমি আরও এক ঠাঁই থেকে বিরোধিতার আশঙ্কা করছি। হেতম-পুরের ফৌজদারের। হেতমপুরের ফৌজদার রাজনগরের রাজা উপাধিধারী মুসলমান নবাবের অধীন।

—জানি।

—রাঘবপুরের ব্রাহ্মণ জোতদার রাঘবরায়ের কথা শুনেছ? রাঘবপুর থেকে সে ব্রাহ্মণ আজ নির্বাসিত। সেখানে অত্যাচারী কোম্মর খাঁয়ের সন্ততিরা বাস করছে। রাঘবানন্দকে দমন করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। হেতমপুরে গড় তৈরী হয়েছে সেই কারণে। তাদের বিরোধিতা আশঙ্কা করছি। বীরভূমের এলাকা অজয়ের ওপারে—এপারে তাদের অধিকার নেই। কিন্তু এত কাছে হিন্দুর মঠে শক্তির সন্ধান পেলে তারা স্বাভাবিক ভাবেই চঞ্চল হবে। হেতমপুর এখান থেকে মাত্র কয়েক ক্রোশ। সবচেয়ে বড় আশঙ্কা আমার ওখানে। ওরা পরকীয়া-তত্ত্ব, তার বিকৃতি—এ সব বুঝেও বুঝতে চায় না। বরং এই তত্ত্বের উপর একটা অলৌকিক রহস্য আরোপ করে খুশী হয়। অনেকে প্রলুব্ধও হয়। তুমি জান না, এ দেশে অনেক

মুসলমান আমীর গোপনে কুঞ্জ করে বৈষ্ণবীদের কীর্তন শোনে; কাঁদেও অনেকে; মালাও জপে। তারা রাধাহীন কংসারি কৃষ্ণের উপাসনা বুঝতে চাইবে না। রাজতন্ত্রের সে কাল চলে গেছে কেশবানন্দ, যে কালে প্রজার আধ্যাত্মিক কল্যাণ চরিত্রগঠন রাজা নিজের দায়িত্ব বলে গ্রহণ করত। আজকাল প্রজা ভ্রষ্টচরিত্র আত্মিক শক্তিতে দুর্বল হলেই রাজা নিশ্চিন্ত। বিশেষ করে রাজা এবং প্রজা যেখানে ভিন্নধর্মাবলম্বী। হিন্দুস্থানের মাথাভাঙা দেউলগুলো শুধু আমাদের চোখেই পড়ে না, তারাও দেখে আমাদের সঙ্গে। কল্কি অবতারের প্রত্যাশার কথা তো তারাও শোনে—জানে; কংসারি কৃষ্ণ দেখে তাকেই কল্কি বলে ব্যাখ্যা করা বা মনে করা তো স্বাভাবিক।

কেশবানন্দ চুপ করে রইলেন। কোন উত্তর দিলেন না।

—কেশবানন্দ!

—আপনি কি স্থানান্তরে যাওয়ার কথা কল্পনা করছেন?

—করি নি। ভাবছি। ভাবছি, প্রারম্ভেই এই বিঘ্ন!

—ভেবে দেখুন। আমি ইতিমধ্যে আরও কিছু বল সংগ্রহের চেষ্টা করি। আমাদের আশ্রমকে সুদৃঢ় করে তুলি। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। তামাম হিন্দুস্থানে বাদশা ঔরংজীবের পর সব সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ সাড়া জেগেছে গুরু মহারাজ। রাজেন্দর গিরি গোঁসাইকে নিজের চোখে আপনি দেখে এসেছেন। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য'। এ ছাড়া পথ নেই গুরু মহারাজ।

—পথ নেই? প্রশ্নের সুরে কথাটিকে আকাশলোকের দিকে উচ্চারণ করে বোধ করি উত্তরের জন্য সেই দিকেই চেয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, না কেশবানন্দ। আমি স্বীকার করি নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য, কিন্তু সে বল নিছক অস্ত্রবল নয়, প্রতিশোধের জন্য তার প্রয়োগ নয়; তার প্রয়োগ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য। তার প্রেরণা হিংসা নয়, আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, তার প্রেরণা ন্যায়বোধ। তার উৎস চরিত্রবল এবং সংযম। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-সাড়া আমি দেখেছি সে-সাড়ার মধ্যে হিংসার রক্তচক্ষু দেখেছি, কুটিল আক্রোশের গর্জন শুনেছি। আমি তো সে পথের পথিক নই। আমার সাধনা চরিত্রের, সংযমের, সাহসের, চৈতন্যের। মানুষকে আমি

কল্যাণ-চৈতন্যে জাগাতে চাই। প্রতিরোধ চাই, প্রতিশোধ নয় কেশবানন্দ। তাতে অকল্যাণ। মহাপ্রভুর এই প্রেমধর্ম আমি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি। সেখানে কোন বিরোধ নেই।

কেশবানন্দ প্রবীণ মানুষ, দীর্ঘকাল রাজকর্মে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর মুখভাবের মধ্যে মনোভাব কখনও প্রকাশ পায় না। তিনি প্রশ্ন করলেন ধীর কণ্ঠে, আপনার কী অভিপ্রায় বলুন ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না। ভেবে দেখি। আমি ভাবছি—

—কী বলুন, যদি বাধা না থাকে ?

—বাধা থাকলে কথাটা তোমার কাছে উত্থাপন করব কেন ? গুরু হলেও আমি বয়সে তোমার চেয়ে ছোট। তোমার পরামর্শ চাই বলেই কথা উত্থাপন করেছি। আমি যদি, কেশবানন্দ, হেতমপুরের ফৌজদারের সঙ্গে দেখা করে সব বুঝিয়ে বলি ?

—নিজে থেকে যাবেন ! রাজচরিত্রের স্বভাব হল সবই বিপরীত দিক থেকে দেখা।

—আমার একটি অজুহাত আছে কেশবানন্দ। অবশ্য অজুহাত কথাটা ঠিক নয়। এ ঘটনাটা না ঘটলেও আমাকে একবার যেতে হত। কয়ো লোকটিকে দেখেছ, সে এই আশ্রমের কাছে কোথাও একটি বহুমূল্য নীলা কুড়িয়ে পেয়েছে। রত্নটি সে আমার ভেবেই আমাকে দিতে এসেছিল, কিন্তু সে আমার নয় শুনে বললে—তা হলে সেই মোগল-বিবির হবে। হেতমপুরে এখন যে হাফেজ খাঁ—হাতেম খাঁয়ের সর্বাধিক প্রিয় পাত্র, পুত্রাধিক প্রিয়, সর্বেসর্বা—সেই হাফেজ খাঁ ওখানে কর্মলাভের পূর্বে প্রথম এই বনের এই দেউলে এসে উঠেছিল। হয়তো নিতান্তই কর্মসন্ধানীর মত পথের মধ্যে আশ্রয় দেখে বিশ্রাম করেছিল। হয়তো বা, কেশবানন্দ, তা ছাড়াও আরও কিছুর মত—পলাতকের মত। কারণ লোকান্তর ছেড়ে এই বনে তার পরমাসুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে আশ্রয় নেওয়াটা ঠিক যেন স্বাভাবিক বলে মনে হয় না। কয়ো বলে, এমনি রত্ন সে দেখেছিল সেই মেয়েটির আভরণের মধ্যে। আমি তারই একটা সন্ধান করতে যেতামই ; তাই যাব। সেই সূত্র ধরেই কথা তুলব।

—অপেক্ষা করুন মহারাজ। দেখুন, ফল কী হয় !

মাধবানন্দ বললেন, অপেক্ষা করতে বলছ? আচ্ছা। তাই হোক। দেখি।

মাধবানন্দের আশঙ্কা অমূলক নয়। আর দিন পাঁচেক পরেই ওপার থেকে কেন্দুলীর মহান্ত ভরত দাস সংবাদ পাঠালেন। একজন শিষ্য এল একখানি লিপি নিয়ে। দেবনাগরীতে ব্রজভাষায় লেখা পত্র—

"কংসারি দ্বারকাধীশ শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের সেবক মাধবানন্দজী, তোমার ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন। মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী-স্নানপর্বে দুর্বৃত্তদমনে তোমরা যে বীর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ—তাহার জন্য দেবতা অবশ্যই প্রসন্ন হইয়াছেন। কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হইলে অসুরেরা অপ্রসন্ন হয়। সে অপ্রসন্নতার সংবাদ তোমাকে জানাইতেছি। ইলামবাজারের ধনী তুলা ও গালা-ওয়ালা রাধারমণ দে-সরকারের পুত্র সেদিনের সেই হাঙ্গামার মূল —অক্রূর দে-সরকার তোমার উপর উপদ্রব অত্যাচারের সংকল্প করিয়াছে এবং ষড়যন্ত্র করিতেছে। কারণ ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছি না—তবু সংবাদ সত্য। সম্মুখ-সংঘর্ষে সাহসী না হইয়া সে স্থানীয় বীরভূম রাজের ফৌজদার হাতেম খাঁয়ের নিকট তোমার বিরুদ্ধে অনেক শিকাইত করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে রাঘবপুরের রাঘবানন্দ রায় নামক ব্রাহ্মণের সঙ্গে অনেক হাঙ্গামা হইয়াছিল—প্রজা-বিদ্রোহ হইয়াছিল। সে-কারণ ফৌজদারের সহজেই উৎকণ্ঠিত হওয়ার কথা। তাহার উপর নানান স্থানে তীর্থপথে 'সন্ন্যাসীদের' দ্বারা লুঠতরাজের সংবাদ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সকলেই ছদ্মবেশী বর্গী নয়। সুতরাং হাতেম খাঁ অবশ্যই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইবে। কেবল এলাকা তাহার নয়—বর্ধমানের এলাকা বলিয়াই ইতস্তত করিতেছে। তোমার অবগতির জন্য সব জ্ঞাত করিলাম।"

পরিশেষে পুনশ্চ লিখেছেন—"ইলামবাজার দাস-সরকারের এলাকা। সেখানে কোন কারণেই যাওয়া সঙ্গত হইবে না।"

কেশবানন্দ বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না। দাস-সরকারের ওই বন্যশূকরের মত পুত্রটাকে ভয় করবার কোন হেতু নাই। বন্যশূকরের উপদ্রব তৃণভূমিতে, কন্দজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে; নদীর পলিমাটিতে; শালকাণ্ডকে

তার ওই দাঁত দিয়ে ফেড়ে ফেলা যায় না। আমিও এই কদিন নিশ্চিন্ত বসে নেই। লোক সংগ্রহ করেছি। অশ্বও সংগ্রহ করেছি। এবং হেতমপুরের ফৌজদারের ডান হাত সেই হাফেজ খাঁ সম্পর্কেও আমি সন্ধান করছি। আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে গুরু মহারাজ, যদি তা সত্য হয়—তা হলে সে আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না।

মাধবানন্দ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকালেন কেশবানন্দের দিকে।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি সেদিন নীলার কথা বললেন। তাই থেকে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। আপনি কি মথুরার ঘাটে দিল্লীর বাদশাহ-বংশের সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের কথা ভুলে গেছেন গুরু মহারাজ! হুসেন আলি—! চোখের কোলে সেই আশ্চর্য কালির দাগ!

হুসেন আলি! সুপুরুষ অভিজাত বংশের সন্তান—সুন্দর মুখে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ। বড় বড় চোখ দুটির কোলে আশ্চর্য কালো দাগ! মনে পড়েছে বইকি। হঠাৎ একখানা নৌকা এসে ভিড়েছিল তাঁর বজরার গায়ে; নৌকা থেকে বজরায় উঠে বলেছিল—হিন্দু ফকির, শুনেছি তোমরা গণনা করে অনেক কিছু বলতে পার তুমি কিছু পার? না, বুজরুক!

মাধবানন্দের চোখে অগ্নিকণা বিচ্ছুরিত হয়েছিল। কিন্তু চতুর কেশবানন্দ তাঁকে আড়াল করে সামনে এসে তার সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এক কালের বিজ্ঞ রাজকর্মচারী—সুচতুর বুদ্ধিধর লালা-বংশের সন্তান—অতি সহজেই মদ্যপ হুসেন আলির সঙ্গে কথা বলে তার কাছ থেকে কথা সংগ্রহ করেই তাকে উত্তর দিয়ে তুষ্ট করেছিলেন। মাধবানন্দ কথাটা বিস্মৃত হয়েছিলেন।

হুসেন আলি বলেছিল, তার প্রেয়সী বাদশাহ-বংশেরই কন্যা আমিনা ওসমান বলে এক ওমরাহপুত্রের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়েছে। হুসেন আলি তাদেরই সন্ধান করে বেড়াচ্ছে। যত দূর সংবাদ পেয়েছে তাতে তারা আগ্রার দিকেই এসেছে।

চতুর কেশবানন্দ বলেছিল, আগ্রা বোধ হয় ত্যাগ করেছে তারা এতক্ষণে। গণনা করে দুজনের আকৃতি এবং রূপও বর্ণনা করেছিল, ঠিক মিলিয়ে দিয়েছিল। এমন কি অলঙ্কারও। সেই প্রসঙ্গে বলেছিল, বহুমূল্য রত্ন রয়েছে যেন। নানা বর্ণের নীলা—

সঙ্গে সঙ্গে হুসেন বলেছিল, নীলা। বহুমূল্য নীলা সেখানা। বাদশাহ্ শাহজাহান যে সব জহরতকে পেয়ার করতেন, শেষ দিন পর্যন্ত নিজের কাছে রেখেছিলেন, তারই মধ্যে ছিল ওই নীলাখানা। কোনক্রমে এসেছিল আমাদের হাতে। ওই নীলাখানা আমি তাকেই দিয়েছিলাম।

কেশবানন্দ বললেন, আমার বিশ্বাস, গুরু মহারাজ, এরা তারাই। কয়োর কুড়িয়ে পাওয়া ওই নীলা বহুমূল্য। বাদশাহী জহরত বলেই আমার ধারণা। ওই নীলা থেকে এবং তারা যে ভাবে এই বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল যার কৈফিয়ত একমাত্র আত্মগোপন ছাড়া কিছু হতে পারে না, এই দুই তথ্য থেকে আমার ধারণা এরা তারাই। এ কথা ঘুণাক্ষরে তার কানে তুললে সে আমাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করতে বাধ্য। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

—চিন্তা! না। চিন্তার আমার অবসর নেই বর্তমানে কেশবানন্দ। চৈত্রের শেষ হবে কাল। বৈশাখ মাস তপস্যার মাস। সেই চিন্তাই আমার একমাত্র চিন্তা বর্তমানে।

দ্বাদশ রাশিতে সূর্য দ্বাদশ মাসে অবস্থান করবেন, তাঁর সপ্তাশ্ববাহিত রথে বারো মাসে বারোটি রাশি পরিভ্রমণ করে পৃথিবী-পরিক্রমা শেষ করেন আর বিষ্ণুপ্রিয়া ধরিত্রী দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ যাত্রায় দ্বাদশ উপাচারে পূজা করেন। বৈশাখে মেষ রাশিস্থ ভাস্করে প্রখরতম তাপের দিনে অগুরুচন্দনের লেপন প্রস্তুত করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ চর্চিত করে দেয়। প্রখর উত্তাপ! বড় ক্লেশ হবে। চৈতন্যময় পরমপুরুষ স্নিগ্ধ শান্ত হলেই সব স্নিগ্ধ শান্ত।

মাধবানন্দ দেব-অঙ্গ চন্দনচর্চিত করে দিলেন। তারপর একে একে আশ্রমের সকলেই চন্দন অর্ঘ্য দিলেন ভগবানের ভাব-বিগ্রহের চরণে। নিজের নিজের মস্তকে ললাটে এবং বুকে চন্দন-প্রসাদের তিলক এঁকে নিলেন। এবং এর পর গোস্বামীরা একে একে বার হয়ে গেলেন।

এ মাসে অনেক কাজ। কাজ নয় ব্রত। বৈশাখ ব্রতেরই মাস। সবচেয়ে বড় কাজ এ মাসে জলদানের কাজ। অনেকগুলি জলসত্রের ব্যবস্থা করেছেন মাধবানন্দ। এই সুদীর্ঘ বহুক্রোশব্যাপী অরণ্যের মধ্য দিয়ে বহুকালের সড়ক

চলে গিয়েছে। এদিকে বর্ধমান থেকে, ওদিকে বহু দেশান্তর পার হয়ে চলে গিয়েছে, পঞ্চনদ পর্যন্ত। আবার রানীগঞ্জের ওখানে দামোদর পার হয়ে, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পার হয়ে চলে গিয়েছে শ্রীক্ষেত্র। সুদীর্ঘ অরণ্যপথে ছায়া সুলভ, কিন্তু জল সুলভ নয়। মধ্যে মধ্যে অনেক ছোট ছোট নালা-নদী এদিকে অজয়, ওদিকে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে, কিন্তু বনের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করা শক্ত; দূর থেকে দেখা যায় না, চলার পথে বনের আড়াল থেকে হঠাৎ সামনে পড়ে; তার উপর গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে যায়; দামোদর এবং অজয়ের নিজেদেরই অবস্থা ওই সময় উপবাস-ক্লিষ্টের মত বিশীর্ণ; বালিয়াড়ির মত ধু-ধু করে। বৈশাখ-দ্বিপ্রহরে গরম বাতাসে বালি ওড়ে। মধ্যে মধ্যে দু-চারটি অতি তৃষ্ণার্ত পথিকের নদীর বালির উপর পড়ে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষ করে দামোদরের গর্ভে। দামোদরের এক-কূলবর্তী স্রোতের জলের আশায় তৃষ্ণার্ত পথিক বিশাল বালুময় বুকের উপর দিয়ে আসতে আসতে মাথার উপর সূর্যের এবং পায়ের তলায় বালির উত্তাপে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু হয়। কিছুক্ষণ মুখ ঘসড়ায় বালিতে, নাক-মুখ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তারপর শেষ হয়ে যায়। এদিকে অজয় অবশ্য এতখানি নয়, এবং অজয়ের ওপার দিয়ে যে পথ, সে-পথ এমন অরণ্যসঙ্কুলও নয় আর এ পথটির মত এমন গুরুত্বপূর্ণও নয়। পশ্চিমে নগরী অর্থাৎ রাজনগর থেকে উত্তরে রাজমহল পর্যন্ত পথের যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু খুবই বেশী লোকজন হাঁটে না। তবে ওদিকে এক-একটা খাঁ-খাঁ করা মাঠ আছে। গ্রাম নেই, গাছ নেই, জলাশয় কদাচিৎ চোখে পড়ে। এমন প্রান্তরে পড়েও মানুষ তৃষ্ণায় মরে। এই দুই দিকেই আশ্রমের ব্যয়ে ও উদ্যোগে জলসত্র খোলা হবে। বৈশাখে জলদান শ্রেষ্ঠ দান। প্রতি স্থানের জলসত্রে স্থানীয় কর্মীরাই অবশ্য প্রধান হয়ে থাকবে। সেখানকার লোক বেছে ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে। ছোলা, গুড়, জলের জালা—খরচপত্র সবই আশ্রমের, তত্ত্বাবধানও করবে আশ্রমের গোস্বামীরাই, কিন্তু হাতে-কলমে সব-কিছু করবার দায়িত্ব স্থানীয় লোকের। প্রতি সত্রে জল সরবরাহের জন্য এক-একখানা গরুর গাড়ি কেনা হয়েছে। এ ছাড়াও আরও কর্ম গ্রহণ করেছে আশ্রম। সন্ধ্যায় গোস্বামীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে

ভাগবত-কথা শুনিয়ে আসবেন। বলে আসবেন, "মানুষ অসত্য থেকে সত্যে চল, অসততা থেকে সততায় চল, অশুদ্ধতা থেকে শুদ্ধতায় চল, আচার আর অন্ধবিশ্বাস থেকে চৈতন্যে জাগো।" এই তো সাধন। সেবা এবং ভগবদ্‌-গীতির পুণ্যে চৈতন্যময়ের পূজা।

মাধবানন্দ নিজে নিয়েছেন পঞ্চতপার মত ব্রত। পঞ্চতপা নয়। আশ্রমের উঠানের ঠিক মাঝখানে বড় নিমগাছটার তলায় মাটি-বাঁধানো বেদীটির উপর বসে সমস্ত দিন হোমকর্মে মগ্ন থাকবেন; অর্থাৎ সারাটা দিন বাইরে থেকে সূর্যকিরণকে যথাসম্ভব দেহে মনে গ্রহণ করবেন। জলগ্রহণ করবেন সূর্যাস্তের পর।

* * *

"ওঁ বৈশাখে মাসি মেষ রাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে—" দিনশেষে মাধবানন্দ মন্ত্র উচ্চারণ করে হোমাগ্নিতে শেষ আহুতি প্রদান করছিলেন। একখানি গরুর গাড়ি এসে আশ্রমের মধ্যে ঢুকল। গাড়িখানি মাটির জালা, বড় বড় মাটির কলসী, কয়েকটা বস্তা প্রভৃতি জলসত্রের সরঞ্জামে বোঝাই। কোন স্থানের জলসত্রের গাড়ি ফিরে এল; সঙ্গে একজন তরুণ সন্ন্যাসী আর একজন সন্ন্যাসী, সে ওই গোপালানন্দের দলভুক্ত।

কেশবানন্দ প্রশ্ন করলেন, এ কী, তুমি ফিরে এলে যে গাড়ি নিয়ে?

গাড়িগুলির ফেরার কথা নয়, সন্ন্যাসীদেরও নয়, যে গ্রামে জলসত্র দেওয়া হয়েছে সেই গ্রামেই তাদের বৈশাখী সংক্রান্তি পর্যন্ত থাকবার কথা।

মাধবানন্দ বারেকের জন্য সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে আবার আপন কর্মে মন দিলেন। আপন অজ্ঞাতসারেই বোধ করি ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

—একটা হাঙ্গামার জন্য ফিরে আসতে হল গোস্বামী মহারাজ।

—হাঙ্গামা? কী হাঙ্গামা?

—আমাদের জলসত্রে কেউ জল খাবে না মহারাজ। কাউকে খেতেও দেবে না। আমরা 'রাধা'কে বর্জন করেছি। গোটা গ্রামটাই আমাদের উপর বিরূপ হয়ে উঠল মহারাজ।

—কই, এ পর্যন্ত তো ঘুণাক্ষরে এ কথার আভাস পাই নি!

—হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল, তা থেকেই এমন হয়ে গেল মহারাজ।

—হঠাৎ কী ঘটল ?

—এক বৈষ্ণবী, মহারাজ, যে বৈষ্ণবী তার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছিল, নদীর চরের উপর গুরু মহারাজ যাদের বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন সেই বৈষ্ণবী—সে কোথায় যাচ্ছিল। পথে তৃষ্ণার্ত হয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের জলসত্রে জলপানের জন্য, অঞ্জলিও পাতলে কিন্তু হঠাৎ জলপান করতে গিয়ে অঞ্জলির জল ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—না। না। না। এ জল নয়—এ আগুন, এ বিষ। এ বিষ। যারা রাধার মধ্যে পাপ দেখে, যারা গোবিন্দের পাশ থেকে রাধাকে বর্জন করেছে, তাদের জলসত্রের জল বিষ, আগুন। সর্বনাশ হবে, ইহলোক যাবে, পরলোক যাবে, যে এ জলসত্রের জল পান করবে। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে গেল সে। চোখ দুটি মেয়েটির বড়। সেই বড় বড় চোখ যেন আগুনের মত জ্বলতে লাগল। চিৎকার করতে লাগল—রাধার প্রেমে কলুষ! হা-হা-হা-রে! ক্রমে লোক জমে গেল। তারপর লোকজনেরা বিরূপ হয়ে উঠল, তারা কেউ কেউ আমাদের সব-কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে চাইলে। দুটো জালা ভেঙেও গেছে। তারপর আরম্ভ হল নামগান। তারা নামগান করতে করতে চলে গেল। আমরা চলে আসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছি। মেয়েটি কিন্তু সাধারণ নয় মহারাজ। অনর্গল তার চোখে ধারা বইছিল। লোকে বললে, সে নাকি সিদ্ধাই-পাওয়া বৈষ্ণবী ; ওদের আখড়ার পাটই সিদ্ধাইয়ের পাট।

কেশবানন্দ বললেন, চলে এসেছ ভাল করেছ। বিশ্রাম কর।

মাধবানন্দ ধীরে ধীরে উঠে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সিদ্ধাই ? কৃষ্ণদাসীর মুখখানা মনে পড়ল ; তার বেশভূষা মনে পড়ল। তার সিদ্ধাই ? সে-সিদ্ধাই কোন্ সিদ্ধাই ?

কেশবানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করলেন, বললেন, চিন্তিত হবেন না গুরু মহারাজ। কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় হবে, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কালই সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামীর কাছে যাব।

সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামী এক তরুণ বৈষ্ণব সাধক। মাধবানন্দ তাঁর

নাম শুনেছেন। এখানকার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাথার মণি। তিনি নাকি অলৌকিক অনেক-কিছু করতে পারেন।

কেশবানন্দ বললেন, আনন্দচাঁদ গোস্বামী, আমি যা শুনেছি তাতে যে সাধনাই তাঁর থাক্ তিনি বিষয়াসক্ত। ঘোরতর বিষয়াসক্ত। এ অঞ্চলের উত্তরাধিকারীহীন বৈষ্ণবদের মৃত্যু হলে তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন তিনি। দক্ষিণা নিয়ে পাপীর পাপমোক্ষণ করে দেন। তাঁর বিগ্রহসেবা আছে, তাঁর বিগ্রহের জন্য কিছু অলঙ্কার নিয়ে যাব আমি।

মাধবানন্দ নীরবে বিগ্রহের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত পর ঘাড় নেড়ে বললেন, না। এমনি যেতে পার। অলঙ্কার নিয়ে নয়।

—গুরু মহারাজ!

বাইরে থেকে ডাকলে শ্যামানন্দ, তার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা এবং উৎকণ্ঠা দুইই রনরন করছে।

—কী? কেশবানন্দ বাইরে গেলেন।

—আরও পাঁচখানা গ্রাম থেকে লোক ফিরে আসছে গুরু মহারাজ। এখানে তারা গাড়ি গরু সব কেড়ে নিয়েছে। আমাদের সেবকদের মারপিট করেছে। সমস্ত জিনিসপত্র ভেঙে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। সুখবাজারে আমাদের সেবক যাদবানন্দের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। তার অবস্থা ভাল নয়।

কেশবানন্দ কঠিন হয়ে উঠলেন, বিস্মিতও হলেন—একটা সামান্য স্ত্রীলোকের এত প্রভাব! সিদ্ধাই! সিদ্ধাই তিনি জানেন। দীর্ঘকাল রাজকর্মে অতিবাহিত করেছেন, এ সব অনেক ঘেঁটেছেন। জানেন তিনি। উন্মত্তের মত চিৎকার কর, হাস, কাঁদ, ধুলোয় গড়াগড়ি দাও, যা খুশি তাই বল—শুধু জোর করে বল, চিৎকার করে বল, অপর সকলের কণ্ঠস্বরকে চুপ করিয়ে দেবার মত জোর দিয়ে বল। তৎক্ষণাৎ লোকে তোমার কথা অলৌকিক বলে মেনে নেবে। সিদ্ধপুরুষ বলে খ্যাতি রটবে। কঠিন অথচ শান্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, কে লোক এসেছে? কোথায় সে? ডাক তাকে এখানে।

বিস্মিত হলেন কেশবানন্দ।

এসব গ্রামে ওই বৈষ্ণবী কিছু করে নি। করেছে অন্য লোক—ইলাম-বাজারের তুলোর গদির মালিক রমণ দাস-সরকারের বর্বর পুত্র, যে সেদিন কেন্দুলিতে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী বর্গীদের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, যার নাকটা তারা ভেঙে দিয়ে গেছে, সেই অক্রূর সরকার। এবং বিস্ময়ের কথাটা হল এই যে, এই বৈষ্ণবীই অক্রূর সরকারের কার্যকলাপে বাধা দিয়েছে। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্—দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ!" যে বৈষ্ণবী চিৎকার করে লোককে এই রাধা-বর্জনকারী আশ্রমের জলসত্রকে বিষ বলে জল খেতে বারণ করলে, লোকজনকে জড়ো করে রাধানাম কীর্তন করে সারা অঞ্চলে মাতন তুললে, সে-ই অক্রূর সরকারের অত্যাচারের স্থানে এসে চিৎকার করে বললে—মহাপাপ। মহাপাপ হবে। বললে—ওই যে বর্বর পিশাচের মত চেহারা ওই যে সরকার, ও সাক্ষাৎ পাপ। সাক্ষাৎ অধর্ম। ওর কথায় তোমরা সন্ন্যাসীর গায়ে হাত তুলো না। জ্বলে যাবে সব, পুড়ে যাবে সব, মহামারীতে ধ্বংস হয়ে যাবে সব। আমি বলছি। আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

এ তো বিচিত্র ব্যাপার!

ভ্রূ ললাট কুঞ্চিত হয়ে উঠল কেশবানন্দের। কী? ঘটনাটার মর্মস্থলের সত্য তা হলে কী?

মাধবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, চৈত্র-সংক্রান্তিতে সংকল্প করে জলসত্রের ব্রত গ্রহণ করেছি, সে তো ভঙ্গ করতে পারব না। এদিকে আমি ব্রত করেছি। প্রথম দিনের হোম হয়ে গেছে। আমি নিজেও তো ব্রত ছেড়ে যেতে পারব না। তোমরা সকলে মিলে পরামর্শ করে স্থির কর—কী করা হবে! সংঘর্ষ আমি চাই না। কিন্তু সংঘর্ষের ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়ার অর্থ—পরাজয়। ব্রতভঙ্গের পরাজয় আর মৃত্যুতে পার্থক্য কোথায়?

কেশবানন্দ বললেন, কাল ভোরবেলা আবার এদের পাঠাব গুরু মহারাজ। অবশ্য ওই গ্রামগুলিতে নয়—অন্য গ্রামে। এবং ওপারে নয়—এপারে। শহর রানীগঞ্জ পর্যন্ত বাদশাহী সড়কের দুই পাশে এই জঙ্গলের পর মরুভূমির

মৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে জলাভাবে পথিকের মৃত্যু ঘটে। ওদের সেই দিকে পাঠাব। আমরা হাত বাড়িয়ে হাত গুটিয়ে নিচ্ছি না গুরুজী। আমরা এ দিকে যে হাতটা বাড়িয়েছিলাম, সেটা অন্য দিকে বাড়াচ্ছি।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, বর্বর অক্রূর সরকার এবং তার বাবা দাস-সরকারের সঙ্গে—হেতমপুরের বৃদ্ধ ফৌজদারের সম্পর্কটা সত্যই নিবিড়। হওয়াই স্বাভাবিক। দাস-সরকার নিজের স্বার্থের জন্য স্বজাতি-জ্ঞাতি-আত্মীয়-ধর্ম সমস্ত-কিছুকেই বিপন্ন করতে দ্বিধা করে না। ব্রাহ্মণ রাঘব রায়ের বিদ্রোহ দমনের সময় দাস-সরকার অনেক সাহায্য করেছে হাতেম খাঁকে। হাতেম খাঁয়ের কাছে তারা আমাদের সম্পর্কে সংবাদও পাঠিয়েছে। সে সংবাদও আমি পেয়েছি। এ ক্ষেত্রে সেবকদের ওপারে পাঠানোর অর্থ—

—প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ! রক্তপাত!

—আমাদের তো রক্তপাতের অধিকার আপনি দেন নি। রক্ত আমাদের দিতে হবে। জীবনও যেতে পারে।

—কংসারির সেবকেরা কি ভীত কেশবানন্দ?

—ভীত নয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহাবীর কর্ণ যখন ভীষণ নাগাস্ত্র ত্যাগ করেছিলেন, তখন কংসারি—কপিধ্বজের অশ্বগুলিকে নতজানু করে, রথটিকে অবনত করেছিলেন—কর্ণের লক্ষ্যরেখার নীচে নেমে গিয়েছিল অর্জুনের মস্তক। ফলে অর্জুনের শিরস্ত্রাণই কাটা গিয়েছিল, অর্জুন ছিলেন অক্ষত। তাতে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কলঙ্কও স্পর্শ করে নাই। আপনি এতে আপত্তি করবেন না।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে মাধবানন্দ বললেন, তোমার কল্যাণ হোক কেশবানন্দ। আজ তোমার কথায় এক মহাসত্যকে আমি উপলব্ধি করলাম।

—কী গুরু মহারাজ?

—কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি হয়, কার্যোদ্ধার হয়—কিন্তু সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। কৌশলের জন্মদাত্রী বুদ্ধি—তারই মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্যভাবে অবস্থান করছে—মিথ্যা। জীবনে যুদ্ধে হোক, সন্ধিতে হোক, বন্ধুত্বে হোক, যেখানে বুদ্ধিকে সর্বস্ব করবে, সেইখানেই মিথ্যা এসে রন্ধ্রপথে শনির মত প্রবেশ

করবে। কৌশলে সত্যরক্ষার অধিকার কারও নেই। অবতারেরও নেই। না, নেই। তার জন্য অবতারকেও মাশুল দিতে হয়। তাতেও জের মেটে না, কাল থেকে কালান্তরে চলে দূষিত জলধারার মত।

ধীরপদক্ষেপে তিনি মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

কেশবানন্দ একটু হাসলেন; গুরুকে তিনি গভীর শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু তিনি বয়সে নবীন। তিনি তো জানেন না এই হৃদয় এই মানবহৃদয়,—সে কত ছলনা করে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

আরও কিছুদিন পর। আষাঢ় মাস। রথযাত্রার দিন।

আশ্রমে বিশেষ আয়োজন। ভগবান বিষ্ণুর দ্বাদশ যাত্রার শ্রেষ্ঠ যাত্রা রথযাত্রা। মাধবানন্দের ইচ্ছা ছিল অনেক—বড় রথ তৈরি করে সেই রথে কংসারি কৃষ্ণকে চড়িয়ে অজয়ের বন্যারোধী প্রশস্ত বাঁধটির উপর রথ-যাত্রার অনুষ্ঠান করেন। শুরু হোক মানুষের জীবনে নবীন যাত্রা; কিন্তু এতখানি করতে পারেন নি। হেতমপুরের ফৌজদার হাতেম খাঁয়ের বিরোধিতার উদ্যোগের আভাস পেয়েছেন। ফৌজদার সন্দেহ করেছেন। হাতেম খাঁ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক। তার উপর ইলামবাজারের দাস-সরকার তাঁর সন্দেহকে উগ্র করে তুলেছে। বিশেষ করে তার সেই বর্বর পুত্রটা। তার সঙ্গে আছে সেই বৈষ্ণবীর বিচিত্র ব্যবহার। সেটাও স্থানীয় লোকের উপর কম প্রভাব বিস্তার করে নি।

হাতেম খাঁ রাঘবানন্দ রায়ের বিদ্রোহ দমন করার পর থেকে অত্যন্ত ধর্মদ্বেষী হয়ে উঠেছে। রাজনগরের রাজা বাদিওজ্জমান খাঁ ভাল লোক কিন্তু নিজের ফৌজদার এবং ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রজাতে অনেক প্রভেদ। বিচারে ভুল হয়। ভুল না-হলেও প্রতিকারে অনেক বাধা। এই তো সুজাউদ্দিনের মত ধর্মে গোঁড়ামিহীন নবাব উড়িষ্যায় জগন্নাথক্ষেত্রের উপর তকী খাঁর জুলুমের কোন প্রতিকার করতে পারেন নি। তকী খাঁ অবশ্য সুজাউদ্দিনের পুত্র, কিন্তু পুত্র না-হয়ে অন্য কেউ হলেও সম্ভবপর হত না। তকী খাঁর জুলুমের জন্য পুরুষোত্তমের রাজা জগন্নাথদেবের বিগ্রহ নিয়ে চিল্কা হ্রদের অপর পারে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাগ্যক্রমে তকী খাঁর

অকালমৃত্যু ঘটায় প্রতিকার সম্ভবপর হল। সুজাউদ্দিনের দ্বিতীয় জামাতা ঢাকা থেকে উড়িষ্যায় নায়েব-নাজিম হয়ে গিয়ে পুরুষোত্তমের রাজার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জগন্নাথদেবকে পুরীতেই রেখেছেন। সেটুকু নায়েব-নাজিমের ধর্মের উদারতার জন্যই শুধু নয়—জগন্নাথদেব চিল্কার অপর পারে গেলে যাত্রীর অভাবে উড়িষ্যার সমৃদ্ধির হানি ঘটত, নবাবী রাজস্বে ঘাটতি হত; নূতন নায়েব-নাজিমের বিষয়বুদ্ধি তীক্ষ্ণ। মূল কারণ সেইটাই। অনেক বিবেচনা করে মাধবানন্দ আশ্রমের পর্বপার্বণের সমারোহ—আশ্রমের প্রসার-চেষ্টাকে সংযত করেছেন। বিশেষ করে সমারোহের দিকটা। সমারোহের ধ্বনি বর্ণচ্ছটা এসব বড় উচ্চ। এগুলি লোককে শুধু মুগ্ধই করে না; ক্ষেত্রবিশেষে শঙ্কিত করে, ঈর্ষান্বিত করে। তবুও যাত্রী কম হয় নি। প্রায় হাজারখানেক লোক সমবেত হয়েছিল।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। রথের দিন বর্ষণটা এ-দেশে প্রবাদ-সম্মত। বৃষ্টি না-কি হতেই হয়। প্রবল হোক বা না-হোক দু-এক পসলা হবেই। তবুও এসেছে লোকজন ভিড় করে। রথে ভগবানকে দেখবে। মহাপুণ্য হবে। প্রসাদ পাবে। উৎসব সমারোহ বাদ্যভাণ্ড ধ্বজা পতাকা এসব বেশী না করলেও মাধবানন্দ অন্নমহোৎসবের দিকটা এতটুকু খর্ব করেন নি। দেশে অন্ন প্রচুর। কিছুদিন আগেও টাকায় আট মণ চাল ছিল। এখনও টাকায় সাত মণ। কিন্তু তবুও অন্নাভাব আছে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে পাঁচ গণ্ডা কড়ি অর্থাৎ একটা পয়সা উপার্জন করাও অত্যন্ত কঠিন। কিছুদিন আগেই মুরশিদাবাদে এক বেগম পথে ভিক্ষুকদের দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, হতভাগ্যেরা কি দুবেলা পেটপুরে পোলাও খেতেও পায় না? নবাব বলেছিলেন, না। মধ্যে মধ্যে উপবাসও করতে হয়।

সম্ভবত বেগম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। উত্তরে বোধ করি নবাব নিজের কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, সবই নসীব বেগমসাহেবা। নসীবে না থাকলে জুটবে কী করে?

বেলা দুপহরের পর রথ চলল। তারপর আরম্ভ হল অন্ন-মহোৎসব। হরিধ্বনি দিয়ে বসে গেল প্রসাদপ্রার্থী অন্নভিক্ষুর দল। বড় সমারোহ। পেট পুরে অন্ন, কাঁচাকলাইয়ের ডাল, দুটো ব্যঞ্জন, অম্বল, তার উপর গুড়ের

পায়েস এবং গুড়ের মণ্ডা। হরি হরি বোল। হরিধ্বনি আকাশ স্পর্শ করছে। ওদিকে সংকীর্তন চলেছে। রাত্রি নামল। মশাল জ্বেলে দেওয়া হল। তখনও দরিদ্র-ভগবানের ভোগ চলছে।

মাধবানন্দ পরিশ্রান্ত শরীরে আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করলেন। অন্ধকারের মধ্য থেকে কে ডাকলে, প্রভু!

—কে?

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল কয়ো বৈরাগী।

—কয়ো! আশ্রমে কে রয়েছ?

এসে দাঁড়াল একজন তরুণ শিষ্য।—গুরু মহারাজ!

—একে দুটি কপর্দক দিয়ো। তোমার ভোজন হয়েছে কয়ো?

—পেট ভরে গোঁসাই। একদিন বলেছিলাম, এ আপনারা গয়াক্ষেত্র করেছ, এখানের অন্ন দেখি পিণ্ড। আজ পরমান্ন মণ্ডা খেয়ে পেট বোঝাই করেছি।

—শুনে খুব খুশী হলাম। তোমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন দামোদর আছেন কয়ো।

—না প্রভু, কয়ো এঁটোকাঁটায় তুষ্ট। দামোদরের মত গেরাম বসতি জোর করে পেটে পুরতে পারে না। কয়ো অজয়ও নয়। কয়ো নেহাত মাঠের নালা। গাঁ-ধোয়া জলেই ভরে যায়।

হাসলেন মাধবানন্দ।

কয়ো বললে, একটা কথা বলব বলে দাঁড়িয়ে আছি গোঁসাই। নইলে এতক্ষণ কয়ো চলে যেত। খাওয়া হলে কয়ো দাঁড়ায় না।

—কথা? ও! সেই পাথরটি কার সন্ধান পেয়েছ বুঝি?

—না গোঁসাই।

—তবে?

—ছলনা করো না গোঁসাই, তুমি তো সিদ্ধপুরুষ। আমার কথা তুমি জান না, এই কী হয়?

—না কয়ো, আমি সিদ্ধপুরুষ নই। লোকের মনের কথা কেউ জানতে

পারে কি না জানি না। তবে শুনেছি না কি পারে। আমি পারি না। সিদ্ধপুরুষেরা যা যা পারেন বলে শুনেছ তার কিছুই আমি পারি না।

—তবে মা-জী পাগল হল কেনে গোঁসাই?

—কে? মা-জী কে?

—কেষ্টদাসী বৈষ্ণবী। ইলেমবাজারে আমাদের সম্প্রদায়ের মা-জী। সেদিন মধুকৃষ্ণা-তেরোদশীর দিন সেই গোঁসাই-সাজা বরগীর দল যারা মা-বেটীকে ধরতে গিয়েছিল—

এক মুহূর্তেই সব স্মৃতিপথে উদিত হল। একটি দৃশ্যপটের মতই ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রুতিও যোগ হল। স্মরণে এসে গেল। এই মেয়েই তো বৈশাখ মাসে জলসত্রের সময় তৃষ্ণার জল উপেক্ষা করে চিৎকার করেছে, রাধাকে যারা কলঙ্কিনী বলে শ্যামের পাশ থেকে নির্বাসন দিয়েছে, খেয়ো না—তাদের জল কেউ খেয়ো না। আবার ওই বৈষ্ণবীই নাকি অন্যত্র তাঁর আশ্রমের সেবকদের রক্ষা করেছে ইলামবাজারের বর্বর ধনীপুত্র অক্রূরের অনুচরদের আক্রমণের হাত থেকে। চিৎকার করে বলেছে, তা হলে সর্বনাশ হবে। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এ চাকলা। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। খবরদার! খবরদার!

সে পাগল হয়ে গেছে? পরস্পর-বিরোধী আচরণ এবং উক্তি থেকে সেই সত্যই প্রকাশ পাচ্ছে নিঃসন্দেহে; কিন্তু কয়ো তাঁকে দায়ী করে কেন? মা এবং মেয়েকে তাঁর স্পষ্ট মনে পড়ছে। তাদের তিনি বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করে সযত্নে নৌকাযোগে ইলামবাজারে পৌছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন। অকরুণা বা ক্রোধ, এ তো তাঁর মনের মধ্যে উদয় হওয়ার কথা স্মরণ করতে পারছেন না!

ভ্রূকুঞ্চিত করে মাধবানন্দ বললেন, এ সব ভুল কয়ো। মেয়েটি পাগল হয়ে গয়ে থাকলে ব্যাধিতে হয়েছে। তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এমন কোন মহিমাও আমার নেই, যাতে আমার ক্রোধে ক্ষোভে কারও কোন অনিষ্ট হয়!

—কিন্তু হয়েছে যে গোঁসাই। মোহিনী বলছে আর কাঁদছে।

—মোহিনী কে? সেই কিশোরী মেয়েটি?

—হ্যা গোঁসাই। কেষ্টদাসীও বলছে—ওরে, আমি ক্যানে গিয়েছিলাম রে! মণির ছটা দেখে, বিষধরের কথা ভুলে ক্যানে হাত বাড়িয়েছিলাম। জ্বলে গেল। বিষে আমি জ্বলে গেলাম। আমি বারণ করেছিলাম গোঁসাই। তেরোদশীর দিন যখন ওপার থেকে এখানে আসে—মালা নিয়ে ফুল নিয়ে ভেট নিয়ে, তখুনিই আমি বারণ করেছিলাম। আমিই বলেছিলাম—আমিই বলেছিলাম গোঁসাই, মণির লোভে ফণির গর্তে হাত বাড়িয়ো না মা-জী। মা-জী বলেছিল—ওরে কয়ো, সে ফণি হলে আমিও ফণিধরুনী। আমার মোহিনী মন্তর আছে রে, আমার মোহিনী মন্তর আছে। গোঁসাই, সে ওই মেয়ে মোহিনীকে তোমার পায়ে পুজো দিতে এসেছিল, ভোলাতে এসেছিল।

স্থির দৃষ্টিতে কয়োর দিকে তাকিয়ে রইলেন মাধবানন্দ। এ মেয়েটির মনের কথা তিনি না-জানলেও এদের এ চরিত্রের কথা তো তাঁর অজানা নয়, এবং কৃষ্ণদাসীকে দেখে সেইদিনই তাঁর নিজের বাল্যস্মৃতির একটি ঘটনার কথা তাঁর মনে পড়েছিল।

দৃষ্টি দেখে ভয় পেল কয়ো। সভয়ে মিনতি করে বললে, আমার উপর রাগ করছ গোঁসাই?

—না। কিন্তু এ সব কথা আমি শুনে কী করব? কেন বলছ?

—তোমার করুণার জন্যে গোঁসাই। তোমার মনের অজান্তে তোমার রাগ—

—রাগ আমি করি নি।

—মেয়েটার সর্বনাশ হয়ে যাবে গোঁসাই। ওই পাষণ্ড অক্রূর—

কানে আঙুল দিয়ে মাধবানন্দ চলে গেলেন।

কয়ো কিছুক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললে, বরাত। সবই বরাত।

—নাও। ধর। একজন সন্ন্যাসী এসে সামনে দাঁড়ালেন—কপর্দক!

কয়ো কপর্দক দুটি নিয়ে গামছার খুঁটে বাঁধছিল। বাঁধছিল আর ভাবছিল, সংসারে কপর্দক এক ফ্যাসাদ। লোকের কাছে কড়ি দুর্লভ সামগ্রী। কপর্দক তো সত্যকারের ধনসম্পদ। এ সে রাখবে কোথায়? মা-জী ভাল থাকলে—

—দাঁড়াও কয়ো।

—গোঁসাই!

—হ্যাঁ। তুমি এটি নিয়ে যাও। সেই নীলাটি।

—লোকে জানলে যে আমার গলা কেটে দেবে গোঁসাই। আমি রাখব কোথা?

—এক কাজ কর। এটি নিয়ে তুমি হেতমপুরে হাফেজ খাঁয়ের সঙ্গে দেখা কর। এ রত্নটি যদি তাঁদের হয় তবে পেলে খুব খুশী হবেন। তখন যদি তুমি ওই মেয়েটিকে বর্বর অক্রূরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সাহায্য চাও তবে নিশ্চয় পাবে। যদি তাঁদের নাও হয় কয়ো, তা হলেও এটি নজরানা দিয়ে সাহায্য চাইলেও পাবে।

নীলাটি কয়োর হাতে দিয়ে মাধবানন্দ নিঃশব্দে গিয়ে আশ্রম-কক্ষে প্রবেশ করলেন। কয়ো অগত্যা ফিরল। হতভাগিনী মা-জী। মা-জীর পরিত্রাণের আর কোনও উপায় নেই। হায় মা-জী! সারা জীবনটাই তুমি অপচয় করলে! সারাজীবন! ভগবানের কম দয়া তো তোমার উপর ছিল না! তোমার শ্বশুর প্রেমদাসের এত বড় সিদ্ধপাটের মহিমা—তুমি পেয়েছ। সিদ্ধি তোমার হাতের মুঠোয় ছিল। সে ফেলে দিয়ে তুমি—! আঃ, সহ্যশক্তি তোমার একেবারে নাই! দেবতা গোঁসাই মান না তুমি!

* * *

সেদিন অর্থাৎ ওই সন্ন্যাসীদের হাঙ্গামার দিন মাধবানন্দ ওদের মা-মেয়েকে নৌকা করে ইলামবাজার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। নৌকায় সারাটাক্ষণ কেষ্টদাসী যেন পাথরের মত বসে ছিল। মোহিনী মায়ের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি দেখে বার কয়েকই মৃদুস্বরে মাকে ডেকেছিল, মা—মা! মা গো! কিন্তু কেষ্টদাসী উত্তর দেয় নি; পলকও পড়ে নি তার চোখে।

ইলামবাজারের ঘাটে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যেন প্রথম তার সচেতনতা ফিরেছিল। চোখে একটা আগুনের ঝলক যেন দপ করে জ্বলে উঠল। ঘাটে নেমে অজয়ের ওপারের দিকে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে নিম্নস্বরে বললে, আমরা এত পাপী? এমন অচ্ছুত? তোমার পা ছুঁলে তোমার শরীরে জ্বালা ধরত? তোমার পায়ের রঙ কালো হয়ে যেত? তোমার পুণ্যের এত

অহঙ্কার? তুমি রাজার ছেলে, তুমি পুণ্যাত্মা আর আমরা ভিখারী বৈরেগী বাউল বষ্টুম বলে—

মোহিনী ভয় পাচ্ছিল গোড়া থেকেই। আর সে সহ্য করতে পারে নি, সভয়ে সে মায়ের হাত ধরে তাকে ডেকেছিল, মা, মা গো! হাত ধরে তাকে নাড়া দিয়েছিল।

এবার চকিত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনেছিল এবং খপ করে মেয়ের হাত ধরে বলেছিল, আর তুই?

তারপরই তাকে প্রায় টানতে টানতে পথ চলতে শুরু করেছিল। হঠাৎ বলেছিল, কচি খুকী! তুইও কচি খুকী।

মোহিনী সভয়ে বলেছিল, আমি কী করলাম?

—ক্যানে তু মালা নিতে হাত বাড়িয়েছিলি?

—আমি মনে করলাম আমাকে দেবে গোঁসাই।

—চোখ দুটো জলজল করছিল ক্যানে তোর? নৌকোয় ক্যানে এমন করে তাকিয়ে কাঁদছিলি? আমি ভাবতাম, মেয়ে আমার সত্যিই কচি খুকী। ভাবতাম, হাবাগোবা। তুমি খুব সেয়ানা!

কুৎসিত কথা বলতে শুরু করেছিল কেষ্টদাসী। মোহিনী বিবর্ণ মুখে বলেছিল, মা গো, ওসব বলিস না মা গো। তোর পায়ে পড়ি গো।

তবুও ক্রোধের শান্তি হয় নি কেষ্টদাসীর।—জানি, ওই রাজার ছেলে ভণ্ড গোঁসাইদেরও আমি জানি। আমি তো কিশোরী নই। আমি তো কুঁড়ি নই। তাই আমি অদ্ভুত। আর চাঁপার কলির দিকে চাউনি, সে চাউনিতে—

কুৎসিত উপমা দিয়ে কথা শেষ করলে সে। তারপর আবার বললে, এই পুন্নিমেতেই তোমাকে অক্রূর চণ্ডালের আটচালায় উচ্ছুগ্যু করব আমি।

এবার কেঁদে উঠল মোহিনী।—মা গো! না গো, না—না—; আমি মরে যাব গো! আমি মরে যাব।

সন্ধ্যার পর কেষ্টদাসী কয়োকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই গিয়েছিল রমণ সরকারের বাড়ি। অক্রূরকে দেখবার অছিলা করে তার কাছে প্রতিশ্রুতি

নিতে গিয়েছিল। ভিতরটা তার অপমানে ক্ষোভে জ্বলে যাচ্ছিল যে। এত বড় আঘাত সে জীবনে পায় নি। এমন কি, তাদের সমাজের উপর প্রতিপত্তি নিয়ে, যার সঙ্গে তার শ্বশুরের মৃত্যুর পর থেকে ছোটখাটো কত ঝগড়া হয়ে গেল, সেই সুপুরের আনন্দচাঁদ ঠাকুরের কাছেও পায় নি। আনন্দচাঁদ ঠাকুরও ব্রহ্মচারী। বৈষ্ণবী শক্তি নিয়ে ভজনপূজন সেও করে না। কিন্তু বৈষ্ণবী বলে ঘেন্নাও করে না। ঠাকুরের সাধন দূতীভাবের সাধনা। সে বৃন্দার মত স্নেহ করে শ্রদ্ধা করে বৈষ্ণবীদের। ঠাকুরও মহৎবংশের ছেলে। আজ নিজে সে রাজাবিশেষ লোক। তার বাড়িতেও যুগল-বিগ্রহ আছে। শিষ্যসেবকের সংখ্যা নেই। ঠাকুর সিদ্ধাইও পেয়েছে।

খুস্‌টিকুরির পীরতুল্য সিদ্ধপুরুষ হজরৎ হোসেন সাহেব একবার আনন্দ ঠাকুরের শক্তি পরীক্ষার জন্ম বাঘের পিঠে চড়ে দেখা করতে এসেছিলেন। সঙ্গে উপঢৌকন এনেছিলেন সোনার থালায় সুন্দর খাঞ্চিপোশে ঢেকে হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস। আনন্দ ঠাকুর তখন একটা ভাঙা পাঁচিলের উপর বসে কাজ-কর্ম দেখছিলেন। হজরৎ বাঘের পিঠে সুপুরের প্রান্তে উপস্থিত হতেই ঠাকুর পাঁচিলকে বললেন, চল। পাঁচিল চলতে লাগল, এসে হাজির হল গ্রামে ঢুকবার প্রবেশপথে। হজরৎ অবাক হলেন। তাঁর আর সাহস হচ্ছিল না হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস উপঢৌকন দিতে। কিন্তু ঠাকুর বললেন, ও কী হজরৎ, আমার জন্যে এমন সমাদর করে উপঢৌকন এনে আমাকে না দিয়ে আপনি লুকচ্ছেন? না না না, দিন, দিন।—বলে থালাখানি প্রায় কেড়ে নিয়ে খাঞ্চিপোশ খুলে ফেললেন। সে অবাক কথা, সাধারণ মানুষ ছার, হজরৎ সাহেবই অবাক হয়ে দেখলেন—থালায় মাংস কোথায়! মাংস নেই; তার পরিবর্তে রয়েছে সদ্য-ফোটা একরাশি লাল পদ্ম পুষ্প; তার গন্ধে চারিপাশে মৌমাছি উড়ছে।

এমন আনন্দ ঠাকুরের কাছে নবীন গোঁসাই তুমি? তোমার এত অহংকার? কেষ্টদাসীও সিদ্ধপাটের অধিকারিণী, তার হুকুমে পাঁচিল না চলুক, বাঘ তার বশ না মানুক, ইচ্ছে করলে সে বাঘিনী হতে পারে, কালনাগিনী হতে পারে। নবীন গোঁসাই, তুমি কালনাগিনীর মাথায় পা দিয়েছ। লখাইয়ের রূপ দেখে বিমোহিত হয়েও কালনাগিনী লাথি খেয়ে

আক্ষেপ করে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে দংশন করেছিল, কেষ্টদাসীও ঠিক তাই বলে চন্দ্র-সূর্য সাক্ষী রেখে তোমাকে দংশাবে।

সাক্ষী থেকো চন্দ্র-সূর্য।

পা ভেঙে অক্রূর বিছানায় শুয়ে ষাঁড়ের মত চিৎকার করছিল। সত্যই ষাঁড়ের মত; কণ্ঠস্বরে তার মানুষের মাধুর্যের চেয়ে জন্তুর, বিশেষ করে ষাঁড়-মহিষের, কর্কশতাই বেশী। যন্ত্রণার অভিব্যক্তির সঙ্গে তখনও অকারণ ক্রোধের প্রকাশ সমানে চলেছে। অকারণে এই কারণে যে ক্রোধের যারা লক্ষ্য তারা তখন বহুদূরে, ছদ্মবেশী বর্গী সন্ন্যাসীরা তখন অন্তত বনে বনে দশ-বারো ক্রোশ পথ নিঃসন্দেহে অতিক্রম করে চলে গেছে। বিছানায় পড়ে অক্রূর তাদেরই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করে চলেছে।

কেষ্টদাসীকে দেখে সে খানিকটা শান্ত হল। মোহিনীর মা তাকে দেখতে এসেছে! তার উপর কেষ্টদাসীর বিরূপতা সে জানে। সেই কেষ্টদাসী আজ সদয় হয়ে দেখতে এসেছে এ কি কম কথা! কুৎসিত দু পাটি দন্ত বিস্তার করে অক্রূর বললে, মা-জী, এস।

তারপরেই সে আর একদফা চিৎকার করে উঠল। যাত্রাদলের ভীমের মত ক্রুদ্ধ চিৎকারে বলে উঠল, এবার পেলে শালাদিগে আমি—

দাঁতে দাঁতে ঘষে কড়মড় শব্দ করে বললে, শালাদিগে চিবিয়ে খাব আমি। তার মনে পড়ে গেল বর্গীদের হাতে মা-জী এবং মোহিনীও চরম লাঞ্ছিত হতে হতে কোনক্রমে বেঁচে গিয়েছে।

—ওই শালা বর্গী গোঁসাইদের।

এর পর শুরু করলে সে একদফা অশ্লীল গালি-গালাজ।

কেষ্টদাসী বললে, আছ কেমন?

—শালার পা-খানা ভেঙে গিয়েছে। হাড় ভেঙেছে। কবরেজ হাড় জোড়া দিয়ে বেঁধে দিয়েছে। পাজী বেটারা বদ্যিনাথের ঘোড়া বানিয়ে দিয়ে গেল—ডান পাটা লটোর-পটোর বাঁ পাটা খোঁড়া, বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া।

বলেই হি-হি করে হাসতে লাগল।

তার পরই হাত বাড়িয়ে অনুচরকে বললে, দে রে বেটা, বোতল দে।

সেই মুরশিদাবাদের আমদানী কড়া জিনিসটা। শালা, মদ খেয়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই।

মদ খানিকটা গিলে বললে, শোন মা-জী। একটা কথা বলি তোমাকে।

কেষ্টদাসী বললে, তোমার সঙ্গে আমারও কথা আছে অক্রূর। তোমার চাকরবাকরকে বাইরে যেতে বল।

—এই শালা, শূয়ারের বাচ্চারা, যা—যা—বাইরে যা। দোর দিয়ে দে রে আবাগীর ব্যাটা! তারপর—শোন মা-জী। আমার কথাটা আগে শোন। তোমার কথা পরে শুনব। মোহিনীকে তুমি গিয়ে পাঠিয়ে দাও। সে গায়ে হাত বুলবে। তাতেও আমার আরাম হবে। নরম কচি হাতের হাত-বুলুনি ভারি ওষুদ।

তারপরেই শাসনের ভঙ্গিতে বললে, না-দিলে—হুঁ—হুঁ। বুঝতে পারছ? হম অক্রূর হ্যায়। তার নিজের সম্পর্কে রচনা করা মহিম্নস্তোত্রটি সে আউড়ে দিল—

হম অক্রূর হ্যায়। লেকিন দুনিয়া বোলতা হম ক্রূর হ্যায়—জবরদস্ত শূর হ্যায়। শুনো মা-জী, কাজীকে দরবার দূর হ্যায়; বহুত কাজী হম দেখা হ্যায়। জেব মে রূপেয়া হ্যায়; কাজী হাজী গাজি পাজী সবই ইসমে রাজী হ্যায়। এইবার সহজ বাংলায় বলি—শোন মা-জী, সহজে তুমি রাজী না হলে—আমি আজই লোক পাঠিয়ে মোহিনীকে তুলে আনাব, হাঁ।

বলেই সে নিজের এ হেন কাব্যপ্রতিভায় উদ্দীপ্ত হয়ে হা-হা করে হেসে উঠেছিল।

দাসী সহজে ভয় পায় না। জীবনে সে অনেক দেখেছে। সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, আমি তোমাকে ডাকিনী বিদ্যেতে বাণ মেরে পেড়ে ফেলব ছোট সরকার। বর্গীরা পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে, সে সারবে—খুঁড়িয়ে হলেও চলতে পারবে। আমার বাণে তোমাকে চিরজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে; বোবা সুদ্ধ করে দেব আমি। আমার শ্বশুরের সিদ্ধাই হারায় নি, সে আমার কাছে আছে।

এবার ভয় পেলে অক্রূর। হে-হে করে দেঁতো হাসি হেসে সে কেষ্ট-দাসীর একটু তোষামোদ করেই বললে, না—না—না। ও আমি তামাশা

করে বলছিলাম মা-জী। তুমি যে বাবার সেবাদাসী, নইলে তোমাকেই বলতাম, তুমিই থাক দাসী, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

কেষ্টদাসী মেঝেতে থুতু ফেলে বললে, মাছের মধ্যে হাঙর, পাখির মধ্যে শকুনি, জন্তুর মধ্যে বুনো শুয়োর, পোকার মধ্যে মাছি, আর মানুষের মধ্যে তুমি ছোট সরকার—তোমাদের তুলনা নাই। কিন্তু তবু তোমার হাতে মোহিনীকে আমি দেব। আজ বলি তোমাকে, এতদিন—দেব দেব মুখে বলেছি কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছিলাম, দেব না। কিছুতেই না। দরকার হলে পালাব। কিন্তু আজ সত্যি করে বলছি, দেব—দেব—দেব। তবে এক শর্তে।

—কত টাকা ?

—টাকা নয়।

—বেশ, সম্পত্তি ?

—না, তাও নয়।

—তবে ?

—কেন্দুলীর ওপারে গড়জঙ্গলে এক নতুন গোঁসাই এসেছে—

—হ্যাঁ। কোথাকার রাজার ছেলে। সেই তো—

বাধা দিয়ে কেষ্টদাসী বললে, মহারাজার ছেলে হোক দেবতা হোক, ওকে যদি অপমান করতে পার, বাজারের নটী দিয়ে যদি অপমান করাতে পার, তা হলে—শুধু তা হলে তোমার হাতে মোহিনীকে দেব।

অক্রূর জীবনে কোন কাজেই হিসেব করে না, খতিয়েও বোঝে না, শুধু নির্বোধের মত কাজটাই করে যায়; মন্দ কাজ হলে তার সঙ্গে জোটে তার বর্বর উল্লাস। বর্বর উল্লাসের সঙ্গেই সে বললে, আঃ! হায়! হায়! হায়! হম পা ভাঙকে—বিস্তারামে পড়া হুয়া হ্যায়, নেহি তো—। আচ্ছা, আভি! আভি! আভি! আভি নটীর দল হম ভেজুঙ্গা উসকা মঠমে। উলোক—লেংটা নাচ নাচকে মু-মে থুক্ দেকে চলা আয়েগা।

—না। ইলেমবাজারে ওকে আসতেই হবে—কোন-না-কোন কাজ পড়বেই। তখনই—এই বাজারে।

—বহুত আচ্ছা। তাই হোগা। বলেই সে নিজের বুকে তবলার বোল

বাজিয়ে দিয়েছিল!—তেটে খেটে—। ওটা তার একটা স্বভাব। বেশী খুশী হলেই সে বুকে তবলা বাজায়—তেটে খেটে তেটে খেটে—কত্তে গদি ঘিনি ধা।

হঠাৎ কিন্তু তবলা বাজানো বন্ধ করে কেষ্টদাসীর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলেছিল, কিন্তু মা-জী!

—কী?

—ওই গোঁসাই-ই তো তোমাদের আজ—

—বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে? হ্যাঁ, বাঁচিয়েছে।

—তবে?

—তোমার কি মনে কিন্তু হচ্ছে অক্রূর?

হা-হা করে হেসে অক্রূর বলেছিল, আমার মনে কিন্তু? আমি পড়ে গেলে ওই গোঁসাই আমার হাত ধরে তুলতে এসেছিল, আমি গাল দিয়ে তার মুখে থুতু দিয়েছি। আমার কথা নয়। তোমার কথা। তোমার হল কী?

—সে আমাদের অপমান করেছে অক্রূর। আমি তার শোধ চাই। এই শোধ যে নেবে তাকেই দেব আমি মোহিনীকে।

—কী অপমান করেছে? অপমানটো কেয়া গো?—হি-হি করে হেসে উঠল অক্রূর: বলি, মতলব নিয়ে গিয়েছিলে বুঝি? পাকড়াবার মতলব?

কঠিন দৃষ্টিতে অক্রূরের দিকে তাকিয়ে কেষ্টদাসী বলেছিল, সে তুমি বুঝবে না অক্রূর। তবে এইটি জেনে রেখো, সে থাকতে মোহিনীকে তুমি পাবে না। আমি তাকে পাকড়াতে পারি বা না-পারি, সে পাকড়েছে আমার বেটীকে। হারামজাদী মজেছে অক্রূর।

বলেই চলে এসেছিল কেষ্টদাসী। কয়ো বাইরে বসে প্রায় সকল কথাই শুনেছিল। সে বলেছিল মোহিনীকে। বলেছিল, মোহিনী, তু সাবধান হ। তু বরং ওই মাধবদাসের সঙ্গে পালিয়ে যা। মা তোর তোকে জবাই করবে রে।

মোহিনী ভয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

কয়ো জীবনে কাউকে কখনও সান্ত্বনা দেয় নি—দিতে পারে না; তার নিজের কোন ভাবনা নেই বলে তার ভয়ও নেই। ভয় যে-পথে আছে সে-

পথে সে হাঁটেই না। ভূত প্রেত পিশাচের ভয় তার নেই, কারণ তাদের সে ভক্তি করে প্রণাম করে; সাপের ভয় সে করে না, কারণ সে সাপ ধরতে পারে—সাপের ওঝা; জলকে সে ভয় করে না, কারণ সে সাঁতার দিতে পারে কুমীরের মত। ভয় করে আগুনকে, ভয় করে ঝড়কে, আর ভয় করে মানুষকে, মানুষের মধ্যে বিশেষ করে সাধু সন্ন্যাসী সিদ্ধপুরুষদের আর রাজ-পুরুষদের আর ডাকাতদের। সিদ্ধপুরুষদের প্রণাম করে তাদের এড়িয়ে চলে; রাজপুরুষদের ত্রিসীমানায় হাঁটে না; ডাকাতদের—সীমানা এড়াবার জন্য দুটি কপর্দকও সে নিজের কাছে রাখতে চায় না। কাজেই তার দুঃখ নেই—কারুর কাছ থেকে তার সান্ত্বনার প্রয়োজন হয় না, সে কারুর কাছ থেকে সান্ত্বনা-বাক্য শোনে নি। অপরের দুঃখে শোকে সে কখনও কাছে যায় না; কেউ কাঁদলে দূরে দাঁড়িয়ে শোনে, বেশী দুঃখ অনুভব করলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে নদীর ধারে বা বনের কোন গাছতলায় চুপ করে বসে থাকে। বাক্য সে খুঁজে পায় না। সেদিন কিন্তু কয়ো মোহিনীর কান্না দেখে দুঃখ অনুভব করেও পালিয়ে যায় নি। সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, ভয় কি মোহিনী! কাঁদিস না। আমি তোকে বলছি, আমি বেঁচে থাকতে ওই অক্রূর অসুরকে তোর গা ছুঁতে দোব না।

মোহিনী তার হাত দুটি ধরে বলেছিল, তা হলে কয়ো, তুই ওপারের গোঁসাইকে বলে আয়—গোঁসাই যেন ইলেমবাজারে না আসে। পায়ে ধরে বলিস কয়ো—গোঁসাই এসো না, এসো না, ইলেমবাজার তুমি এসো না। ওই অক্রূরকে তুমি জান না—সে ভয়ঙ্কর—সে রাক্ষস—সে সব পারে। কিন্তু কী? কী? কী দেখছিস কয়ো? কথা হচ্ছিল খিড়কির দিকের ফুল-বাগিচায় মালতীলতার কুঞ্জটার মধ্যে; স্থানটা বেশ আড়াল। কয়ো হঠাৎ উঠানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন শক্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ভয় পেয়েছে কিছু দেখে। মোহিনী তাই প্রশ্ন করেছিল, কী? কী? কী কয়ো?

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল কয়ো উঠানের ও-মাথাটা।

উন্মাদিনীর মত ঘুরছে কেষ্টদাসী। চুল এলিয়ে পড়েছে, গায়ের কাপড় মাটিতে লুটচ্ছে, আকাশের দিকে মুখ করে সে ঘুরছে।

ফিসফিস করে কয়ো বললে, 'বাট' বইছে বোধ হয়!

'বাট বওয়া' ডাকিনী বিদ্যার অঙ্গ। প্রেমদাস বাবাজীর বষ্টুমী, মোহিনীর পিতামহী ছিল কামরূপের মেয়ে। বাবাজী গিয়েছিল মণিপুর, সেখান থেকে ফেরার সময় নিয়ে এসেছিল বোষ্টুমীকে। লোকে বলে, কেষ্টদাসীও বলে, শাশুড়ী ডাকিনী বিদ্যা একটি কৌটোয় পুরে রেখে গিয়েছিল—সেই কৌটো খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যা কেষ্টদাসীর আয়ত্ত হয়ে গিয়েছে। প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধাই, সেও নাকি ডাকিনী-সিদ্ধির সিদ্ধাই। সে সিদ্ধাই আছে আখড়ার গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের আইনকে আশ্রয় করে। আশীর্বাদ আছে—তিন বৎসর নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন হলেই, ওই গৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে ফুল জল দিলেই, দু বেলা আরতি করলেই সে সিদ্ধাই নিশ্চয় পাবে। সে সিদ্ধাই কেউ কেউ বলে কেষ্টদাসী পেয়েছে। কিন্তু কয়ো জানে না। সে সিদ্ধাই পায় নি এখনও মা-জী। মা-জী নিজে শাসায় লোককে সে শাশুড়ীর ডাকিনী বিদ্যার জোরে। ডাকিনী বিদ্যাকে জাগাতে হলে বাট বইতে হয়। তার শুরুটা ঠিক এই রকম। এর পর গভীর রাত্রে চারিদিক নিষুতি হলে মা-জী মাথা নিচু দিকে করে পা উপরের দিকে তুলে হাতের উপর হেঁটে বেড়াবে। সারা অঙ্গে একগাছি সুতো বলতে কিছু থাকবে না। সে সময় কেউ যদি সামনে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে এবং তাতেই হবে তার সুনিশ্চিত মৃত্যু।

মোহিনী সভয়ে অস্ফুট চিৎকার করে উঠেছিল। কয়ো তার হাতখানা মুখে চাপা দিয়ে বলেছিল, চুপ। আয়, ঘরে আয়। ও দেখতে নাই। পালিয়ে আয়।

সারাটা রাত্রি মোহিনী আতঙ্কে অভিভূত হয়ে মাটির মূর্তির মত বসে ছিল।

তখন বোধ হয় শেষ রাত্রি, কারণ তখন চাঁদ উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী-রাত্রির চাঁদ। ছাব্বিশ দণ্ড পার হয়ে গেছে। একটা কাতর আর্তনাদ শুনে মোহিনী চমকে শিউরে উঠেছিল।

—এ আমি কী করলাম! এ আমি কী করলাম রে!

তারপর শব্দ উঠেছিল যেন প্রহারের শব্দ। কেউ যেন কাউকে প্রহার করছে।

চিৎকার করে মোহিনী ডাকতে গিয়েছিল, মা! মা গো! কিন্তু বাড়ির

বাইরের দিক থেকে শুনতে পেয়েছিল কয়োর কণ্ঠস্বর। কয়ো বাড়ির বাইরে দাওয়ায় শুয়ে ছিল। সে সন্তর্পিত কণ্ঠে মোহিনীকে ডাকছিল, মো-হি-নী! মো-হি-নী!

নিস্তব্ধ নিষুতি রাত্রি। তার মধ্যে এ ডাকে ব্যঞ্জনা দ্বিগুণিত হয়ে উঠেছিল। —সাবধান মোহিনী! উঠিস না। দোর খুলিস না। ডাকিস না। খবরদার!

কয়োও শুনতে পেয়েছিল এ আর্তনাদ।

আর্তনাদ তখনও শেষ হয় নি। সেই মুহূর্তেই আবার আর্তনাদ উঠেছিল, রক্ষা কর—তুমি রক্ষা কর ঠাকুর—মহাপ্রভু—হে গৌরাঙ্গ—দয়াল—তুমি রক্ষা কর।

সকালে উঠে মোহিনী সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এসে উঠানের চারিদিক চেয়ে দেখেও মাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু নীচে নেমে আসতেও তার ভরসা হয় নি। কয়ো একটা গাছের উপর চড়ে তারই একটা ডাল বেয়ে অন্য একটা গাছের ডাল বেয়ে পর পর কয়েকটা গাছ অতিক্রম করে এসে নেমেছিল বাড়ির মধ্যে। এ বিদ্যাতে কয়ো বানরের চেয়েও পটু, কাঠবিড়ালীর মত। তারই সাহসে নেমে এসে মোহিনী মাকে আবিষ্কার করেছিল। কেষ্টদাসী পড়ে ছিল ঠাকুর-ঘরে—বিগ্রহের সম্মুখে। সে অঘোরে ঘুমচ্ছে।

সে-ঘুম ভেঙেছিল কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে। ও-পাড়ায় মন্দিরে মঙ্গলারতি হচ্ছে। সেই শব্দে ঘুম ভেঙে কেষ্টদাসী উঠে বসেছিল। কেষ্টদাসীর চোখ দুটি তখন যেন লাল হয়ে উঠেছে। ঘুম ভেঙে উঠেও সে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল, চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি।

—মা! মা গো! অনেক সাহস সঞ্চয় করে ডেকেছিল মোহিনী।

কন্যার দিকে সেই নিষ্পলক দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকিয়েছিল কেষ্টদাসী।

—মা! মা! এবার গায়ে হাত দিয়েছিল মোহিনী।

কেষ্টদাসী দুই হাত বাড়িয়ে মেয়েকে বুকে ঝাপটে ধরে যেন আপন-মনেই বলে উঠেছিল, না—না—না। দেব না। আমি দেব না।

কয়ো বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এতক্ষণে বলেছিল, মা-জী, তোমার এ চেহারা মোহিনী সহ্য করতে পারবে না মা-জী। তুমি তোমার সিদ্ধাইরূপ সামলাও মা-জী।

—কয়ো !

—হ্যাঁ মা-জী।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল কেষ্টদাসী।

—ওঠ। চান কর। প্রভুর আরতি কর। বাল্যভোগ দাও। প্রসাদ লাও। দেরি কোর না মা-জী। এখনি পাড়া-ঘরের সকলে আসবে। বাউলরা আসবে গান গাইতে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে উঠেছিল কেষ্টদাসী। দিনের আলোয় যেন অনেকটা আত্মস্থ হয়েছে তখন। আলনা থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল খিড়কির পথে। কিছুক্ষণ পর খিড়কির ডোবাটাতেই স্নান সেরে এসে কাপড় ছেড়ে গিয়ে আবার ঢুকেছিল মন্দিরে।

তারপর সে পূজা—তার অদ্ভুত পূজা। এ পূজারিণী কেষ্টদাসী যেন নতুন কেষ্টদাসী; সে পুরনো মানুষই নয়। খাওয়া ভুলে, ঘর সংসার সব ভুলে প্রায় সারাদিন সে পূজাই করেছিল; পান দোক্তা পর্যন্ত খায় নি। খেয়েছিল শুধু বার কয়েক ছোট কল্কেতে বড় তামাক। অবসর সময়ে ভাম হয়েই বসে ছিল।

সন্ধ্যার সময় মোহিনী ভয় পেয়ে কয়োকে বলেছিল, আবার যে রাত নামল কয়ো ! আজ যে অমাবস্যে !

কয়ো বলেছিল, চুপ করে থাক মোহিনী। চুপ করে ঘরে বসে থাক। এর উপায় নাই।

—কেন এমন হল কয়ো ?

—বুঝতে পারছি না মোহিনী। বুঝতে পারছি না। ওর সব যেন ওলটপালট হয়ে গিয়েছে মনে লাগছে। এ তো বাট বওয়ার মত লাগছে না। ডাকিনী বিদ্যে জাগা তো নয় এ।

ঠিক এই সময়েই কেষ্টদাসীর তীব্র ক্রুদ্ধ চিৎকারে শান্ত আখড়াটির সন্ধ্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ মৌন পরিবেশটি চিরে যেন ফালিফালি হয়ে গিয়েছিল।

কেষ্টদাসী চিৎকার করে উঠেছিল, না—না—না। বেরিয়ে যা। বেরিয়ে যা হারামজাদারা।

খিড়কির দরজায় চিৎকার! কয়ো উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিল ঘটনাটা। দেখে বিস্ময়ের উপর বিস্ময় বেড়ে গিয়েছিল তার। মা-জীর জন্যে দাস-সরকারের কুঞ্জ থেকে ডুলি এনেছে দাস-সরকারের খাস পাইক কালু। কালুকে গালাগাল দিচ্ছে মা-জী। ডুলি ফিরিয়ে দিচ্ছে মা-জী। বলছে, বেরিয়ে যা হারামজাদারা—বেরিয়ে যা।

কেষ্টদাসী তখনও চিৎকার করছিল, বেরিয়ে যা, নইলে আমি শাপান্ত করব।

কালু যেন তবুও কিছু বলেছিল। কেষ্টদাসী ছুটে গিয়ে বিগ্রহের ঘরে ঢুকে চিৎকার করছিল, আয়! আয়! কই, আয় দেখি! আমি—আমি পেড়ে ফেলব—আমি শাপান্ত করব।

কালু এবার সভয়ে ডুলি নিয়ে ফিরে গিয়েছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর। দাস-সরকার এসেছিল নিজে।—কেষ্টদাসী!

কেষ্টদাসী আবার চিৎকার করে উঠেছিল, না।

—তোমার হল কী? কখনও তো এমন কর না। তা ছাড়া ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে—

দাসী বলেছিল, ধর্ম আমি জানি দাসজী, আর ধর্মে কাজ নাই দাসজী। তুমি আমাকে রেহাই দাও। রেহাই দাও।

—দাসী! কেষ্টদাসী!

—তোমাকে হাতজোড় করছি। জোড়হাত করছি। তুমি যাও।

—তোমাকে সঙ্গে না-নিয়ে তো আমি যাব না। তা হলে তো তুমি ডুলি ফিরিয়ে দিয়েছ তাতেই মিটে যেত। বিবেচনা কর, আমি নিজে এসেছি কেষ্টদাসী।

—আমি যাব না দাস-সরকার।

—না গেলে তোমার প্রত্যবায় হবে দাসী। সাধনের ব্যাপার। তুমি তো না-জানা নও। ধর্ম তোমাকে ক্ষমা করবে না। অনিষ্ট হয়ে যাবে।

—হোক। তাই হোক। আমার সর্পাঘাত হোক, আমার ব্যাধি হোক। আমি যাব না।

—যেতে তোমাকে হবে। আমার লোক তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে॥

—তুলে নিয়ে যাবে? তুলুক দেখি, কে পারে?

বলেই সে ছুটে গিয়ে গৌরাঙ্গমূর্তির পা দুটি জড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল। বলেছিল, এই পা ছাড়িয়ে নিয়ে যাও আমাকে। দেখব!

এর পর দাস-সরকার নীরবে উঠে গিয়েছিল। কৃষ্ণদাসী সেই চতুর্দশীর সন্ধ্যা থেকে অমাবস্যার রাত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত দেবতার চরণ ছেড়ে ওঠে নি।

যখন উঠল, তখন চোখ দুটো তার জবাফুলের মত লাল।

মোহিনী শিউরে উঠেছিল মাকে দেখে। মা ভ্রূক্ষেপ করে নি। অজয়ে স্নান করে এসে প্যাঁটরা খুঁজে শাশুড়ীর অর্থাৎ সিদ্ধবাউল প্রেমদাসের সেবাদাসীর অতি জীর্ণ গেরুয়া কাপড়খানা পরে পুজোর ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল, মোহিনী! মোহিনী! আন্ তো জাঁতি-খানা—ভালখানা।

মোহিনীর হাত থেকে জাঁতিখানা নিয়ে নিজের চুলের প্রান্তভাগ তার হাতে দিয়ে বলেছিল, ধর্, টেনে ধর্। তারপর নিজের হাতে চুলের রাশি কেটে, নিজের হাতে সেগুলি খিড়কির ডোবায় ফেলে দিয়ে এসেছিল।

—পাপ! পাপ! দে পাপ ঝেড়ে ফেলে। যা, দূর হ। ডোবায় ডুবে যা।

তারপর বসেছিল পুজোয়।

সে পুজো সেরে উঠেছিল তিন দিন পর। তাও নীল-সংক্রান্তির গাজনের ঢাক বাজিয়ে বাণ-গোঁসাই নিয়ে গাজনের ভক্তদের হাঁকে চমকে উঠে ফিরে না-তাকালে উঠত কি না সন্দেহ। সেদিন অনেক কাজ। ঠাকুর ঝারায় বসবেন। অর্থাৎ কাঠের তেকাঠার মাথায় বহুছিদ্রযুক্ত মাটির ভাঁড় বসিয়ে সেটিকে জলপূর্ণ করে ঠাকুরের উপর স্থাপন করা হবে। প্রখর তাপে শীতল ধারা-স্নানে অভিষিক্ত হবেন দেবতা। তুলসীগাছের উপর বসানো হবে। অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে জলসিঞ্চন করতে হবে। পিতৃপুরুষকে জলদান করবে গৃহস্থেরা। পুণ্যাত্মারা পথের পাশে জলসত্র দেবে। কাজ অনেক।

সমস্ত কৃত্যগুলি সেরে সে বলেছিল, আমি সুপুরে যাচ্ছি গোঁসাই ঠাকুরের কাছে।

মোহিনী আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এই রোদে যাবি মা?

মা উত্তর দেয় নি, শুধু মেয়ের দিকে একবার তাকিয়েছিল মাত্র। তার সে দৃষ্টিতে বৈশাখের রৌদ্রের চেয়েও জ্বালা বেশী, তাপ বেশী। মোহিনী ভয় পেয়েছিল, আর কোনও কথা বলতে সাহস করে নি। গামছাখানা ভিজিয়ে মাথায় চাপিয়ে কেষ্টদাসী বেরিয়ে চলে গিয়েছিল। পথে জলসত্র দেখে চোখে-মুখে জল দিয়ে একটু জল খাবার জন্য গিয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল। আশ্রমের ধ্বজাটি বাঁধা ছিল একটি গাছের ডালে—রৌদ্রের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই কেষ্টদাসী উপরের দিকে তাকায় নি। জল ছোলা গুড় দিচ্ছিল যে, সেও স্থানীয় লোক। আশ্রমের সেবক দুজন অন্য-একটি গাছতলায় কতকগুলি লোকের জমায়েতের মধ্যে বসে একখানি পুঁথি পাঠে নিমগ্ন ছিল। কেষ্টদাসী তাদেরও দেখতে পায় নি। অঞ্জলি পেতে জল নিয়ে মুখে চোখে দেবার সময় হঠাৎ চোখ পড়েছিল গেরুয়া পাগড়ির উপর। হাতের জল তার—তার অজ্ঞাতসারেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গিয়েছিল, সে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সন্ন্যাসীদের দিকে।

যে জল দিচ্ছিল সে বলেছিল, জল নাও গো। অ মা-জী!

সাড়া দেয় নি কেষ্টদাসী। লোকটি আবার ডেকেছিল, মা-জী!

এবার কেষ্টদাসী ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, বিষ—বিষ। জল নয়, বিষ। রাধাকে ওরা বনবাসে দিয়েছে—শ্যামের পাশ থেকে দূর করেছে। ওদের জলসত্রের জল খেয়ো না—ইহকাল যাবে পরকাল যাবে। খেয়ো না। বিষ। বিষ। বিষ।

বৈশাখের প্রখর রৌদ্রও চমকে উঠেছিল বোধ হয় তার সে চিৎকারে। যারা গাছতলায় বসে পুঁথিপাঠ শুনছিল, তারা চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এক অদ্ভুত কাণ্ড।

কোথা থেকে কে কাকে খবর দিলে সে কেউ বলতে পারে না, লোক জমে গেল দলে দলে। জলসত্রের জলের জালা উল্টে দিলে—ছোলা ছড়িয়ে, গুড় ছিটিয়ে ফেলে দিলে, ধ্বজাটা টেনে নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিলে। খোল এল, করতাল এল—রাধা-গোবিন্দের নামসংকীর্তনে আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল।

লোকে বললে, মা-জীর ভর হয়েছে। অর্থাৎ মা-জীর মধ্য দিয়ে দেবতা

কথা বলছেন। কয়েকজন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের আলখাল্লা পাগড়ি ছিঁড়ে দিতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু মা-জী বলেছিল, না। ওরা ফিরে যাক।

সংকীর্তন নিয়ে কেষ্টদাসী ফিরেছিল ইলামবাজারের দিকেই। সুপুর যাওয়ার কথা বোধ করি ভুলেই গিয়েছিল। সেখানে সারাদিন কীর্তন হবে। কেষ্টদাসী তখন নিজেও প্রায় আত্মহারা। সে গেয়েই চলেছিল—

"জয় রাধে, জয় রাধে, জয় রাধে।
রাধা আমার মহাজন, শ্যাম সে খাতক রে।
রাধা আমার বারিধারা, শ্যাম সে চাতক রে।
রাধা আমার পূর্ণ চাঁদ, শ্যাম সে চকোর রে।
রাধা সে অমূল্যমণি, শ্যাম সে আকর রে।
শ্যাম নব জলধর, রাধা সে বিজুরী রে।
শ্যাম আমার নীলকমল, রাধা সে মাধুরী রে।
রাধা ছাড়া শ্যাম নয়, শ্যাম ছাড়া রাধা নয়।
রাধা-গোবিন্দ জয়, জয় রাধা-গোবিন্দ জয়।
রাধা-গোবিন্দ আমার, নিখিল ভুবনময়।"

সকল ভুবনময় সকল জীবনময়। কেষ্টদাসীর গানের প্রতিধ্বনি উঠছিল জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে। আকাশ স্পর্শ করছিল সে ধ্বনি। গানের আখরের মাধুর্যে এবং গায়কদের প্রাণের আবেগে রাধা-গোবিন্দের যুগলসত্তা সত্যিই যেন ভুবনময় মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

* * *

সংকীর্তনের দল পথে পথে পরিপুষ্ট হতে হতে ইলামবাজারে এসে ইলামবাজারের মূল বাজার এবং বন্দর-ঘাটকে পাশে রেখে জয়বাজারের পূর্ব-প্রান্তে এসে যখন পৌছল, তখন সেখানে হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছে। ইলাম-বাজার এবং জয়বাজারের মধ্যবর্তী এই মাঠটির মধ্যে খানিকটা, মানে বেশ কয়েক বিঘা, পতিত জমি নিয়ে একটি বড় পুকুর; এই পুকুরটির চারিপাশ ঘিরে শনিবার শনিবার সেকালে বসত গরু-মহিষের হাট। কয়েকখানা চালাঘরে কয়েকটা দোকান বারো মাসই থাকত সেখানে। দু-চারখানা খালি চালাঘর থাকত। হাটের দিন জমিদারের লোক ওখানে বসে তোলা অর্থাৎ

বিকি-কিনির উপর একটা মাশুল আদায় করত। বাকী দু-তিনখানা ছিল এখানকারই বড় পাইকার অর্থাৎ দালালদের আস্তানা। তারা এখান থেকে সওদা করে যেত বড় বড় হাটে—হিরণপুর, পাচুন্দী এবং খাস মুরশিদাবাদ পর্যন্ত। শনিবার দুপহর হতে হতে ঠাঁইটার চেহারা হত মহাভারতে বর্ণিত উত্তর-গোগৃহের মত। অন্য ছ দিন খাঁ-খাঁ করত, তবে দুপুরের সময় পাশের সড়ক ধরে যারা যেত-আসত তারা বিশ্রাম করত, মুড়ি-চিঁড়ে খেত, তামাক সেবন করত, তারপর আবার চলে যেত। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে পুকুরটার জল বালুময় মাটির রন্ধ্রপথে অজয় টেনে নিত। জলের অভাব ঘটত। মাধবানন্দের শিষ্যেরা এখানেও একটি জলসত্র খুলেছিল, হৈ-হৈ সেখানেই।

অক্রূরের অনুচরেরা এখানে তাণ্ডব শুরু করেছে তখন।

অক্রূরের মস্তিষ্ক মাধবানন্দকে অপমানের উপায়-উদ্ভাবনেই চিন্তান্বিত ছিল। কৃষ্ণদাসীই তার মস্তিষ্ককে এ বিষয়ে সক্রিয় করে দিয়েছে সে দিন। ওই শর্তে সে মোহিনীকে দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু নিজে সে শয্যাশায়ী তাই এতদিন একটা কিছু করে উঠতে পারে নি। সাধারণ লোক হলে এতদিন যাহোক একটা কিছু হয়ে যেত। কিন্তু মাধবানন্দের আশ্রমবাসীরা সেদিন, ওই নাগা সন্ন্যাসীই হোক আর ছদ্মবেশী বর্গীই হোক, তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তাতে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। সাধারণ লোক হলে অক্রূরের অনুচরেরা এতদিন কোন্‌দিন হা-রে-রে শব্দ করে তার বাড়িতে হানা দিয়ে ঘরের চালখানা উল্টে দিয়ে তাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আসত। এবং সারা ইলামবাজারের বাজারটায় হয় কান ধরে, নয় গলায় গামছা দিয়ে টেনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। নবাবী শাসন খুবই কড়া। নবাব সুজাউদ্দৌল্লা, শ্বশুর মুরশিদকুলিখাঁর শাসনকে ঠিক বজায় রেখেছেন। কিন্তু অক্রূর বলে, বাবা নাম দিয়া, উ তো অক্রূর হ্যায়, লেকিন দুনিয়া বোলতা হম ক্রূর হ্যায়। হ্যাঁ, ক্রূর হ্যায়, জবরদস্ত শূর ভি হ্যায়, নেশামে মগজ হরদম চুর হ্যায়। কাজীকে দরবার দূর হ্যায়। বহুত কাজী হম দেখা ভি হ্যায়। জেব মে রূপাইয়া হ্যায়, কাজী-গাজী-পাজী সব কোই ইসমে রাজী হ্যায়। ফৌজদার-সে সুবাদার সব দরবার মে রূপাইয়া-সে কেয়া নেহি হোতা হ্যায় ?

বলেই নিজের রসিকতায় এবং এমন কাব্যপ্রতিভায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে অট্টহাস্য করে ওঠে। কোন একটা কিছু যেদিন ঘটে যায়, সেই দিনই বা পরের দিন খাসি ঘি থেকে শুরু করে জাফরান পর্যন্ত সাজিয়ে মধ্যস্থলে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বিরাট সিধের খেলাত চলে যায় হাতেমপুরের খাঁ সাহেবের দরবারে। কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীকে দমন-সমস্যাটা এত সোজা নয়। শুধু শক্তিমান বলেই নয়, নবীন সন্ন্যাসীর আশ্রম হাতেমখাঁর এলাকার বাইরে। অজয়ের ওপার বর্ধমানের রাজার এলাকা। কিছুদিন আগে শোভাসিং আর পাঠানদের বিদ্রোহের সময় বর্ধমান-রাজকন্যাকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেল, তারপর বর্ধমান নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তেজস্বিনী বর্ধমান-কন্যা যে দীপ্তিচ্ছটা ছড়িয়ে বংশগৌরবকে উজ্জ্বল করে গিয়েছেন তার উপযুক্ত উত্তাপ সংগ্রহ করেছে বর্ধমান এবং নিজে থেকেই সঞ্চারিতও হয়েছে।

হঠাৎ সেদিন কিছুক্ষণ আগে, জলসত্র নিয়ে কৃষ্ণদাসীর বিচিত্র যুদ্ধকথা শুনে বিছানা চাপড়ে বর্বর চিৎকারে বাহা-বাহা করে উঠেছিল অক্রূর।—বাহা রে মা-জী! বাহা বাহা বাহা! সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পেড়েছিল, ওরে শূয়ারের বাচ্চা হারামজাদা কেলো!

কেলোর দল অক্রূরের অষ্টপ্রহরের সঙ্গী। এই অসুখের মধ্যে তারা হাজির থাকত, গাঁজা টিপে তৈরি করে হুজুরকে খাওয়াত। অশ্লীল গল্প বলত। গান করত। পদ-যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোমল হাতে হাত বুলাবার জন্য নারী সংগ্রহ করে আনত। অক্রূরের হাঁকে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল কেলে এবং বলেছিল, কী বলছ?

—যা, আভি যা, ওই গো-হাটায় সন্ন্যাসী-বেটারা যে জলসত্র বসিয়েছে দিয়ে আয় ভেঙে। আর সন্ন্যাসী-বেটাদের—

—কেটেকুটে পুঁতে দোব অজয়ের গাবায়?

—দিবি?

—তুমি বললেই দোব।

—বেটাদের বন্দুক আছে রে! তার চেয়ে কান মলে, মাথায় চাঁটি, পাছায় লাথি মেরে ভাগিয়ে দিয়ে আয়। নাকগুলো বেটাদের ঘষে দিবি।

কৃষ্ণদাসীর কীর্তনের দল যখন ওই হাটের কাছে এসে পৌঁছেছিল—তখন কেলোর দল ওই তাণ্ডবে মেতে নৃত্য করছিল। কৃষ্ণদাসী থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বর্বর অক্রূরের এই পাষণ্ড অনুচরের দল এই অত্যাচার করছে নবীন সন্ন্যাসীর অনুচরদের উপর? সে ভুলে গিয়েছিল যে, এ অনুরোধ সেই করেছিল। তার প্রতিবাদ রাধার অপমানের জন্য, তার মর্মে আঘাতের জন্য। অক্রূরের কী অধিকার? এই পাষণ্ডেরা কিসের জন্য এ তাণ্ডব করছে? কেন করবে? সেই নবীন সন্ন্যাসীর অপমান হবে অক্রূরের হাতে?

সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণদাসীর। অন্তরাত্মার তাড়নায় সে চিৎকার করে উঠেছিল, ধ্বংস হয়ে যাবে। সব পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে যমদূতেরা। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। ওই সন্ন্যাসীদের রক্তপাত হলে সর্বনাশ হবে। রক্তগঙ্গা—আগুন—মহামার—মহামারী! সাবধান! সাবধান! সাবধান!

অবাক হয়ে গিয়েছিল দলের লোকেরা।

কেলে সর্দার অক্রূরের অনুচর। সে সহজে দমে না। সে হি-হি করে হেসে বলেছিল, তুমিই তো বলেছ গো।

তার পুরো বক্তব্যটা ছিল এই যে, তুমিই তো বলেছ গো অক্রূর সরকারকে। এ আবার এখন কী বলছ? কিন্তু অধীর, অস্থিরমস্তিষ্ক কৃষ্ণদাসী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠেছিল, ওরে পাপের অনুচর প্রেত, ওরে নরকের আগুনের কালি, ধর্মের ভুলভ্রান্তির প্রতিকার করবি তোরা? মন্তর ভুল হয়েছে বলে হোমের ঘিয়ের আহুতিতে জ্বালবি তোরা? সরে যা, দূরে যা—পাপ—পাপ—মহাপাপ! জ্বলে যাবে, জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে দেশ—ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার ওই বন। দাউ দাউ করে জ্বলবে। দলে দলে যমদূত আসবে রে, ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে ধুলো উড়ে সব ঝাপসা হয়ে যাবে। তারপর রক্তগঙ্গা! রক্তগঙ্গা!

বলতে বলতে তার চোখ হয়ে উঠেছিল বিস্ফারিত, নাকের পেটি দুটো থরথর করে কাঁপছিল। হাতের আঙুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল যেন আপনা-আপনি। মনে হচ্ছিল জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে এখনই। জ্ঞান হারাবে নয়—জ্ঞান যেন ওর হারিয়েই গেছে; এ-লোকে দাঁড়িয়েও, এই লোকে আর

সে নেই এখন। কোন অলৌকিক লোকে দাঁড়িয়ে ওই বিস্ফারিত চোখে দিব্যদৃষ্টির মত দৃষ্টিতে এক বিচিত্র জগৎ দেখে কথা বলছে; সে জগতে সকল কর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্তমান-ভবিষ্যৎ পটুয়াদের পটের মত খুলে যাচ্ছে।

সাধারণ মানুষদের কথা থাক্, এবার ভয় পেয়েছিল ওই কেলে সর্দার পর্যন্ত। এ কী মূর্তি! মা-জীর এমন মূর্তি সে তো কখনও দেখে নি! কতদিন মা-জী সময়ে অসময়ে তাকে শাসিয়েছে, বলেছে, আমি ডাকিনী বিদ্যে জানি কেলে। সাবধান! কেলে ভয় করেছে, আবার করে নি। এবং ভয় করা বা না-করা ছুটো দিকের কোন একটা দিক নিয়ে খুঁট পেতে দাঁড়াবার প্রয়োজনও হয় নি। অর্থাৎ সব সময়েই একটা মিটমাট হয়ে গেছে। আজ তার নিশ্চিত বিশ্বাস হল—মা-জী ডাকিনীমূর্তি ধরছে। সে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলেছিল, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি। আয় রে—আয় রে, সব চলে আয়, চলে আয়।

আশ্রমের কর্মীরাও এই উন্মাদিনীর মধ্যে এক দিব্য মূর্তিকে যেন প্রত্যক্ষ করেছিল। তারা প্রণাম করেছিল কৃষ্ণদাসীকে। বলেছিল, তুমি মা। তুমি মা।

কৃষ্ণদাসী এবার অকস্মাৎ হা-হা করে কেঁদে উঠেছিল। এবং মুহূর্ত কয়েক হা-হা শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করে কেঁদেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিল।

* * *

সে জ্ঞান তার ফিরেছিল প্রায় প্রহর খানেক পর। তখন নাম-সংকীর্তনে সমাগত লোকেরা তাকে ধরাধরি করে তার আখড়ায় এনে শুইয়ে দিয়েছে। মোহিনী একান্ত ভাবে অবোধ মেয়ে, তার বয়সের অনুপাতেও বোধশক্তি পরিপুষ্ট হয় নি। সে ভয়ে প্রায় স্তম্ভিত হয়ে নির্বাক হয়েই বসে ছিল। শুধু কাঁদছিল।

প্রাচীন বৈষ্ণবেরা এসে বসে ছিল। তারা সকলেই তাদের ধারণা অনুযায়ী বলেছিল, দশা। দশা হয়েছে কৃষ্ণদাসীর। এতবড় সিদ্ধ পাটের মহিমা! যাবে কোথা? উঠানে সংকীর্তনের বিরাম ছিল না।

জয় রাধে রাধে—জয় জয় রাধে!
বাঁশরী বাজায়ে শ্যাম রাধানাম সাধে।

রাধে! রাধে! জয় জয় রাধে!
মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে তিন ভুবন কাঁদে।
রাধে! রাধে! রাধে! রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে! জয় রাধে!

এরই মধ্যে কৃষ্ণদাসী একসময় চেতনা পেয়ে উঠে বসেছিল। কিন্তু তখন সে প্রায় বদ্ধ উন্মাদ। অসম্বৃতকেশবাস রূপসী কৃষ্ণদাসী উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আমি রাধা, আমি কলঙ্কিনী, আমি সামান্যা, আমি গোপনারী, তোমার গরবে আমি গরবিনী—তুমি আমাকে ধুলায় লুটিয়ে দিলে! আমি যে তোমার জন্যই চন্দন মাখি অঙ্গে; সেই অঙ্গে ঢেলে দিলে কলঙ্কের কালি!

বলতে বলতে আবার হা-হা করে কান্না। সে কী কান্না!

আজীবন না হোক, আযৌবনই কৃষ্ণদাসী পাপিষ্ঠা। কিন্তু ওই পাপিষ্ঠার মরুভূমির মত অন্তরে কোথায় ছিল ফল্গুর মত অপরূপের তৃষ্ণার স্নিগ্ধ একটা প্রবাহ। দেহসম্ভোগের লালসাবিক্ষুব্ধ লবণ-সমুদ্রের মত জীবনের মধ্যে কোথায় ছিল প্রেমকামনার অনির্বাণ বহ্নিশিখা, আজ জীবনের ঘাতে-প্রতিঘাতে মরুভূমি বিদীর্ণ হল, সমুদ্র শুকাল, বয়ে গেল একটি নির্ঝরিণী-প্রবাহ; তারই তীরে জ্বলে উঠল একটি হোমকুণ্ড। কৃষ্ণদাসী পাগল হয়ে গেল।

* * *

কয়ো বরাবরই তাদের কাছে কাছে আছে। মা-জীকে মোহিনীকে—দুজনকেই সে ভালবাসে। সে ভালবাসা জন্তুর মত ভালবাসা। যদি কেউ বলে কুকুর-বেড়ালের মত তো বলার কিছু নেই। বলেও লোকে। পুরুষেরা বলে—আখড়ার কুকুর। মেয়েরা বলে—কুকুর নয়, কেষ্টদাসীর হুলো বেড়াল। ঘেউ ঘেউ নয়—ম্যাও-ম্যাও ওর ডাক। মরণ! মেনী মোহিনীর গা চেটেই পোড়ারমুখোর সুখ!

কয়ো শুনতে অবশ্যই পায়। কিন্তু বলে না কিছুই। খুব খোঁচালে বলে—কয়ো কয়ো। কুকুরও না, বেড়ালও না। কেষ্টদাসী বেলগাছ, মোহিনী বেল; বাসা বেঁধে বেলগাছে আছি। বোধ হয় আর-জন্মের কম্মফের।

তারপর ভেবেচিন্তে আবার বলে—আর-জন্মে বেম্মদত্যি ছিলাম, মরে

কয়ো হয়েছি। বেলগাছ ছাড়া তাই মন ওঠে না। তোদের চামড়ার মুখে যা আসে বলে যা। তবে মোহিনীর কথা বলিস নে, পাপ হবে। বেলের নাম শ্রীফল। মা-লক্ষ্মী নিজের স্তন কেটে শিবপূজা করেছিল। ওতে কয়ো কখনও ঠোকর মারে না। পাকলেও ও-গন্ধ কয়োর ভাল লাগে না। আমি, যে ন্যাড়া বেটারা বেলের লোভে আঁকশি নিয়ে আসে, তাদের মাথায় ঠোকর মারি। বাস্।

কয়ো সে-দিনও মা-জীর পাশে পাশেই ছিল। পয়লা বৈশাখ, বহু স্থানে বহু দান বহু সেবা বহু ভোগ। কয়ো সকাল থেকে ঘুরে ঘুরেই বেড়াচ্ছিল। আগের দিন চৈত্র-সংক্রান্তিতে ছাতু খেয়েছিল পেট পুরে। সকালে একটু অগ্নিমন্দা ছিল। তাই এখানে ওখানে ওই ইলামবাজারেই—শশা বাতাসা গুড় ছোলাভিজে খেয়েই তৃপ্ত ছিল। ঠিক করেছিল আরও একটু বেলা চড়লে অর্থাৎ দুপহরের কাছাকাছি হলেই যাবে সুপুরে, সিদ্ধপুরুষ আনন্দ ঠাকুরের ওখানে গিয়ে এঁটোকাঁটায় তৃপ্ত হয়ে আসবে। তবে ঠাকুর বোষ্টমদের শিরোমণি, মা-জীরও বাবার বাবার মত বাবাজী, ওঁর ঘরে এঁটো আছে কাঁটা নেই। একেবারে নিরামিষ। তা হোক, বছরের প্রথম দিন। সিদ্ধপুরুষের গোবিন্দের প্রসাদ। আর কয়ো হলেও কয়ো তো বোষ্টম বটে। আজ নিরামিষই ভাল। শুক্তো, বড়িভাজা আর গুড়-অম্বল যা মধুর, তাতে ওর কাছে অমিষের কাঁটা কোথায় লাগে!

হঠাৎ মা-জী গামছা মাথায় বের হল, মোহিনীকে বললে, আমি চললাম সুপুর, ঠাকুরের কাছে। কয়ো সঙ্গ নিয়েছিল। পথে এই কাণ্ড। কাণ্ড যখন হল তখন কয়ো নিরামিষ শুক্তো বড়িভাজা গুড়-অম্বলের লোভ ত্যাগ করেই মা-জীর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরেছে। অবাক হয়ে দেখেছে। ভেবে কূল-কিনারা পায় নি। এ হল কী? মা-জীর জীবনের আলো-অন্ধকারের খেলার কথা তো খুব ভাল করেই জানে। এ যে একাকার হয়ে গেল। মা-জী যদি অক্রূর সরকারের বাহন ওই কেলে সর্দারের তাণ্ডব দেখে নৃত্য করত তবে সে বিস্মিত হত না। সূর্যে গ্রহণ লাগে—অন্ধকার আলোকে গিলে ফেলতে চায়; সর্বগ্রাসী গ্রহণও দেখেছে সে। অজয়ের ঘাটে লোকে

যখন হরিনাম করেছে, স্নান করেছে, কয়ো তখন একটা ভুষো-কালি-মাখানো কাচ চোখের সামনে ধরে গ্রহণ দেখেছে—সেই গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। আর অন্ধকারকে মনে মনে প্রণাম করে বলেছে—হাঁ, তুমি জিন্দে বট। বাপ রে, বাপ রে! অমন সাক্ষাৎ আগুন—সুয্যিকে গব করে গিলে ফেললে! তবে ভাগ্যে উগ্‌রে দাও। সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণের কথা মনে পড়ে, বীর হনুমান নাকি সুয্যিকে বগলে ভরে রেখেছিল; অবিশ্যি সুয্যির তাতে সায় ছিল; তা থাকুক, কিন্তু সুয্যি তো বটে। বোশেখ মাসে অজয়ের বালির আঁচে ধান পড়লে খই হয়, মানুষ পড়ে তিন-চারটে কাত ফিরলে ঝলসে কালো হয়ে যায়—বাবা, সেই সুয্যি! মনে মনে সে হনুমানকেও প্রণাম করে। আর বুঝতে পারে, পশ্চিমা পালোয়ানগুলোর জোর কেন এত বেশী! ওই মহাবীরের চ্যালা বলে। কিন্তু আজ মা-জীর এ কী হল? অন্ধকারের মত আলোকে গিলতে এল, এসে আলোর তেজে পুড়ে ছাই হয়ে গেল নাকি! মা-জীর চোখে এত জল ছিল কোথায়! কিন্তু এ যে পাগল হয়ে গেল!

চকিতে একদিন মনে হয়ে গেল একটা কথা।

এ ওই নবীন সন্ন্যাসীর মহিমা।

সন্ন্যাসীর কাছে যে অপরাধ করেছে, কেষ্টদাসী তারই শাস্তিতে পাগল হয়ে গেল। আর তারই মহিমাতে তার সব অন্ধকার কালো কাপড়ের মত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার কেষ্টদাসী বলেও উঠেছে, মণির ছটা দেখে বিষধরের কথা আমি ভুলে ক্যানে হাত বাড়িয়েছিলাম রে! জ্বলে গেল। বিষে আমি জ্বলে গেলাম। তার অর্থ অন্যে কে কী করে তা কয়ো জানে না, কিন্তু তার সঠিক অর্থ কয়ো জানে। সেই কারণেই সে প্রশ্ন করতে এসেছে মাধবানন্দকে। প্রতিকার ভিক্ষা করতে এসেছে।

মাধবানন্দ সমস্ত শুনে যে কথা বললেন, সে তার মনঃপূত হল না। বিশ্বাস হল না। সন্ন্যাসী তাকে ছলনা করলেন! বললেন, না কয়ো, আমি সিদ্ধপুরুষ নই।

মোহিনীর কথা বলে তার জন্য সে করুণা ভিক্ষা করলে। হায় সিদ্ধপুরুষ, তুমি তো সব জান! তবু তোমায় করুণা হল না! মোহিনী সত্যিই

কেষ্টদাসীর মেয়ে কি না এ নিয়ে কয়োরও সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয়, হয়তো কোনদিন অজয়ের ঘাটে সেই ভোরের বেলা স্নান করতে এসেছিল কেষ্টদাসী, সেই লগ্নে এক পদ্মপাতার-উপর-ভাসিয়ে-দেওয়া মেয়ে এসে কেষ্টদাসীর গায়ে ঠেকেছিল। রাধার মত। রাধাও নাকি এক ফুটন্ত পদ্মফুলের মধ্যে জন্মে ফুলের মতই ফুটেছিলেন। মোহিনী তেমনি মেয়ে। মাটির সংসারে ধুলা-মাটিতে এরা মলিন হয় না—দুঃখ পায়। ঠাকুর, নবীন সন্ন্যাসী তুমি, পাথর। এতটুকু করুণা হল না তোমার? মায়া হল না?

কয়ো জীবনে বোধ করি দীর্ঘনিশ্বাস কখনও ফেলে নি। আজ সে সম্ভবত প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর ফিরল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার আর দেরি করবার উপায় নাই। আগে সে উড়ো কাক ছিল। বাসা ছিল না। এখনও তার বাসা নাই, কিন্তু কেষ্টদাসীর আখড়ার ডালে না-বসলে তার প্রাণ ছটফট করে। গাছের তলায় মোহিনী পড়ে আছে—পুরাণের গল্পে শোনা, সেই এক অপ্সরার ফেলে-দেওয়া মেয়ের মত। সে মেয়েকে শকুনে পাখা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। কয়ো মোহিনীকে আগলায়। কেষ্টদাসী সারারাত্রি উঠানে বেড়ায় ডাকিনীর মত বাট বয়ে।

বর্বর অক্রূর অনেকটা নাকি সেরে উঠেছে এই দু মাসে। লাঠি ধরে ঘরের উঠানে বেড়াচ্ছে এবং গালাগাল দিচ্ছে কেলেদের। কেলে বলেছে, মা-জীর ছামনে আমি যাব না ছোট সরকার। তুমি চল, তুমি ছামনে দাঁড়াবে। আমি মোহিনীকে পটাস করে কচিলাউ-ছেঁড়া করে কাঁধে ফেলে চলে আসব। ছামনে আমি যাব না। ও বাবা, কাপড়খানা টেনে খুলে ফেলে দেবে আর আমার খালখানা (চামড়া) চড় চড় করে ছড়া পাঁঠার মত টেনে ছাড়িয়ে নেবে। বাপ রে!

কথাটা মিথ্যা নয়। তার সাক্ষী জয়দেব-কেন্দুলী যাবার পথের পাশে হেলে-পড়া অশথগাছটা। কেলে ডোমের ঠাকুরদাদা জানত ডাকিনী-বিদ্যা। সে তার এক সাঙাতের সঙ্গে এক পূর্ণিমার রাত্রে ঠ্যাঙা হাতে বসে ছিল। তখনও কুলীখাঁ নবাব হয়ে বসে নি। ঠ্যাঙাড়ের কাল—ডাকাতি ব্যবসার খুব ফলাও অবস্থা। পথে রাহাজানি দিনের বেলাতেও চলত। কেলের ঠাকুর-দাদার ঘরে তখন দুটো পরিবার, একটা রক্ষিতা। শাহী জোয়ান আর

বিদ্যেতে তেমনি ডাকসাইটে গুণিন। পথে লোক ছিল না। তাকিয়েছিল আকাশের দিকে। আশ্বিন মাসের ধোয়া-মোছা আকাশ ষোল কলায় ঝলমলে চাঁদের আলোয় সে যেন দুধ-সাগরে বান ডেকেছে। হঠাৎ একটা সোঁ-সোঁ শব্দ উঠল আর মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড পাখি পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কেলের ঠাকুরদাদা হেসে বলেছিল, কী বল্ তো ?

সাঙাত বলেছিল, তাই তো রে! কী পাখি বল্ দিনি ?

—পাখি নয়। ডাকিনী। গাছে চড়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

সাঙাত বলেছিল, মিছে কথা। সব তোর ধাপ্পা। ওই ডাকিনী-বিদ্যে সুদ্ধু তোর ধাপ্পাবাজি। কই, কখনও তো পেমান দিস নাই। পাখিকে বলে ডাকিনী!

মদের মুখে গালাগাল হয়ে গিয়েছিল। কেলের ঠাকুরদাদা বলেছিল, তবে দেখ্ শালা। চোখে দেখ্। বলেই হেঁকেছিল মন্তর। বিচিত্র কাণ্ড! বিরাট পাখিটা চলেছিল সোজা তীরের মত পূব থেকে পশ্চিমে। সেটা আকাশে পাক খেতে শুরু করেছিল। যেন ঘুরতে শুরু করল। এবং নামতে লাগল ধীরে ধীরে। সাঙাত অবাক। পাখিটা যত নামছে তত যেন সত্যিই গাছ হয়ে উঠছে। ডাল পালা কাণ্ড স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তারপর গাছটা ওই ভাবে হেলে মাটির উপর নামল। একটা দু-ডালের অশত্থগাছ। তার ডালের উপর বসে এক উলঙ্গিনী এলোচুল রূপসী মেয়ে। দুই হাতে মুখ ঢেকে বললে, নামালে যদি তো লজ্জা রাখ গুণিন। দাও কাপড়, না হয় গামছাও দাও একখানা। দাও—দাও।

কেলের ঠাকুরদা তখন মেতেছে। সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আকাশে চন্দ সুয্যি সাত তারা। তাদের ছামনে লজ্জা নাই, যত লজ্জা মাটির ওপর মানুষের ছামনে? নাম্, নাম্, গাছ থেকে নাম্। মুখ থেকে হাত খোল্—চাঁদ বদনটা দেখি।

নামল মেয়েটা, হাতও খুললে, চোখে যেন জল। মুখে বললে, ওগো, আমি মেয়েমানুষ।

সঙ্গের সাঙাত আর থাকতে পারে নি। নিজের গামছাখানা মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, এই নাও।

কেলের ঠাকুরদাদা চিৎকার করে উঠেছিল, করলি কী? করলি কী? হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে-দেওয়া গামছাখানা ধরতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন মেয়েটার হাতে গামছা পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় ঝলমলে আকাশখানায় যেন বিনামেঘে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠল—বিদ্যুৎ নয়, ওই উলঙ্গিনী মেয়েটার খিলখিল হাসিতে।—হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি!

ওপারের গড় জঙ্গলের শালবনের পাতায় পাতায় সে হাসি বাতাস তুললে। মেয়েটা সেই গামছাখানায় দেহটা ঢেকে নিয়েই আবার টেনে খুলে মাথা পার করে পিছনে ফেললে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা পাঁঠার ছাল-ছাড়ানোর মত কেলের ঠাকুরদাদার চামড়া কে যেন টেনে ছাড়িয়ে ফেলে দিলে। একটা ছাল-ছাড়িয়ে-নেওয়া কাঁচা মাংসের পিণ্ডের মত পড়ে গেল সে।

সাঙাতও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ডাকিনী যে গাছটা চালিয়ে এসেছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে আর-একটা গাছে উঠে সেটাকে উড়িয়ে আবার আকাশ-পথে উড়ল। গাছটা রইল এখানে ডাকিনী-বিদ্যের জয়ধ্বজা হয়ে।—ডাকিনীকে ঘাঁটিয়ো না।

কেলে সেই ভয়ে যায় নাই।

অক্রূর আস্ফালন করছে: আচ্ছা, আমার ভাল হোক। অক্রূর শূর হ্যায়। মরণকে ডরতা নেহি। আওরতকো ছোড়তা নেহি।

কয়ো অক্রূরকে আটকাতে হয়তো পারবে না। কিন্তু কা-কা শব্দ করে সাবধান করে দিতে পারবে।

কয়ো মাধবানন্দের আশ্রম থেকে ফিরল।

অজয়ের ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল। কিসের যেন শব্দ উঠছে! নাগারার! হ্যাঁ, নাগারাই তো। দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।

কী একটা আসছে! একটা গাছ!

ওঃ, সাত-আট হাত উঁচু একটা মানুষ। রণপার উপর চড়ে আসছে। বাপ রে বাপ! ডাকাত নয়, মাধবানন্দ গোস্বামীর চর অনুচর। এ-পারে আশপাশের গ্রামে ইতিমধ্যেই কেশবানন্দের ব্যবস্থায় অনেক লোক আশ্রমের কাজে লেগেছে। কেন্দুলীর মহান্ত মহারাজের পাইক বরকন্দাজের মত ব্যবস্থা।

পিছনে বনটার মুখে কোন এক অজ্ঞাত স্থান থেকে কে যেন প্রশ্ন করলে, কে আসে ?

রণপার উপর থেকে লোকটা উত্তর দিলে, জয় কংসারি !

বন থেকে আবার শব্দ হল, জয় মাধব !

রণপা সওয়ার বললে, জয় কেশব !

তারপরেই বললে, আমি পরাণ পাইক। জরুরী খবর আছে। হ্যাতমপুরের হ্যাতেম খাঁ ফৌজদার ফৌত হইছে। হাফেজ খাঁ ফৌজদার হলছে। ঢেঁরা পড়ছে ইলেমবাজারে।

কয়ো চমকে উঠল। মনে পড়ে গেল নবীন গোঁসাইয়ের কথা। গোঁসাই, তুমি সিদ্ধপুরুষ। মুখে না-বললে কী হবে! তুমি এই মাত্র সেই মণিটি ফেরত দিয়ে বললে—এটি বোধ হয় হেতমপুরের হাফেজ খাঁয়ের বিবির। কয়ো, এইটি নিয়ে সেখানে যাও।

এই তো বললে! এই তো!

আবার বল তুমি সিদ্ধপুরুষ নও!

॥ নবম পরিচ্ছেদ ॥

মাধবানন্দ দেবতার সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন।

কৃষ্ণদাসী উন্মাদ হয়ে গেছে। সেই সরলা কিশোরী মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যাবে বর্বর অক্রূর! কৃষ্ণদাসীর উপর সেদিন তাঁর অপরিসীম ঘৃণা হয়েছিল। তার বেশভূষা তার চোখের কোণে কালির ছায়ার মধ্যে লালসাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। মনে পড়ে গিয়েছিল বাল্যকালের স্মৃতি। সেদিন জলসত্র নিয়ে যে কাণ্ড ঘটে গেছে তাতে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। আজ সমস্ত শুনে তাঁর অন্তরে তিনি বেদনা অনুভব করছেন। সেই বেদনাকে বিস্মৃত হবার জন্যই ধ্যানে বসবেন। ওই বেদনা অনুভব করাও তাঁর উপলব্ধিমতে দুর্বলতা। ওকে প্রশ্রয় দিলে সহস্র বা লক্ষ-বাহু আলোকলতার মত জীবন-সাধনার বনস্পতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

নারীর মধ্যে আদিম মহাপ্রকৃতি প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করেন। যিনি পুরুষকে আয়ত্ত করে পরিশেষে গ্রাস করে নিশ্চিন্ত হন, তাঁর কামনা শুধু সৃষ্টির। মহাকালীর ধ্যানে আছে "বিপরীত রতাতুরাং সুখ প্রসন্ন বদনাং স্মেরানন স্মরারুহাং।" হ্যাঁ, আদিম নারীপ্রকৃতির স্বরূপ এর থেকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ আর হয় না। কিন্তু তার বুক থেকেই প্রকাশিত হয় চৈতন্যস্বরূপ, মহা-অগ্নির মধ্য থেকে মহা-জ্যোতির মত। সেই জ্যোতির্ময়কে প্রকাশ করেও তার সান্ত্বনা নেই। সেই আবার ওই জ্যোতির্ময়কে আচ্ছন্ন করবার জন্য মরীচিকার পিছনে হরিণীর মত ছোটে। যিনি চৈতন্যকে প্রকাশিত করে চৈতন্যের হৃদয়ে হ্লাদিনী শক্তি হয়ে অধিষ্ঠিত হন, তিনিই বাইরে এসে রাধা হয়ে চৈতন্যময় পুরুষোত্তমকে আচ্ছন্ন করেন। কিন্তু চৈতন্যময় পুরুষোত্তম সে আচ্ছন্নতা কাটিয়ে চলে যান। রাধা শতবর্ষ বিরহে কাঁদে।

কৃষ্ণদাসীরা রাধা নয়, পুতনা। আর ওই মেয়ে মোহিনী? না, কৃষ্ণদাসীদের গর্ভে রাধা জন্মায় না। আজও সে স্বরূপ প্রকাশিত হয় নি, যখন হবে তখন হবে ছলনাময়ী, লাস্যময়ী। চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করেই ওর জীবনলীলার সার্থকতা। করুণা করেও ওদের দিকে ফিরে তাকিয়ো না সন্ন্যাসী। ওই তামসী মায়ায় মহাভারতের মহাযজ্ঞের চরু বিষাক্ত হয়ে গেছে।

এ মোহ থেকে মুক্ত কর, হে প্রভু, আমাকে এ মোহ থেকে মুক্ত কর।

—গুরু মহারাজ! বাইরের দরজা থেকে ডাকলেন কেশবানন্দ।

উত্তর দিলেন না মাধবানন্দ। কেশবানন্দ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আবার গলার সাড়া দিয়ে নিজের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলেন।

মাধবানন্দ এবার বুঝলেন, সংবাদ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি জপ রেখে প্রণাম করে বাইরে এলেন : কিছু বক্তব্য আছে বলে মনে হচ্ছে কেশবানন্দ।

—হ্যাঁ, গুরু মহারাজ, হাতেমপুরের হাতেম খাঁ ফৌত হল। হাফেজ খাঁ ফৌজদার হল।

—ওপারে কি তারই ঢেঁড়া পড়ছে?

—হ্যাঁ।

—এক রাজা বিগত হয়, অন্য জন রাজা হয়ে বসে। ওতে আমাদের কী আছে বল?

—আরও সংবাদ আছে গুরু মহারাজ। মুরশিদাবাদে নবাব সুজাউদ্দিন বীরভূমের রাজকর আদায়ের জন্য ফৌজ পাঠাচ্ছেন। রাজনগরের বাদিওজ্জমান খাঁ কয়েক বৎসর রাজকর বাকী ফেলেছেন। আমাদের আরও একটু সংগঠন প্রয়োজন গুরু মহারাজ।

—কী সংগঠন কেশবানন্দ? সংগঠন বলতে আমি তো বুঝি আত্মসংগঠন।

—না মহারাজ, আত্মসংগঠনের জন্য যখন আমরা সংঘের আশ্রয় নিয়েছি তখন সংঘসংগঠন না হলে আত্মসংগঠন কখনও সম্পূর্ণ হবে না। আপনি আমা অপেক্ষা বয়সে নবীন, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। কিন্তু আত্মজ্ঞান এবং সংসারজ্ঞানে কিছু প্রভেদ আছে। একটা আসে জন্মান্তরের পুণ্যে ভগবদ্‌-কৃপায়, অন্যটা আসে শুধু অভিজ্ঞতায়। সেই হিসেবে সংসারজ্ঞান আমার

আছে বলেই বলছি সংঘ-সংগঠন প্রয়োজন। আমি জানি, আপনি বাহুবলের শক্তিকে সুচক্ষে দেখেন না।

—তাই তো কেশবানন্দ!

চিন্তিত মুখে কেশবানন্দ কথা কয়েকটি বলে সম্মুখে বিরাট বনস্পতি-শীর্ষের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে এসেছে। তারই মধ্যে মসীকৃষ্ণ বর্ণে আঁকা ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে শালগাছটা। জীবনের প্রথম বিরাট স্বরূপ ওই বনস্পতি। যত আলোর দিকে সহস্র শাখা বিস্তার করে নিজেকে প্রসারিত করছে ঊর্ধ্বলোকে উঠছে, তত তার তলায় অন্ধকার ঘন হচ্ছে বিস্তৃত হচ্ছে। জীবনের তামসীর বিনাশ নাই। কেশবানন্দ তাঁর ধ্যান-ধারণা সাধনা-তপস্যা সত্ত্বেও কঠোর বাস্তববাদী। কেশবানন্দ বললেন, গুরু মহারাজ, এক মহর্ষি তাঁর পরমায়ু মাত্র কয়েক কোটি বর্ষ জেনে এবং অনন্ত কালের সঙ্গে তুলনায় কয়েক কোটি বর্ষকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর উপলব্ধি করে কোন কুটির নির্মাণ না করে মাত্র একটি গাছের পাতা মাথায় দিয়ে তপস্যায় বসেছিলেন। কিন্তু পাতাটির আয়ু নিশ্চয় কয়েক কোটি বর্ষ ছিল না। সুতরাং পাতাটিকে নিশ্চয় বারংবার বদল করেছিলেন। আমাদের সংঘ সেই পাতাই না হয় হল; কিন্তু সেটি যাতে ঝড়ে না ওড়ে, বর্ষায় না গলিত হয়, তার চেষ্টা তো করতেই হবে। ঝড় উঠছে গুরু মহারাজ। হিন্দুস্থানের আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ উঠছে। শুনছি, পারস্যে মহা অসুর তুল্য এক নাদিরশাহের অভ্যুদয় হয়েছে। সে নাকি হিন্দুস্থানের দিকে অভিযানে অগ্রসর হবে। মুঘলের কাল গত হতে চলেছে গুরু মহারাজ। নাদিরশাহের আঘাতে দিল্লির দরবার একান্ত ভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। দক্ষিণে মারাঠারা প্রবল হয়ে উঠেছে। ভবানীর বরপুত্র রামদাস-শিষ্য শিবাজী মহারাজার গড়া শক্তি আজ ভ্রষ্ট। এ সময়ে শুধু নিজের জন্য তপস্যা করতে চান—হিমালয়ে যান। যদি ধর্মকে রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করেন, তা হলে সক্রিয় হতে হবে। দিকে দিকে সন্ন্যাসীরা সক্রিয় হয়ে উঠছে। আপনি রাজেন্দ্র গিরি-মহারাজের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেখানেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা। আপনার মধ্যে জ্ঞান এবং তেজের সমাবেশ, সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে আপনাকে

অনুসরণ করেছি। নইলে আমি আসতাম না। আজও বলুন, যদি সংকল্পে আপনি দুর্বল হয়ে থাকেন বা তত্ত্বজ্ঞানে এ সংসারকে একটি বুদ্বুদই মনে করে থাকেন, তবে আমি স্থান ত্যাগ করি।—একটু স্তব্ধ থেকে আবার কেশবানন্দ বলেন, আজকের মত উদাসীন বলুন উদাসীন, দুর্বল বলুন দুর্বল—এ তো আমি কোনদিন দেখি নি। মার্জনা করবেন, মনে হচ্ছে আপনি বিচলিত।

মাধবানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কেশবানন্দ, সত্য গোপন আমি করি না। তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি বিচলিত হয়েছি আজ। ওই কয়ো আমাকে বলে গেল—আমার অভিশাপেই নাকি ইলামবাজারের সেই বৈষ্ণবী, যাকে আমরা বর্গীদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম, যে আমাদের জলসত্র নিয়ে গোলমাল করেছিল, সে পাগল হয়ে গেছে। অন্তত লোকে তাই বলছে।

কেশবানন্দ বললেন, আমি জানি কৃষ্ণদাসী পাগল হয়ে গেছে। আপনার দয়াই তারা ভিক্ষা করতে এসেছিল। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সংবাদ নিয়ে দেখেছি। আপনাকে দেখে তার পাপপঙ্ক থেকে মুক্তিকামনাই জেগেছিল। সেই কারণেই ছুটে এসেছিল। হতভাগিনীর জীবনে যা ঘটে গেছে তার উপায় তো আর নেই, উপায় খুঁজতে এসেছিল ওই মেয়েটার জন্য। মেয়েটি সত্যই বড় ভাল। ওর উপর লুব্ধ দৃষ্টি ওই বর্বর অক্রূরের! যদি বলেন—

চুপ করলেন কেশবানন্দ।

মাধবানন্দ বললেন, চুপ করলে কেন কেশবানন্দ?

—যদি বলেন তো ওই মা এবং মেয়েকে এপারে আমাদের সীমানার মধ্যে এনে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে দিই।

—না। দৃঢ়স্বরে মাধবানন্দ বলে উঠলেন, না। বিশ্বসংসারে পাপ এবং পুণ্য-প্রবৃত্তি দুইই একই শক্তির দুই বিরোধী রূপ। এ বিরোধের মধ্যে সন্ধির মধ্যপথ নেই কেশবানন্দ। পাপকে মরতেই হবে। তার পূর্ণ বিলুপ্তির মধ্যেই চৈতন্যস্বরূপের মহাপ্রকাশ সম্পূর্ণ হবে। আমাকে ভুল বুঝেছ কেশবানন্দ। তাদের প্রতি আমার কোন করুণা নেই। কিন্তু আমার ক্রোধ

আমার অভিশাপ হয়ে থাকলে আমার পক্ষে বেদনা অনুভব না করে উপায় কী বল? শেষে পিপীলিকা বধ করলাম!

বলতে বলতেই দুটি বিন্দু জল তাঁর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল মুছে বিষণ্ণ হেসে মাধবানন্দ আবার বললেন, সংসারে শুধু ন্যায়ে-অন্যায়ে পাপে-পুণ্যেই বিরোধ নয় কেশবানন্দ, ন্যায়ে-ন্যায়েও সংঘর্ষ বাধে। ন্যায়-বিচার আর করুণার সংঘর্ষে চোখে আমার জল এসেছে অনেকক্ষণ। সেই কারণেই এতক্ষণ প্রভুর সামনে বসে বলছিলাম—পথ বলে দাও।

কেশবানন্দ বললেন, ওদের কথা তা হলে থাক্ গুরু মহারাজ। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে যে পতঙ্গ পুড়ছে সে পুড়ুক। অখিল সংসারে মুহূর্তে কোটি কোটি প্রাণের লয়। তার মধ্যেই থাক্ ওরা। এখন যা বলছিলাম। আমার বলা শেষ হয় নি। সংবাদ আরও আছে। বাংলা দেশেও শান্তি আর থাকবে না। নবাব সুজাউদ্দিন বিলাস এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। উজীর হাজি মহম্মদ এই সুযোগে শক্তি সঞ্চয় করছে। পাটনায় হাজির ভাই আলিবর্দী ক্রমশ স্বাধীন চালে চলতে শুরু করেছে। সুজাউদ্দিনের দুই ছেলে—তকীউদ্দিন রাজকার্যে রাজনীতিতে পারঙ্গম; সরফরাজ—বিচিত্রচরিত্র।

মাধবানন্দ বললেন, জানি। হাজার-নারী-বেষ্টনীর মধ্যে দিন যাপন করে। তারা নাকি সখী! কোন সখীর মাথা ধরলে কোরাণ-মাথায় দুপহর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও অনেকে বলে সে সাধক।

ব্যঙ্গহাস্য করে মাধবানন্দ কথা শেষ করলেন।

—তকীর সঙ্গে সরফরাজের বিরোধ বাধিয়ে হাজি আহম্মদ অবিচার করে তকীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। মারণ-যাগ করেছিল, তকীর মৃত্যুতে হাজি প্রায় নিষ্কণ্টক। বাংলার আকাশেও ঘনঘটা উঠছে; দিগন্তে বিদ্যুচ্চমক বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহারাজ। আমাদের শক্তি সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। এবং—

—থামলে কেন, বল?

—আমি কিছুদিনের জন্য ঘুরে আসব।

—ঘুরে আসবে? কোথায়?

—গোকুল পর্যন্ত।

—গিরি মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাবে ?

—হ্যাঁ মহারাজ।

—তাঁর নির্দেশ ?

হেসে কেশবানন্দ বললেন, নির্দেশ একমাত্র আপনার হতে পারে। পরামর্শ-উপদেশের জন্য যাচ্ছি। কোনও চিন্তা আপনি করবেন না। আমি অন্য সকলকে, বিশেষ করে—

—তোমরা কি সকলে একই অভিপ্রায়ে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে কেশবানন্দ ?

কেশবানন্দ চুপ করে রইলেন।

—আমি বুঝতে পারি নি, তুমি আমার অনুমানের চেয়ে অনেক বেশী চতুর কেশবানন্দ।

একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, কিন্তু ও-খেলায় দেশ জাগবে না কেশবানন্দ, দেশের ধুলো উড়বে। হয়তো প্রচণ্ড ধুলোর বিরাট আবর্ত। মনে হবে মাটি বুঝি জেগে উঠে মাথা তুলে আকাশ ছুঁতে চলেছে, কিন্তু কয়েকদিন পরেই নেমে আসতে হবে আবার সেইখানে।

কেশবানন্দ তবু কোনও উত্তর দিলেন না।

—যাক ওসব কথা। কিন্তু গুরু যেখানে শিষ্যদের সাধনার মার্গ সম্পর্কে বিশ্বাস করাতে পারে না, সেখানে সে গুরু হিসাবে ব্যর্থ। আমি ব্যর্থ হয়েছি কেশবানন্দ। তোমরাই আমাকে মুক্তি দাও।

কেশবানন্দ এবার বললেন, আপনার শাস্ত্রবিচার-উপলব্ধিতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী গুরু মহারাজ। আমি মুগ্ধ হয়েই আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। হয়তো আপনিই নূতন উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছেন। আমি সেটা উপলব্ধি করতে পারছি না। আপনি যেদিন শিষ্য গ্রহণ করে মঠ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, সেই দিনই তো নিজের মুক্তি ছাড়া আরও মানুষের মুক্তি চেয়েছিলেন। বাংলা দেশে এই বৈষ্ণব ধর্মের বিকৃত পরকীয়া-সাধনের গতিরোধ করতেই তো এখানে এসে আশ্রম তৈরি করতে আরম্ভ করেছেন। এখন রাজনৈতিক দুর্যোগ যদি ঘনিয়ে আসে, আসে কেন—আসছে গুরু মহারাজ, তা হলে যে জীবনের সর্বত্র তার আঘাত এসে লাগবে। আত্মরক্ষা

প্রথম ধর্ম। অরাজকতা বিশৃঙ্খলার মধ্যে রাজা যে হবে—সে যত দিনের জন্যই হোক, লোক শোষণ করতে শুরু করবে। দস্যুতার প্রাদুর্ভাব হবে। দুঃসাহসীরা দস্যুতার সাহায্য নিয়ে রাজা হতে চাইবে। ব্যাভিচারীর উৎপাত হবে। এখানে অভ্যুদয় হবে ওই বর্বর অক্রূর দাস-সরকারের।

অরাজকতার মধ্যে অত্যাচারীর অভ্যুদয় হয়—অত্যাচারের মধ্যে তাঁর অভ্যুদয় ঘটে মানুষের বুকে কেশবানন্দ। আমি তো তাই চেয়েছিলাম মানুষকে জাগাতে। মানুষকে চালাতে নয়। তুমি বহুকাল রাজকর্ম করেছ। তুমি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অতি সংযতবাক্, কিন্তু তার মধ্যে থেকেও তোমার গোপন উদ্দেশ্য অন্ধকারে শ্বাপদ-দৃষ্টির অগ্নিচ্ছটার মত চকিতপ্রকাশে দেখা দিচ্ছে। রাজেন্দর গিরি মহারাজের কাছে যাবে বলছ। আমিও তার সঙ্গে আলাপ করেছি। বল তো তিনি সন্ন্যাসধর্মে কি আজও স্থির আছেন? অথবা ভ্রষ্ট হয়েছেন? অর্থ দিয়ে অযোধ্যার নবাব ডাকছে। তিনি তার হয়ে যুদ্ধ করতে ছুটছেন, তার অর্ধেক অর্থ দিয়ে ডাকছে দিল্লির উজির—তিনি নবাবকে ছেড়ে ছুটছেন তার হয়ে লড়াই করতে। সাবধান কেশবানন্দ, সাবধান। সন্ন্যাসীর হাতে রাজদণ্ড এলে সন্ন্যাসের অপমৃত্যু এবং গৃহীর অকল্যাণ। ভেবে দেখো কেশবানন্দ, তারপর ঝাঁপ দিয়ো। ওতে ঝাঁপ দিলে আর ফেরা যায় না। কয়েকদিন চিন্তা করে আমাকে উত্তর দিয়ো, গোকুলে যাবার দিন স্থির কোরো।

বলে আর দাঁড়ালেন না। কথা বাড়াতে চাইলেন না বোধ করি। আবার ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।—হে যাদবোত্তম, হে পুরুষোত্তম, হে কংসারি, পথ দেখাও। স্থির রাখো আমাকে।

*   *   *

কেশবানন্দ কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন। শ্যামরূপার গড় জঙ্গলে রাত্রি নেমেছে। আষাঢ়ের শুক্লা-তৃতীয়ার চাঁদ অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। তার উপর আকাশে মেঘ। অন্ধকার যেন সূচীভেদ্য। অরণ্যময় শুধু লক্ষ কোটি পতঙ্গের একটানা আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে চলেছে, এ ধ্বনিবৈচিত্র্য না-শুনলে বুঝা যায় না। জলপ্রপাতের শব্দ যেমন অবিরাম—একসুরে বাঁধা, এ ধ্বনিও তেমনি। তবে এতে একটি

সঙ্গীতের রেশ আছে। এ ধ্বনি যে জড়প্রকৃতির ধ্বনি নয়, জীবনপ্রকৃতির ধ্বনি। এ ধ্বনি তো শুধু বস্তুর সংঘাতে উৎপন্ন নয়, এ ধ্বনির মধ্যে জীবনের অভিপ্রায়ের প্রকাশ আছে। কিন্তু কেশবানন্দের চিত্ত এই দিকে আকৃষ্ট হবার নয়। তাঁর চিত্ত আপন লক্ষ্যে, আপন সংকল্পে অধিষ্ঠিত। তিনি ডাকলেন, শ্যামানন্দ!

অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন শ্যামানন্দ।—আমি আপনার অপেক্ষাতেই এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি।

কেশবানন্দ বললেন, শুনলে সব?

—শুনেছি বইকি। আপনি কি—

—না। আমার সংকল্পে আমি স্থির আছি। এই বিধর্মীর রাজত্ব ধ্বংসের এত বড় সুযোগ গেলে আর আসবে না। যারা আমার সর্বনাশ করেছে তাদের সর্বনাশ আমি করব। ঘর গেছে, সংসার গেছে—আমার সব গেছে এদের হাতে। সন্ন্যাস নিতে গিয়েছিলাম সাময়িক বৈরাগ্যের বশে, সন্ন্যাসে শান্তি পাই নি। প্রতিহিংসার কামনা আমার বুকে জ্বলছে। তারই তাড়নায় এই সংকল্প নিয়ে ফিরে মঠে মঠে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু মনের মত স্থান পাই নি। হঠাৎ এঁকে দেখে—। থাক্ সে সব কথা শ্যামানন্দ, ভুল আমার হয়েছে। কিন্তু পরিশ্রম পণ্ড হয় নি। প্রয়োজন হলে সব আয়োজন নিয়ে একদিনে চলে যাব এখান থেকে। কিন্তু মুরশিদাবাদের লোক এখনও এল না কেন? আসা তো উচিত ছিল। সুজাউদ্দীনের বীরভূম-অভিযানের সংকল্পের কথা সে তো আজ সাত দিন পূর্বের সংবাদ। এর পরের লোক এখনও এল না কেন?

কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে বললেন, কাল তুমি কাউকে ইলামবাজারে পাঠিয়ে ওই কৌয়া বৈরেগী বলে উন্মত্ত লোকটাকে এখানে আনবার ব্যবস্থা করতে পার?

—তাকে নিয়ে কী হবে?

—প্রয়োজন আছে। আমরা মুরশিদাবাদে মোক্তার রেখেছি। গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য চর রেখেছি। কিন্তু ঘরের দোরে—নদীর ওপারে কোন সংগঠন করতে পারি নি। এ লোকটাকে একটু চতুর করে তুলতে পারলে

এর চেয়ে ভাল গুপ্তচর আর হবে না। আমাদের প্রাচীনকালে ভিক্ষুক শ্রমণ নটী বাজিকরের ছদ্মবেশে গুপ্তচরেরা সংবাদ সংগ্রহ করত। এ লোকটা স্বভাবে ভিক্ষুক, এবং লক্ষ্য করেছি সংবাদ-সংগ্রহেও এর একটা আশ্চর্য রকম নিপুণতা আছে এবং আশ্চর্য রকমে লোকটা চুপ করে থাকতে পারে। কোন কিছু শুনেই ওর মুখভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। লোকটাকে কাল একবার হাতেমপুরে পাঠাব আমি। ভোরবেলা কাউকে পাঠিয়ে দেবে। অবশ্যই বুঝতে পারছ আমাদের আশ্রমের কোন সেবককে নয়, কারণ ওই বর্বর অক্রূরের অনুচরের সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে। গ্রামের কাউকে পাঠিয়ে দেবে।

একটা নিশাচর পাখি প্রহর ঘোষণা করে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক পাখি সাড়া দিলে। অজয়ের তটপ্রান্ত থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। নিঃশব্দ বনভূমির মধ্যেও যেন একটা চাঞ্চল্য বয়ে গেল।

কেশবানন্দ বললেন, রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে। আজকের মত বিশ্রাম কর।

উঠানে নামলেন তিনি। মৃদু অথচ গম্ভীর কণ্ঠে আবেগময় শ্লোক আবৃত্তি করছেন মাধবানন্দ। কেশবানন্দ হাসলেন। পরক্ষণেই চোখ জ্বলে উঠল তাঁর। মন প্রকৃতিধর্মে আকাশবিহারী। কিন্তু মন যখন ভুলে যায় যে, তার মনকে বহন করছে যে বস্তুময় দেহ, সে দেহ দাঁড়িয়ে আছে মাটির উপর, তখনই মন মাটির কথা ভুলে গিয়ে আকাশ-বিহারে ওড়ে—সে ওড়ায় নিঃশেষিত করে নিজেকে। তারপর ক্লান্ত নিঃশেষিতশক্তি পাখা দুটি আপনি একসময় ভগ্নপক্ষের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, আছাড় খেয়ে এসে পড়ে সে সেই মাটির উপর; মহাপ্রকৃতি ব্যঙ্গ হাসি হাসেন—ভগ্নপক্ষ পাখির দেহের মধ্যে তার আকাশবিহারী মন অসহায় ভাবে কাঁদে।

তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে।

ওটা কী?

মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রের বনভূমির মাথায় একটা উদ্যত শূলের মত ওটা কী?

পরক্ষণেই একটা রাত্রিচর পাখি কর্কশ কণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করে পাখা

ঝাপটে এসে শূলটার উপর বসে ডাকতে লাগল—ক্যা—চ। ক্যাচ—ক্যা—চ। ওঃ! ওটা ইছাই ঘোষের দেউলের চূড়াটা! গভীর চিন্তামগ্নতার মধ্যে এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি মন্দিরটিকেই ভুলে গিয়েছিলেন।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় কয়োকে নিয়ে লোক ফিরল। ভোরবেলা গিয়েও লোকটি কয়োকে পায় নি। তার আগেই সে বেরিয়ে গিয়েছিল তার অভ্যাসমত। অন্ধকার থাকতেই কাকে বাসা ছাড়ে, কয়োও তাদের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বের হয়। ঘর তার নেই। কয়ো বলে—আমি কয়ো, বাসা বাঁধি না। ডালে রাত কাটাই গো। অর্থাৎ পরের ঘরের দাওয়ায় কিংবা ছাঁচতলায় শুয়ে পড়ে রাতটা কাটিয়ে দেয়। ইলামবাজারে মা-জীর আখড়ার আনাচে-কানাচেই কাটে। মা-জীর এই রোগ বা সিদ্ধাই যাই হোক। তারপর থেকে সে আখড়ার ভিতরেই থাকে। থাকে মোহিনীর জন্যে। সন্ধ্যা হয়ে আসে আর মোহিনীর মুখ শুকিয়ে যায়। সামনে চার-প্রহর রাত্রি। মোহিনী বলে, কেমন করে কাটবে কয়ো?

কয়ো বলে, কাটবে, ঘুমিয়ে গেলে। তুই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়্। সকালবেলা কা-কা করে তোকে ডেকে তবে আমি বেরুব। আমি রইলাম। আর না যদি ঘুমোস তবে চার-পহর রাত মনে হবে জীবনে আর পোয়াবে না। তোর কোনও ভয় নাই।

—রাতে যদি ছোট সরকারের দানোরা আসে?

—আসবে না। তাদের পরাণের ডর আছে। লোকে জানে মা-জী ডাকিনী সিদ্ধাই পেয়েছে। রাত্রে মা-জীর বাট বয়। বাট বওয়া দেখলে তৎক্ষণাৎ মিত্যু।

এবার তার হাত দুটো চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে মোহিনী বলে, আমি যদি দেখে ফেলি কয়ো?

—ঘুমুবি যখন, তখন দেখবি কী করে? আমি তোর মাথায় হাত বুলিয়ে ঠিক ঘুম পাড়িয়ে দোব।

—যদি ঘুম ভেঙে যায়?

—উঠবি না, চোখ খুলবি না, কিটিমিটি করে চোখ বুজে পড়ে থাকবি!

—ওরে, তা যে পারি না রে, মা কী করছে না দেখে যে থির থাকতে পারি না রে। আমি যে সব ভুলে যাই।

—তা হলে তু দেখেছিস?

—হ্যাঁ।

—তবে আবার কী? দেখেও তো তু মরিস নাই? তবে তোর ভয় কী? একটু চুপ করে থেকে এবার কয়ো তাকে বুঝিয়ে বলে, এ মা-জীর সিদ্ধাই নয় মোহিনী; এ তোর মায়ের ব্যাধি। মায়ের তোর মাথা খারাপ হয়েছে। মা-জী ক্ষেপেছে। মোহিনী, এ তোর মায়ের—ওই সিদ্ধপুরুষ নবীন সন্ন্যাসীর কাছে অপরাধের ফল।

মোহিনীর চোখের সামনে পুরনো ঘটনাগুলি ভেসে ওঠে। সে হতাশায় বেদনায় আকুল হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘটনার পর ঘটনা তার চোখের সামনে ছবির পর ছবির মত ভেসে যায়। সে সঠিক বুঝতে পারে না অপরাধটা কোথায়? কিন্তু অপরাধ যে হয়েছে তাতে তার সন্দেহ থাকে না।

হঠাৎ সে বলে, কয়ো, আমাকে তুই নিয়ে চল্।

—কোথা?

—ওই নবীন সন্ন্যাসীর দরবারে। আমি তাঁর পা দুটো চেপে ধরে মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে বলব—ঠাকুর, দয়া কর, ক্ষমা কর।

শিউরে উঠে কয়ো বলে, খবরদার মোহিনী। মা তোর ক্ষেপেছে, তুই হয়তো মরেই যাবি।

—কেনে কয়ো?

—ওরে, আগুন—নবীন সন্ন্যাসী জলন্ত আগুন, ওর দিকে হাত বাড়ালে হাত পুড়ে যায়। তোদের ছুঁতে নাই, সামনে যেতে নাই, কখনও যাস নে। তোর মায়ের অপরাধ তো সেইখানে।

অবাক হয়ে যায় মোহিনী। অপরাধ সেইখানে! সে বুঝতে পারে না।

—কেনে কয়ো? তাতে কী অপরাধ? কই, কোন দেবতা তো তাতে

রাগ করেন না রে। দেবতা দূরের কথা, সব দেবতার সার যিনি, যিনি ভগবান গোবিন্দ, মদনমোহন শ্যাম তিনি যে ভক্তাধীন রে! বৃন্দাবনে—রাধার—

—চুপ কর্ মোহিনী। ওসব ভুলে যা। নবীন সন্ন্যাসীর যত রাগ রাধার উপর। ওর সাধন-ভজন সব হল, যেখানে যত রাধা আছে সব বেসজ্জন দেবে। খবরদার, ওর পা ছুঁতে যাস না। ছামনে যাস না। তোর মা পাগল হয়ে গেল, তু হয়তো পাথর হয়ে যাবি।

শিউরে উঠেছিল মোহিনী। ভয় আতঙ্কে বোবার মত শুধু দৃষ্টি বিস্ফারিত করে সামনের দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু সে দৃষ্টির সম্মুখে পৃথিবীর কোনও কিছুই ছিল না। ছিল অন্ধকার, একটা কালো পর্দা যেন চোখের সামনে সমস্ত কিছুকে ঢেকে টেনে দিয়েছে কেউ।

সেদিন অর্থাৎ রথের দিনই রাত্রিবেলায় এই কথাগুলি হয়েছিল। রাত্রে মোহিনীও ঘুমোও নি—কয়োও না। মোহিনী ভেবেছিল নবীন সন্ন্যাসীর কথা।—এমন মানুষ- এমন পাষাণ কেন? পাষাণ নয়, এমন আগুনের মত জ্বলে কেন? মানুষ যদি আগুনের মত জ্বলে, তবে অপর মানুষ তার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে কেমন করে? শ্যাম তো শুনেছে—নবজলধর। সে জল দেয়, ছায়া দেয়। পাপী তাপী সবারই তৃষ্ণা নিবারণ হয়—তাপিত অঙ্গ শীতল হয়। শ্যাম নবজলধর বলেই তো তার নামে শুষ্কতরু মুঞ্জরে—মরাগাছ বেঁচে ওঠে, পাতা গজায়, ফুল ফোটে। শ্যাম যদি আগুন হত তবে সব যে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। হায় নবীন গোঁসাই, তুমি এমন আগুনের মত জ্বলন্ত কেন?

কয়ো সারারাত ঘুমোয় নি—মোহিনী এবং মা-জীর জন্য দুর্ভাবনায়।

মা-জীর জন্যে দুর্ভাবনা শেষ হবে কবে এবং কী ভাবে? কৃষ্ণদাসী তখন অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় আখড়ার উঠানময় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মধ্যে মধ্যে এক-একবার হা-হা করে কেঁদে আছড়ে পড়ছিল। আবার কিছুক্ষণ পর উঠে ঠাকুর-ঘরের মধ্যে ঢুকে বিগ্রহের পা দুটি ধরে পড়ছিল। আবার বেরিয়ে এসে পরিক্রমা শুরু করছিল; অবিশ্রান্ত পরিক্রমা। এ কৃষ্ণদাসীর নিত্যকর্ম। এর জন্য অবশ্য ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু কৃষ্ণদাসী যদি কোনদিন বিগ্রহ টেনে এনে আছড়ে ফেলে? তারও একটি শঙ্কা কয়োর আছে।

সেই আশঙ্কাই তার সব চেয়ে বড় আশঙ্কা। মধ্যে মধ্যে মা-জীর চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা যেন কী দেখতে পায়। তার ভয় হয়। তার ধারণা এই দৃষ্টিতে মা-জী যখন তাকায়, তখন তার মনের মধ্যে খুন খেলা করে। মনে হয়, হয় মা-জী মারণ-যাগ করে নবীন সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলবার কথা ভাবছে, নয় ভাবছে বর্বর অক্রূরকে 'বাণ' মেরে শেষ করবার কথা, নয় ভাবছে মোহিনীকে মেরে ফেলবার কথা। মোহিনীকে মারতে যাগ করতে হবে না, 'বাণ' মারতে হবে না, গলা টিপে ধরলেই হবে। মধ্যে মধ্যে আখড়ার মধ্যে ছাগলের বাচ্চা ঢুকে পড়ে চিৎকার করে, মা-জী তাড়া করে ছুটে যায়, ধরতে পারলে গলা টিপে ধরে আখড়ার দরজা দিয়ে বের করে পথে আছড়ে ফেলে দেয়। কখনও কখনও আছাড় মেরে ফেলে দেওয়ার পর নিজের গলাটা টিপে ধরে। কোনদিন মোহিনীকে গলা টিপে মেরে ফেলে যদি নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরে!

মা-জী অবশ্য মরলেই ভাল। খালাস। সেও খালাস পাবে, সংসারও পাবে। কিন্তু মোহিনীকে তো মারতে দিতে সে পারবে না।

গতরাত্রে ঘরের ছাঁচতলায় বসে ঢুলছিল কয়ো। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার একটা শব্দে। হঠাৎ সশব্দে যেন আখড়ার বাইরের দরজাটা খুলে গিয়েছিল। চমকে উঠেছিল কয়ো। কে? কে? আখড়ার খোলা দরজাটার ওপারে কে যেন বেরিয়ে গেল! কে? কয়ো ধড়মড় করে উঠে চারিদিক দেখেছিল। আঁধারের শুক্লা-দ্বিতীয়ার অন্ধকার রাত্রি। আকাশে মেঘ। তবুও অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখের সামনে আখড়ার উঠানটা প্রায় স্পষ্ট হয়েই ভেসে উঠেছিল। কই, মা-জী কই? ছুটে গিয়েছিল দেবতার ঘরের দিকে। সেখানেও মা-জীকে পায় নি। এবার সে ছুটে খোলা দুয়ার অতিক্রম করে পথের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল।

চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল—মা-জী! ঠিক সেই মুহূর্তেই কৃষ্ণদাসীর খিল-খিল হাসির শব্দ শুনে ডাকা আর হয় নি, ছুটে এগিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভয়ঙ্করই বটে! কৃষ্ণদাসী কাপড় ছেড়ে ফেলে দিয়ে উলঙ্গিনী হয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে—হি-হি-হি! হি-হি-হি—হি-হি-হি! হি-হি! আর মধ্যে মধ্যে বলছে—মর্ মর্, মুখ দিয়ে রক্ত তুলে

মর্। ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মর্। গল্ গল্ করে বেরুক রক্ত। হি-হি-হি-হি-হি! আর তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা লোক থর থর করে কাঁপছে। তাকে চিনতে কয়োর দেরি হল না। সে অক্রূরের অনুচর। কেলের শাগরেদ। একেবারে কাঁচা জোয়ান। কেলের চেয়েও দুঃসাহসী। কেলে মা-জীর ডাকিনী-মন্ত্রের ভয়ে আখড়ায় উঁকি মারতে আসে না। এই দুঃসাহসী কাঁচা জোয়ানটা কেলের উপরে নিজের আসন করে নেবার দুরাকাঙ্ক্ষায় বোধ করি রাত্রে এসে উঁকি মেরেছিল। মা-জী বুঝতে পেরে বেরিয়ে এসেছে। অথবা হয়তো আকস্মিক ভাবেই ঘটনাটা ঘটে গেছে। মুহূর্তে কয়ো মা-জীর পরিত্যক্ত কাপড়খানা কুড়িয়ে মা-জীর দেহের উপর কোন মতে জড়িয়ে দিয়ে মা-জীর সামনে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল—মা-জী! মা-জী! মা-জী!

সেই মুহূর্তে পিছন থেকে অন্ধকার চিরে আর-একটি আর্ত করুণ কণ্ঠস্বরের ডাক ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল—মা-গো! মা—

মা-জী চেতনা হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল।

পিছনের লোকটা এই অবসরে ছুটে পালিয়েছিল।

মোহিনীকে নিয়ে কোন রকমে টেনে হিঁচড়ে মা-জীকে আখড়ায় এনেছিল, জ্ঞানও হয়েছে। মা-জী কিন্তু যেন তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। সব শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

কয়ো মা-জীর এ অবস্থার জন্য চিন্তিত হয় নি। কইমাছের পরানের মত শক্ত মা-জীর পরান, ও সহজে যাবার নয়, যাবে না। গেলেও খালাস পাবে। কিন্তু চিন্তিত হয়েছে মোহিনীর জন্যে। বর্বর অক্রূরের ওই কাঁচা জোয়ান প্রেত অনুচরটা তো পালিয়েছে, সে যখন ওই মূর্তি দেখেও মরে নি—যখন সামলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে পেরেছে তখন তো মরবে না। তার মানে, সর্বনাশ। প্রেতের যখন ভয় ভেঙেছে তখন তো আর মোহিনীর পরিত্রাণ নেই। এই বর্বরগুলো যখন ভয় করে তখন সে ভয় মারাত্মক, কিন্তু ভয় ভাঙলে এরা হয়ে ওঠে আরও মারাত্মক। তাই ভোরবেলা, কাক-কোকিল বাসা ছাড়বার আগেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। ফিরেছে অপরাহ্ণে। ফেরার পর আশ্রমের লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে।

কেশবানন্দ তার জন্য চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়ো অবাক হয়ে গেল। যেন খানিকটা সন্দেহ হল তার। চতুর কেশবানন্দের তা বুঝতে ভুল হল না। এ সন্দেহ যে কয়োর হতে পারে—এ অনুমান আগে থেকেই তাঁর ছিল। তবুও এই ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি এই ভেবে যে, সন্দেহ ঘুচিয়ে দিতে পারলে এর ফলাফল অব্যর্থ। কেশবানন্দ কয়োর সন্দিগ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি স্থির রেখে হেসে বললেন, গুরু মহারাজের এই আদেশ।

তারপর বললেন, তাঁর ধারণা দামোদরের ক্ষুধার কিছুটা তোমার উদরে বাসা গেড়েছে। মানুষের ক্ষুধা কিছুটা পেলেই মেটে। দামোদরের ক্ষুধা পেট পুরে খেয়েও মেটে না। তাই বললেন, ওকে কাল ক্ষুধা মিটিয়ে খাওয়াও তো। ব'স তুমি।

কথাগুলি কয়োর ভালই লাগল। বেশ ভাল ভাল কথা। আর অকাট্য। তার ক্ষিদে এবং পেটের ফাঁদে আর দামোদর নদের ক্ষিদে আর পেটের ফাঁদের সঙ্গে সত্যিই মিল আছে। এ কথা, এ সত্য সিদ্ধপুরুষ বলেই গোসাঁই বুঝেছে। কিন্তু তবু সে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। মাথা চুলকতে লাগল। হে ভগবান, এ কী বিপদে ফেললে!

কেশবানন্দ বললেন, ব'স, ব'স। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

হাত জোড় করে কয়ো বললে, আমাকে পরীক্ষা করছ গোসাঁই?

—না না, পরীক্ষা কিসের? ব'স তুমি। এর মধ্যে কোন পরীক্ষা নেই।

—তবে গোসাঁই, খেয়ে যে কয়োর কখনও পেট ফাঁপে না—তার পেট নাগরার মত ঢং ঢং করে বাজনা দেয় কেনে? গলায় গলায় অম্বল কেনে? কী গরম-মসলার গরমে বুক গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে! পরানটা শুধু জল জল করে সারা হল।

—গরম-মসলা? গরম-মসলা দেওয়া খাবার কোথায় খেলি?

—হাতেমপুরে। ফৌজদার-বাড়িতে। সেখানে গিয়েছিলাম আজ।

—হাতেমপুরে? ফৌজদার-বাড়িতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, সের দুই তিন হালু আর ম্যাও; সেও সের ট্যাক হবে। পেট ফেঁপে উঠেছে। আইঢাই করছে।

—তুই মুসলমান-ঘরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে এলি ?

—উচ্ছিষ্ট লয় গো। আদর করে ব্যাগম সাহেব পাতা পেড়ে খাওয়ালে। তার হারানো নীল হীরেটা আমি নিয়ে গিয়েছিলাম তো! ফোজদার তো দেখে 'বিস্‌মিল্লা ইয়ে আল্লা' বলে পেরায় নাপিয়ে উঠল। বলে—তোর মাফিক সাচ্চা আদমী নেহি দেখতে পাতা হ্যায়। বলে—কী বসকিস্ লিবি? টাকা লে—মোহর লে—জমি লে। আমি বলি—না। বসকিস্-টসকিস্ আমি চাই না। আপনি একটা উপকার করেন। আপনি ফোজদার, এ মুলুকের দণ্ডমুণ্ডুর মালিক। এক বদমাসের অত্যেচার থেকে একটি অনাথা বালিকাকে রক্ষে করেন। সেই মোহিনী বলে মেয়েটা গো। এবার আর তার অক্রুরের হাত থেকে নিস্কিতি নাই। মা-জীর ডাকিনী-মন্তর সিদ্ধাই এ-সব কথার কথা, বাজে কথা, তা জানাজানি হয়ে গিয়েছে। নবীন গোসাঁই সিদ্ধপুরুষ, উনিই আমাকে কাল বলেছিল—তু যা কয়ো, ফোজদার হাফেজ খাঁর কাছে যা, কায্যসিদ্ধি হবে। এই নীল হীরেটা তুই কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে রাখতে দিয়েছিস, এটা তাদেরই, এটা নিয়ে যা; দেখাবি; দেখালেই কায্য-সিদ্ধি হবে। তা হয়ে যাবে। ঠিক হবে।...এক ঘটি জল খাব।

কয়োর বুক আবার শুকিয়ে উঠেছে।

কেশবানন্দ শ্যামানন্দকে বললেন, খানিকটা হজমী দাও জলের সঙ্গে; আকণ্ঠ পুরে পেটুকটা হালুয়া আর মেওয়া ফল খেয়েছে।

হাল্লু আর ম্যাও যে হালুয়া আর মেওয়া, এ বুঝতে কেশবানন্দের কষ্ট হয় নি।

কয়ো বললে, করব কী বলেন? ফোজদার হীরেটা নিয়ে ভেতরে গিয়ে হুকুম করলে—নিয়ে আয় ব্যাটা বোরেগী ভিখেরীকে। ব্যাগম দেখবে তাকে, আর নিজে দাঁড়িয়ে খাওয়াবে। আর তারই কাছে বলতে হবে ওই মোহিনীর কথা। মেয়েছেলের কথা যে! আর লবাবী ফোজদারী অন্দর যে! যা করবার ব্যাগম করবে। তা—

শ্যামানন্দ এক ঘটি জল আর একটি হজমী বটিকা নিয়ে এসে দাঁড়াল। কয়ো ব্যগ্র ভাবে অঞ্জলি পাতলে: দাও।

—আগে এই বড়িটা গলায় ফেলে নে।

কয়ো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, পরানটা আইঢাই করছে আর তেষ্টা পাচ্ছে—নইলে ঘি-গরমমসলার খুশবুইটা বড় ভাল উঠছে গোসাঁই। না-হলে তো এতক্ষণ কোন্‌কালে কয়ো গলায় আঙুল দিয়ে সব উগরে দিয়ে খালাস হত। হজম হলে তো খুশবুইটাও আর উঠবে না।

কয়োর দৃষ্টি করুণ হয়ে উঠল। পরক্ষণেই বললে, না, দাও। এগুলো খেতে হবে তো। দাও।

বড়ি এবং জল খেয়ে গোটা দুই বড় ঢেকুর তুলে বললে, বুঝেছেন গোসাঁই, এ ফোজদার আর সব আমীর কি শ্যাখ জমিদারদের মত নয় গো। ওই এক ব্যাগম নিয়েই ঘর সংসার। ব্যাগমের পেতাপ খুব। দুজনার মধ্যে খুব ভালবাসা। বললে—আমিনা পেয়ারী, এই এর কাছেই শোন সে মেয়ের কথা। শুনে যা করবার কর।

কেশবানন্দ চমকে উঠলেন। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল তাঁর। বললেন, কী? কী বলে ডাকলেন ফৌজদার? আমিনা?

—হ্যাঁ। আমিনা পেয়ারী।

আমিনা! আমিনা! মথুরার ঘাটে বাদশাহ-বংশের এক ব্যভিচারী সন্তানের কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল কেশবানন্দের। আমিনা! সে হারানো মেয়ের নামও আমিনা। ওসমান নামক এক ওমরাহপুত্রের সঙ্গে পালিয়েছে।

কয়ো বললে, তা ব্যাগমও লোক ভাল। আমাকে হাল্লু-ম্যাও খেতে দিয়ে বললে—তু খা, হামলোক সমঝ করে দেখি। খুব খুবসুরত লেড়কী? আমি বললাম—ঝুট বলব না; খুবসুরত বটে ব্যাগম সাহেব। তবে সে কি আপনকাদের মতন? এমন রঙ কোথা পাবে? রূপের ত্যাজ কোথা পাবে? এই দ্যাশের লেড়কী তো, সদ্য পাক-ধরা ধানের মতন, মানে গোরো রঙ হলেও সবুজ সবুজ আভা, এই আর কী! আর বড়া ঠাণ্ডা! তেমনি নরম। কথা বলতে বলতে কয়ো পর পর গোটা চারেক বড় বড় উদ্‌গার তুললে—হেউ—হে—উ হে—উ—হেউ।

কেশবানন্দ বললেন, তারপর?

কয়ো হাত বাড়িয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, আঃ, বাঁচালে বাবা

গোসাঁই। আঃ! সব হেঁটিয়ে গেল চার ঢেকুরে। আঃ, আর দুটো ঢেকুর উঠলে তো পেটের নাড়িভুঁড়ি হজম হয়ে যাবে গোসাঁই।

—খাবার তো প্রস্তুত রয়েছে রে; ভোজনে বসে যা। খা আর বল্, তারপর কী হল? অক্রূরের হাত থেকে রক্ষা করবে কথা দিলে? অক্রূরের সঙ্গে তো হাতেম খাঁয়ের খুব দহরম মহরম ছিল রে! না, ফৌজদারের অন্দরে ঢোকবার ব্যবস্থা করে এলি?

—কথা শেষ হল না গোসাঁই। ফৌজদার চলে গিয়েছিল তো, আবার হন্তদন্ত হয়ে চলে এল। কী সব বললে ব্যাগমকে, ব্যাগমও খুব তরস্ত হয়ে উঠে চলে গেলেন। লোকজনে বললে—খেয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যা রে বোরেগী। জলদি ভাগ্, লগরী (রাজনগর) থেকে ঘোড়স'র এসেছে। ভাগ্—ভাগ্। এখন উসব শুনবার সময় নাই।

কেশবানন্দ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামানন্দের দিকে তাকালেন। শ্যামানন্দ সে দৃষ্টির অর্থ অনুমান করলেন। নবাবী ফৌজ মুরশিদাবাদ থেকে রওনা হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিক্রান্ত হওয়ার ঘোষণা দিকে দিকে ধ্বনিত হয়ে উঠল। শিবারা ধ্বনি তুলে বনময় ডেকে উঠল; বাদুড়েরা পাখা মেলে উড়ল; গাছের কোটরে—ডালে ডালে প্যাঁচারা ডাকতে শুরু করলে। এই ধ্বনির প্রতিক্রিয়ায় সচকিত হয়ে অহরহ জাগ্রত পতঙ্গেরা চঞ্চল হয়ে উঠল; তাদের ধ্বনি বারেকের জন্য উচ্চ হয়ে উঠল। করোও সচকিত হয়ে উঠল।—গোসাঁই!

—কী হল? চমকে উঠলি যে? প্রহর রাত হল, সেই জন্য শিয়াল ডাকছে।

—হ্যাঁ গোসাঁই, আমার যে বড্ড দেরি হয়ে গেল গো! মোহিনী যে একা আছে। মা-জী যে থেকেও না-থাকা। আমি যাই গোসাঁই—

—খেয়ে নে, কতক্ষণ লাগবে?

—আমি খেতে খেতে যাব। সে তার ময়লা গামছাখানা বিছিয়ে পাতাসুদ্ধ খাবার তার উপর চাপিয়ে বেঁধে নিয়ে ঢিপ করে একটি প্রণাম করে বললে, আমি চললাম গোসাঁই।

কেশবানন্দ বললেন, কাল একবার আসবি। প্রয়োজন আছে।

কয়ো চলে গেল। কেশবানন্দ খুশী মনেই এগিয়ে চললেন। যে সংবাদ চাচ্ছিলেন তা পেয়েছেন। আশ্চর্যভাবে কয়ো জেনেছে এবং দিয়ে গেল। কয়োকে একটু তালিম দিতে পারলে ওর দ্বারা অসাধ্যসাধন করা যাবে।

—কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

—আমি কেশবানন্দ।

—গুরু মহারাজ? এমন করে—? প্রশ্ন করতে গিয়েও করতে পারলেন না কেশবানন্দ।

মাধবানন্দ বললেন, ভাবছি কেশবানন্দ। কালের পদধ্বনি শোনবার, সেই ধ্বনিতরঙ্গ অনুভব করবার শক্তি বোধ হয় জীব-জগতের জন্মগত। নইলে প্যাঁচা শেয়াল এরা ঠিক প্রহরে প্রহরে কী করে ডেকে ওঠে? আমরা মানুষ। ওদের থেকে অনেক জন্ম এগিয়ে আছি। আমাদের পক্ষে বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের কোন এক প্রহরের ক্রান্তি-মুহূর্ত অনুভব করা তো অসম্ভব নয় কেশবানন্দ। আমি যেন অনুভব করছি, চোখের উপর কতকগুলো ঘটনা যেন অকস্মাৎ ঘটে গেল আমার। ঠিক ধরতে পারছি না, কিন্তু—

কেশবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে মাধবানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আপনার শরীর বোধ করি সুস্থ নয় গুরু মহারাজ, চলুন, বিশ্রাম করবেন চলুন।

—বিশ্রাম! বিশ্রাম নিতে পারছি না কেশবানন্দ। একটা কী যেন আমাকে অস্থির করে রেখেছে অহরহ। নিদ্রাকে, বিশ্রামকে শাসন করে দূরে রেখেছে।

ধীর পদক্ষেপে তিনি ফিরলেন গোবিন্দের ঘরের দিকে।

॥ দশম পরিচ্ছেদ ॥

মাধবানন্দ ধ্যানে বসেছিলেন।

তাঁর ধ্যানের মধ্যে তিনি ভগবানের 'কংসারি'-রূপটি মনের মধ্যে রূপায়িত করে প্রার্থনা করেন—"এই রূপে তুমি প্রকট হও সর্বলোকের অন্তরে। পাপকে তুমি নাশ কর। ব্রজলীলার ধূলার খেলা সাঙ্গ করে রথে আরোহণ কর; দেহধারী মানব-মানবীর স্নেহ-মমতা-রাগ-অনুরাগময় পার্থিব চেতনাকে অতিক্রম করে পূর্ণ চৈতন্যে জাগ্রত হও। পাঞ্চজন্য শঙ্খে নির্ঘোষ তুলে সকল মানুষের জীবনরথের অশ্বরজ্জু ধরে মোহাভিভূত নর-চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করে বল—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

তুমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হও; কিন্তু অহরহ মানব-অন্তরে তুমি রয়েছ। জীবন-পয়োধিতে চৈতন্যের শতদলকে সেই অনাদি কাল থেকে দলের পর দলে বিকশিত করছ। আজ এই এ-দেশের লৌকিক কাল গণনার ১১৩৬ সাল—হিজরী ১১৫১—শ্বেতাঙ্গ বণিকদের ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাঁড়িয়ে পিছনের গণনার অতীত—বহু সহস্র বহু লক্ষ বৎসর অতীত কালের দিকে তাকিয়ে তো দেখতে পাচ্ছি, প্রভু, সে চৈতন্যের শতদল ক্রমপ্রকাশে ক্রমবিকাশে দিনে দিনে ফুটেই চলেছে—ফুটেই চলেছে—ফুটেই চলেছে। এই আমার জীবনে—আমি সেই তো কৃমিকীট হতে চৌরাশী কোটি দেহান্তরের পর মানুষের দেহে মনে উপনীত হয়েছি; কত জন্মান্তরের পর এই জন্মে তোমাকে উপলব্ধি করছি—এ তো মিথ্যা নয়। চৈতন্যে তুমি পূর্ণ হয়ে জাগ্রত হও প্রভু।

নিত্যই তাঁর এই প্রার্থনা। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটি বেদনার সুর তাঁর এই প্রার্থনা-সঙ্গীতের সঙ্গে তানপুরার ধ্বনির মত বাজতে থাকে। আজ হঠাৎ তাঁর চোখের সম্মুখে তিনি এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন। দেখলেন, দলে দলে অশ্বারোহী আসছে। অশ্বক্ষুরে ধুলা উড়ে দিগন্ত অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন এ-দেশের পটুয়ারা পটে ছবির পর ছবি দেখায় তেমনিভাবে দৃশ্যের পর দৃশ্য। দেশ জ্বলছে। গ্রাম লুঠ হচ্ছে। মহামারী, দুর্ভিক্ষ। আবার অশ্বারোহী। যুদ্ধ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। যুদ্ধের পর যুদ্ধ। এরই মধ্যে—ছি-ছি-ছি! মধ্যে মধ্যে একটি কিশোরীর মুখ! আশ্চর্য, সারি সারি সারি মুখ। ওই একখানি মুখ। নানান বিচিত্র বেশে ভূষায় রূপে—ওই এক মুখ সহস্র হয়ে ভেসে উঠছে। কখনও ঢলঢল বিহ্বল দৃষ্টি—মুখে সূর্যোদয়-মুহূর্তের আকাশের অরুণরাঙা পেলবতা, কখনও উদাস দৃষ্টি—মুখে আকাশের নীলের প্রসন্ন কোমলতা, কখনও সকরুণ সজল দৃষ্টি—মুখে সায়াহ্নের মলিনতা, কখনও বিলাসিনী বেশ, উদাসিনী বেশ, কখনও ভিখারিণী বেশ। কিন্তু সর্বরূপে সর্বভাবেই সে কিশোরী। জীবন-জগতের সর্বস্থান সর্বকাল ব্যাপ্ত করে রয়েছে যেন। কাতরভাবে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, সমস্ত পৃথিবীর বুকের উপর জীবনের প্রথম মাধুরী অনন্তমূল অনন্তকাণ্ড দূর্বাদলের মত নিজেকে বিস্তার করে রেখেছে। মাটির মৃত্যু ঘটে। পাথর না হলে যেমন দূর্বাদলের আচ্ছন্নতা থেকে নিস্তার নাই, জীব-জীবনেরও মৃত্যু ভিন্ন যেন ওই রূপের প্রভাব-স্পর্শ থেকে নিষ্কৃতি নাই। প্রার্থনা করেছিলেন—"হে কেশব, হে কংসারি, হে গোবিন্দ! আমাকে তুমি ওই রূপ আর দেখিয়ো না। ওকে আবরিত করে তুমি প্রকট হও।"

ধ্যানের আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন মাধবানন্দ। বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মুক্ত বাতাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সুস্থ হয়ে ভেবেছিলেন—এটা কী হল? এসব কী দেখলেন তিনি? ১১৪৬ সালের এই আষাঢ় মাসের রাত্রের প্রথম প্রহরে ধ্যানাসনে বসে তিনি কি ভবিষ্যৎ দেখলেন? দেখা কি সম্ভব? আর ওই মুখ? ওরই বা অর্থ কী? হঠাৎ মনে হল, সবই অর্থহীন। তাঁর চিন্তা-উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ও অনুভূতির বিভ্রম। একান্তভাবে মিথ্যা কল্পনা। নিজেকেই নিজে ছলনা করেছেন তিনি। কিন্তু এই মুহূর্তটিতেই প্রহর ঘোষণা

করে ডেকে উঠল শেয়াল-প্যাঁচা; কীটপতঙ্গধ্বনি-তরঙ্গের মধ্যেও যেন একটি চকিত ছেদ পড়ল। যতক্ষণ এই ঘোষণা চলল, মাধবানন্দ একাগ্র এবং উন্মুখ হয়ে শুনলেন এই ঘোষণা। তিনি যেন, যেন নয়—নিশ্চিতভাবে, তাঁর মনের প্রশ্নের উত্তর শুনছিলেন।

এই শিবারা এই পেচকেরা এই কীটপতঙ্গেরা তো মত্ত ছিল—আহারে বিহারে বিশ্রামে। হঠাৎ ডেকে উঠল কী করে? এই কালগণনা কী ভাবে চলছিল তাদের মধ্যে? তারা তো মানুষের চেয়ে অনেক পশ্চাতে রয়েছে। তাদের চেতনা বুদ্ধি চৈতন্য—সবই তো মানুষের থেকে অনেক গুণে ক্ষীণ, অপরিপুষ্ট। তবু তাতেই তারা যদি বর্তমানে এই ভাবে প্রহর-ক্রান্তিকে বুঝতে পারে, তবে মানুষই বা ভবিষ্যতের ক্রান্তিকালকে অনুভব করতে পারবে না কেন? জন্তুরা অতীতকে ভুলে যায়, মানুষ অতীতকে মনে রাখে, বর্তমানে দাঁড়িয়ে তাকে স্মরণ করে—সময়ে সময়ে তো অতীত কালের ঘটনা প্রত্যক্ষের মত চোখের সামনে ঘটে যায়; তবে ভবিষ্যৎই বা দেখা অসম্ভব কিসে?

তিনি কি তবে ভবিষ্যৎকে দেখলেন?

কথাটা কেশবানন্দকে বলতে গিয়েও বললেন না। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ কূটনীতির বিচারে ও হিসাবে পারদর্শী এই পশ্চিম-দেশীয় সুচতুর লালা-বংশের সন্তানটির সিদ্ধান্তের সঙ্গে এর খানিকটা মিল রয়েছে। কেশবানন্দ এতেই উৎসাহিত হয়ে তার সর্বনাশা চাতুরীর খেলাকে অভ্রান্ত বিধি এবং বিধান বলে প্রয়োগ করতে উদ্যত হবে। দাবাখেলার খেলুড়ে সে, জীবনখেলার বিধাতা নয়—এটা যে ভুলে যাবে; নিজের কাছে নিজে প্রতারিত হয়েই এ খেলা শেষ করবে সে।

"যা দেবী ভ্রান্তিরূপেণ সর্বভূতেষু সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

মন্দিরে প্রবেশ করে আসনে বসে আবার যেন অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সে অস্থিরতা এমন যে আসন ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত বের হয়ে এলেন মন্দির থেকে। আশ্রম-প্রাঙ্গণ তখন জনশূন্য। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তিনি আশ্রম থেকেও বেরিয়ে পড়লেন। দাঁড়ালেন বনের মধ্যে।

আপনার চিত্তের সে এক বেদনার্ত অসহায় উপলব্ধি বা অনুভূতি যাই হোক, তার আবেগেই তিনি বেরিয়ে এলেন আশ্রম থেকে। শুধু তাই নয়, অজ্ঞাত আকর্ষণও যেন তাঁকে টানছে, অনিবার্য বেগে আকর্ষণ করছে তাঁকে। চললেন তিনি জয়দেব-কেন্দুলীর দিকে। জয়দেবের সাধনা যদি মাত্র লোকরটনা না হয়, যদি সত্য সত্যই কবির সংশয় নিরসনের জন্য শ্যামসুন্দর জয়দেবের রূপ ধরে এসে নিজের হাতে কলম ধরে 'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্' পংক্তি লিখে গিয়ে থাকেন তবে সেই সাধনপীঠে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লে কি কোন নির্দেশ তিনি পাবেন না? যদি সত্য হয়, অবশ্যই পাবেন, মিথ্যা লোকরটনা হলে পাবেন না।

রক্তনালা পার হয়ে তিনি এসে অজয়ের বন্যারোধী বাঁধের উপর উঠলেন। পিছনে শ্যামরূপার গড় জঙ্গলে জীবনের আদিম রূপের খেলা বল খেলা, লীলা বল লীলা—চলছে। একটা চিতাবাঘের গর্জন এবং একটা হরিণের আর্তস্বর একসঙ্গে মিলিত হয়ে নৈশ স্তব্ধতাকে সচকিত করে তুলেছে। মুহূর্তের জন্য মাধবানন্দ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর পায়ের কাছে হাত দুই দূরে ও দুটো কী?

ওঃ! মৈথুনালিঙ্গনবদ্ধ বিবশদেহ প্রায় হতচেতন দুটো সরীসৃপ, মহাবিষধর দুটো গোখুরা সাপ। বাঘ এবং হরিণের গর্জন ও আর্তনাদ, তাঁর নিকট-সান্নিধ্য কিছুতেই তাদের সচেতন করে তুলতে পারে নি। চেতনা পর্যন্ত এক বিবশতার সমুদ্রের কোন্ অতল গহ্বরে হারিয়ে গেছে। একটু বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। পরক্ষণেই অতি সন্তর্পণে কয়েক পা পিছিয়ে এসে পাশ কাটিয়ে পথ ধরে অজয়ের তটভূমে নেমে পড়লেন।

দেহের মধ্যে যে মহামোহময়ী বাস করেন, তাঁকে তিনি আজ নূতন করে প্রত্যক্ষ করলেন।

আষাঢ় মাসের অন্ধকার রাত্রি; তার উপর আকাশে মেঘ। সেই অন্ধকারের মধ্যেই মাধবানন্দ মনের এক অসম্বরণীয় আবেগের প্রেরণায় বা তাড়নায় চলেছেন। অজয়ের চরভূমি, চরভূমির বালুরাশির উপর প্রথম আষাঢ়ে তৃণোদ্গম হয়েছে, কুশ এবং কাশগুল্মে অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। খড়ম পায়ে এতে চলবার পক্ষে কিছু সুবিধা হয়েছে। মাধবানন্দ পশ্চিম মুখে

চলেছিলেন। ওপারে ইলামবাজার-জয়বাজারের গঙ্গার রেশ চলেছে অনেক দূর পর্যন্ত। প্রায় গ্রামে গ্রামেই ঘাটের মাথায় ছোট ছোট বাজার; এই রাত্রেও দু-চারটে আলো জ্বলছে দেখা যাচ্ছে। গ্রাম্য কুকুরেরা চিৎকার করছে এপারের বনের দিকে লক্ষ্য করে। বোধ করি এপারের শ্যামরূপার গড় জঙ্গলের আরণ্যজীবনের অবাধ উন্মত্ত লীলাকে শাসাচ্ছে। গোটা চরভূমির গুল্ম এবং তৃণাস্তরণের ভিতর থেকে বিচিত্র ঐকতান উঠছে। সূর্য এখন উত্তরায়ণে, সৃষ্টি-জীবনস্রোতে এখন বন্যার সময়, অম্বুবাচীতে পৃথিবী ঋতুমতী হন, সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপ-কীট-পতঙ্গ-জীব-জন্তুর মধ্যেও তনুভোগ-বাসনা উত্তপ্ত উগ্র হয়ে ওঠে। ওই সেই মোহময়ীর নৃত্যলীলা। উলঙ্গিনী হয়ে নাচছে সে।

অজয়ের জলে পা দিয়েই আবার থমকে দাঁড়ালেন মাধবানন্দ। ওঃ! জলতলেও চলেছে ওই মোহময়ীর উলঙ্গ নৃত্য। এই তো নূতন বর্ষণ নামবে, নদীর বুক ভরবে, বন্যা আসবে, সেই বন্যায় ভেসে আসবে মাছের ডিম, মাছের পোনা। ব্যাঙাচিতে ব্যাঙাচিতে ভরে যাবে পুকুর ডোবা।

জগৎ-ব্যাপ্ত চৈতন্যের তপস্যাভঙ্গের জন্য সে মোহিনীরও যেন এ এক দুশ্চর তপস্যা। কী তার রূপ? সে কেমন? অন্ধকারের মধ্যেও গাঢ়তম অন্ধকারের মত কি?

পায়ের উপর দিয়ে নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে, পায়ের তলায় বালি খসে খসে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের একটি কাতর চিৎকারে তাঁর চেতনা ফিরে এল। চিন্তামগ্নতার ঘোর কেটে গেল। কে চিৎকার করছে? এমন মর্মান্তিক কাতর চিৎকার! নারীকণ্ঠে? কি মর্মান্তিক বেদনা!

ওঃ, তিনি অনেকটা পশ্চিমে এগিয়ে এসে কেন্দুলীর শ্মশানঘাটের সামনে এসে পড়েছেন। মন্দিরের ঘাট, ওই যে—অনেকটা পূর্বদিকে; হ্যাঁ, ওই যে জয়দেব প্রভুর সিদ্ধাসন! ওই তো ঘাটের উপর! মনের আবেগে চিন্তা-মগ্নতার মধ্যে এসে পড়েছেন তিনি। ওই সামনে শ্মশানঘাটের বিশাল বটগাছটা দেখা যাচ্ছে। ওরই পাশে ওই তো পৌষ-সংক্রান্তিতে বাউলদের সঙ্গমতীর্থ!

আবার সেই নারীকণ্ঠে আর্তবিলাপধ্বনি ধ্বনিত হয়ে উঠল। কণ্ঠস্বর থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে, এ আর্তনাদ কোন সদ্য-বিপন্নার নয়—এ আর্তনাদ মর্মান্তিক বিলাপ, বোধ করি কোন অভাগিনী তার অন্তরের ধনকে হারিয়ে

বিলাপ করছে। কিন্তু কই? কোন চিতা তো জ্বলছে না! মানুষজনের সাড়াও তো পাওয়া যায় না! তা হলে হয়তো কোন পাগলিনী। গভীর রাত্রে শ্মশানে এসে কাঁদছে।

মাধবানন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ফিরলেন। মন্দিরের ঘাটের সামনে গিয়ে অজয় পার হবেন। কিন্তু সামান্য কয়েক পা গিয়েই আবার ফিরলেন। ওই মর্মান্তিক বিলাপধ্বনি যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে। যে আকর্ষণে তিনি চলে এসেছেন এতটা, সেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু যেন ওইখানেই বলে মনে হচ্ছে।

ফিরে এসে ওপারের শ্মশানঘাটের সামনের ঘাটে নেমে পড়লেন তিনি। এপার থেকে যারা ওপারের কেন্দুলীর শ্মশানঘাটে শবদাহ করতে নিয়ে যায়, তাদের পায়ে পায়ে একটি ঘাট তৈরী হয়েছে এখানে। পায়ের খড়ম জোড়াটা ঘাটের মাথায় খুলে রেখে জলে নেমে পড়লেন। জল এখন অজয়ে বেশী নয়, অধিকাংশ স্থলেই এক-হাঁটু এক-কোমর, দু-এক জায়গায় খানিকটা এক-বুক বা এক-গলার বেশী নয়। এই স্রোতটুকু ধরেই এ সময়ে নৌকা চলাচল করে।

স্রোত শেষ হয়েই বিস্তীর্ণ বালুচর।

বালুচর পার হয়ে তবে কেন্দুবিল্বের তটভূমি।

বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই বালুচরের উপরেই শ্মশানের কাজ চলে। ওই বালুচর থেকেই উঠছে ওই বিলাপধ্বনি। যত এগিয়ে এলেন এপারের দিকে ততই বুঝতে পারলেন, এ বিলাপ ছেদহীন, বিরামহীন, মৃদুস্বরে গুনগুনিয়ে কেউ কেঁদেই চলেছে, কেঁদেই চলেছে। ওপার থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না, মধ্যে মধ্যে উচ্চ আর্তনাদে কেঁদে উঠছিল যখন, তখনই সে ধ্বনি ওপার পর্যন্ত গিয়ে কানে পৌঁছচ্ছিল। জলস্রোত পার হয়ে বালুচরে উঠে মাধবানন্দ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন।

কই? কোথায় সে, যে এমন করে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে? গাঢ় অন্ধকারে সব আচ্ছন্ন। আকাশে পাতলা মেঘের আস্তরণ পড়ে নক্ষত্রালোকের পথও রুদ্ধ করে রেখেছে, এই পাতলা মেঘে বারেকের জন্য ক্ষীণ বিদ্যুচ্চমকও চমকায় না যে, তার সাহায্যেও চকিত দেখার সাহায্য হয়! কিন্তু চোখেরও একটা অন্ধকারভেদী শক্তি আছে। কিছুক্ষণ অন্ধকারে চললেই কিছু-

কিছুটা দেখা যায়। যত দীর্ঘক্ষণ অন্ধকারে থাকে মানুষ, ততই এই দৃষ্টিশক্তির পরিধি বাড়ে। কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছেন মাধবানন্দ। ওই তো কালো কালো চিতার দাগ। ওই তো পোড়া কাঠ এখানে একটা ওখানে একটা— ওই আর-একটা—ওই একটা পড়ে আছে। কিন্তু যে কাঁদছে সে কই? তবে কি নিরালম্ব বায়ুভুক কোন অশরীরিণী শ্মশানের বায়ুস্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে আর কাঁদছে? বিগত জন্মের অপরিপূর্ণ বাসনার টানে মাটিকে আঁকড়ে ধরে ফিরে পেতে চাচ্ছে তার বাসনাময়ী দেহকে, কিন্তু পাচ্ছে না? আবার মুহূর্তে মাধবানন্দের মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই মোহময়ীর কল্পনা। বাসনা-ময়ী দেহের বস্তুভোগের বিবিধ স্তরের বেদী থাকে থাকে সাজানো—আহার-বাসনা, বসন-বাসনা, ভূষণ-বাসনা, স্বাদ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বেদী, তার উপর আসীনা ওই মোহময়ী; সে বলে "প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর", "রূপ লাগি আঁখি ঝুরে"—রূপ দেখে সে আকুল হয়ে কাঁদে।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। কে? কে? ও কে?

অন্ধকারের মধ্যে সহসা একটি ভূতলশায়িনী মূর্তি উঠে বসল। ভূতলশায়িনী—হ্যাঁ, তাই বটে; একটি নারীমূর্তি, মাথার আলুলায়িত চুলের রাশি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তিনি, নারীমূর্তিই বটে! চিৎকার করে উঠল আর্তস্বরে: আঃ—হা-হা-হা রে! আঃ!

সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল মাধবানন্দের। একটা ভয়ার্ত শিহরণে তাঁর সর্বশরীর শিউরে উঠল। মাধবানন্দ ভীরু নন। তিনি সারা উত্তরাপথ ঘুরেছেন তাঁর জীবন-প্রশ্নের উত্তরের জন্য। অরণ্যে, পাহাড়ে, শ্মশানে, বিপ্লবাক্রান্ত নগরীর হিংসাজর্জরতার মধ্যে দিন রাত্রি যাপন করে এসেছেন। তবু এই অন্ধকার রাত্রে এই মহাশ্মশানের মধ্যে যখন এক মোহময়ীর কল্পনায় তাঁর মন বিভ্রান্ত, সেই মুহূর্তে ওই আলুলায়িতকুন্তলা এক নারীকে ঠিক যেন মাটির বুক ভেদ করে উঠতে দেখে তিনি শিউরে উঠলেন।—এই কি সেই?

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে পাথরের মূর্তির মতই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। উন্মাদিনী নিশ্চয়। অথবা এ মূর্তিমতী সেই। উঠে বসে সে বিলাপ করছে। বিলাপ, না, গান? এ তো গান! কী, কী গাইছে?

শোনবার জন্য সমস্ত অন্তরকে তিনি একাগ্র করে তুললেন। এবার শুনতে পেলেন—

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা॥"

পরক্ষণেই সে চিৎকার করে উঠল, আঃ আঃ আঃ!

চিৎকার করে সে এবার উঠে দাঁড়াল। সভয়ে শিউরে উঠলেন মাধবানন্দ। পূর্ণপরিণতযৌবনা, গৌরাঙ্গী, রুক্ষ আলুলায়িতকেশা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গিনী এক নারী।

এ তবে—এ তবে—? পরক্ষণেই তিনি আবার চমকে উঠলেন। এ যে, এ যে—এ যে সেই পাপিনী—সেই বৈষ্ণবী! কয়ো আজই তাঁকে বলেছে, সে উন্মাদ হয়ে গেছে। তাঁরই অভিশাপে।

মাধবানন্দ পাথর হয়ে গেলেন।

উন্মাদিনী চিৎকার করে বললে, রাধা পাপ? হে কবিরাজ গোস্বামী, তোমার ভ্রম ভেঙেছিলেন স্বয়ং গোবিন্দ। নিজের হাতে পাদপূরণ করে লিখেছিলেন—দেহি পদপল্লবমুদারম্! আর আজ যে রাধাকে মোহময়ী ভেবে, পাপ ভেবে গোবিন্দের পাশ থেকে সরালে, নির্বাসন দিলে, তার ভ্রম কে ভাঙবে? আমার এ অপমানের শোধ কে নেবে? আমি অভিসম্পাত দিলাম—আমি অভিসম্পাত দিলাম—তৃষ্ণায় বুক-ফাটা যন্ত্রণার মধ্যে তুমি তৃষ্ণার জলকে চিনো। বুকের মধ্যে দেহের রোমকূপে-কূপে তোমার আগুন জ্বলবে, যেমন আমার জ্বলছে। সেইদিন তুমি বুক ফাটিয়ে চিৎকার করবে 'রাধা' 'রাধা' বলে; তোমার রোমকূপে-কূপে চিৎকার উঠবে 'রাধা' 'রাধা' বলে। উপর দিয়ে উঠতে গিয়ে পাতালমুখে মাথা ঠুকে পড়বে তুমি।

বলতে বলতে সে আবার হা-হা-হা শব্দে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতেই সে সেই নিশীথ রাত্রে অন্ধকারাচ্ছন্ন বালুচর ধরে চলতে শুরু করল। সুদীর্ঘ অজয় চলে গেছে পূর্বমুখে ইলামবাজার হয়ে গঙ্গাসঙ্গম অভিমুখে। ধুধু-করা বালুচরের বেশ কিছুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, তারপরই অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তারই সঙ্গে উন্মাদিনী বৈষ্ণবীও মিশে গেল অন্ধকারের মধ্যে, শুধু তখনও শোনা যাচ্ছিল: অভিসম্পাত দিলাম—আমি অভিসম্পাত দিলাম।

ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে সে শব্দও ক্রমে মিলিয়ে গেল। মাধবানন্দ যেন পাথর হয়ে গেছেন। তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন। পিছনে অজয়ের জলস্রোতের মৃদু কুলকুল ছলছল শব্দ ধ্বনিত হয়ে চলছিল অবিরাম। মাধবানন্দের কানে যেন মনে হল মৃদু জলকলধ্বনির মধ্যেও বাজছে সেই গান—

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
হরি-বিহনে অঙ্গ হামারি মদনানলে দহনা॥"

আশ্চর্য! তাঁর ইচ্ছা হচ্ছে ওই সর্বনাশীর পিছনে ছুটে যান। একটি করুণ মমতায় তাঁর মন বেদনার্ত হয়ে উঠেছে। ওই বেদনার আকর্ষণ তাঁকে টানছে। তিনি কঠিন হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

* * *

কতক্ষণ পর কে জানে! কার উৎকণ্ঠিত উচ্চকণ্ঠের শব্দে তাঁর চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠল। কে কাকে ডাকছে। বোধ করি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—মা-জী! মা-জী! মা-জী!

মাধবানন্দের চোখে পলক পড়ল। তিনি চঞ্চল হয়ে সামনে পাশে পিছনে মুখ ফিরিয়ে আহ্বানের দিক্‌নির্ণয়ের চেষ্টা করলেন। কোন্ দিক থেকে কে কাকে ডাকছে?

—মা-জী গো!

এবার মা-জী শব্দটির অর্থ তাঁর মস্তিষ্কে বোধগম্য হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এ কণ্ঠস্বর তো তাঁর পরিচিত। কে? কয়ো? হ্যাঁ, কয়োই তো। মনে পড়ল যে উন্মাদিনীকে এই বালুচরের শ্মশানে বিলাপ করতে দেখেছেন, সে কৃষ্ণদাসী। কয়ো তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মাধবানন্দ।

মনে মনে কংসারিকে প্রণাম করলেন। হে কংসারি, তুমি দাসকে রক্ষা করেছ। বৃন্দাবনের সকল মোহকে পশ্চাতে রেখে মোহময়ী রাধাকে ফেলে তোমার যাত্রাপথে তুমি পিছন ফিরে তাকাও নি। রাধার চোখের জলে ব্রজভূমি-মৃত্তিকা সিক্ত হয়েছিল, তোমার অনিবার্য নিয়মে সূর্য তাকে শোষণ করে নিশ্চিহ্ন করেছে, তার দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপকে বায়ু গ্রাস করেছে, তার বিরহতাপতপ্ত তনুদেহকে বহ্নি নিশ্চিহ্ন করেছে; ভস্মাবশেষকে গ্রাস

করেছে ধরিত্রী। মানুষের স্মৃতিতে বেদনায় শুধু সে বেঁচে আছে। জড়-জগতের নিয়মে তাকেও তুমি নিশ্চিহ্ন করে দাও। মানব-চৈতন্যের মোহ-বন্ধন মোচন কর।

চারিদিকের অন্ধকার স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অকস্মাৎ পাখিরা কলরব করে উঠল। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। মাধবানন্দ আবার অজয়ের জলে নামলেন। এপারে এসে পরিত্যক্ত খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়ে পূর্বমুখে এগিয়ে চললেন নিজের আশ্রমের দিকে। ওই দেখা যাচ্ছে ইছাই ঘোষের দেউল।

আশ্রমে যখন এসে তিনি প্রবেশ করলেন, তখন মেঘাচ্ছন্ন পূর্বদিগন্ত, মেঘান্তরালবর্তী সদ্যোদিত সূর্যের রক্তাভায় যেন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

সকালবেলা উদয়দিগন্তে এ রক্তাভা, বৃষ্টি নামবার পূর্বলক্ষণ। বৃষ্টি নামবে। বর্ষা আসন্ন। হ্যাঁ, এই সকালেই পাখিরা আহারসন্ধান ছেড়ে মুখে কুটো নিয়ে বাসার দিকে উড়ছে।

—গুরু মহারাজ!

কেশবানন্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন কংসারির গৃহের সামনে। বোধ করি ভোর-বেলা উঠে দেবগৃহে বা তাঁর নিজের কুঠরিতে না পেয়ে তাঁরই জন্যে চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধবানন্দ বললেন, কেশবানন্দ!

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে কেশবানন্দ বললেন, প্রশ্ন করা আমার উচিত নয়, অধিকারও নাই। কিন্তু আপনার মুখ দেখে—

—কাল রাত্রে কেন্দুবিল্বের দেবতার কাছে কিছু নিবেদনের জন্য গিয়ে-ছিলাম। কিন্তু আকাশ দেখেছ? বর্ষা আসন্ন। চালের আচ্ছাদন মেরামত অবিলম্বে সম্পূর্ণ কর।

—সে ব্যবস্থা অনেক আগেই করেছি। গুরু মহারাজ, আমাকে একটু বেশী বৈষয়িক বলে মধ্যে মধ্যে তিরস্কার করেন। আজ গুরুর কাছ থেকে প্রশংসা প্রত্যাশা করি।

মাধবানন্দ এতক্ষণে একটু হাসলেন। বললেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু দেখো সেগুলি ইতিমধ্যেই আবার জীর্ণ হয় নি তো! এ সব অঞ্চলে উইপোকার উপদ্রব বেশী।

কেশবানন্দ বললেন, তার জন্তে বাখারি এবং কাঠে গুড়ের গাদের প্রলেপ

মাখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি। মিষ্টলোভী পিঁপড়ের ঝাঁক উইপোকা প্রায় শেষ করে এনেছে। উইয়ের উপদ্রব হবে না। কিন্তু দুটো সংবাদ আছে। এই ভোরবেলা পেয়েছি। ওপার থেকে কয়ো এসেছিল। শুনলাম উন্মাদরোগগ্রস্তা কৃষ্ণদাসী কাল রাত্রে নিরুদ্দেশ হয়েছে। সে এখানে তাকে খুঁজতে এসেছিল। আর সংবাদ পেয়েছি, নবাব সুজাখাঁ মারা গিয়েছেন। শুনছি, শেষ মুহূর্ত নিকট বুঝে বীরভূম-অভিযানের হুকুম প্রত্যাহার করে রাজনগরের নবাবের আরজিমত মিটমাট করে নিতে বলে গিয়েছেন। এক লক্ষ টাকা দিতে রাজনগরের নবাব স্বীকৃত হয়েছেন। বর্ধমানের মহারাজ তাঁর জামিন দাঁড়িয়েছেন।

মাধবানন্দ বললেন, কৃষ্ণদাসীর সংবাদ নিয়ো একবার।

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ থেকে আবার বললেন, না। পাপ নিশ্চিহ্ন হওয়াই ভাল। বলেই তিনি অগ্রসর হতে উদ্যত হলেন। কেশবানন্দ বললেন, বীরভূম অভিযান আপাতত স্থগিত হয়েছে বটে, কিন্তু সারা বঙ্গদেশ নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ আসন্ন এবং নিশ্চিত হয়ে উঠল গুরু মহারাজ। নবাব সুজা-উদ্দিন মারা যাবার পর সরফরাজ খাঁ নবাব হবে। লোকটি বিচিত্রচরিত্র। শুনি ইতিমধ্যেই তার হারেমে উপপত্নীর সংখ্যা শত শত। কেউ কেউ বলে, এ সব নাকি তার এক বিচিত্র ধর্মসাধনার অঙ্গ। উজীর হাজী আহম্মদ এক দিকে গোঁড়া মুসলমান, অন্য দিকে রাজ্যলোভী কুচক্রী। তার সঙ্গে সরফরাজের বিবাদ লাগল বলে। আমাদের পক্ষে সুবর্ণ-সুযোগ গুরু মহারাজ। আমার প্রস্তাব আপনি বিবেচনা করে দেখুন।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ : কী প্রস্তাব ?

—লোক সংগ্রহ করা, আমাদের দলকে পরিপুষ্ট করা। অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা।

—সন্ন্যাসীর দলকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করতে চাও কেশবানন্দ ?

—হ্যাঁ গুরু মহারাজ। হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠার এ সুযোগ গেলে আর আসবে না।

মাধবানন্দ কেশবানন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, দেশের দিকে তাকিয়ে, ইষ্টদেবতার নাম নিয়ে, একটা সত্য উত্তর দেবে কেশবানন্দ ?

—গুরুর সম্মুখে আমি মিথ্যা কথা বলি বলে কি গুরু মহারাজের মনে সন্দেহ হয় ?

—মনসা চিন্তয়েৎ কর্ম বচসা প্রকাশয়েৎ—সূত্রটি সত্য এবং মিথ্যার সীমারেখার উপর অতি সুকৌশলে স্থাপিত করে গেছেন মহাপণ্ডিত কৌটিল্য। তুমি একদা রাজকর্মচারী ছিলে, রাজনীতিতে তুমি অভিজ্ঞ। তোমার মনের অজ্ঞাতসারে অভ্যাস ক্রিয়া করে যায়, এটাও মানুষের একটা জীবনসত্য। তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ নাই। তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না।

একটু স্তব্ধ থেকে কেশবানন্দ হেসে বললেন, প্রশ্ন করুন। সত্য বলব। অত্যন্ত সতর্ক সচেতনতার সঙ্গে বিচার করেই উত্তর দেব।

—বল তো কেশবানন্দ, মুসলমান-রাজত্বের উচ্ছেদ করে হিন্দুরাজত্ব চাও কেন ? বিদ্বেষের বশে ?

কেশবানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। উত্তর বোধ করি সতর্ক বিচারের সঙ্গে স্থির করছিলেন।

মাধবানন্দ বললেন, রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কোন বিশেষ ধর্ম নয় কেশবানন্দ। সেটি হল ন্যায়ধর্ম। যা ন্যায়সম্মত তাই ধর্ম। যা অন্যায় তাই অধর্ম। এবং রাজা ন্যায়পরায়ণ হলেই রাজ্য ন্যায়ের রাজ্য হয় না। রাজ্যের প্রজা যদি অন্যায় অধর্মে আসক্ত হয়, তবে সেখানেও রাজার সঙ্গে প্রজার বিরোধ বাধে। যেখানে অন্যায়, সে এক পক্ষেই থাক্ আর দু পক্ষেই থাক্, সেখানে অশান্তি থাকবেই। এখন বল তো কেশবানন্দ, আজ দেশের এই অবস্থা, এই যে অন্যায়ের স্রোত বইছে, রাজ-অন্তঃপুর বিলাসভবন থেকে মানুষের পর্ণকুটির পর্যন্ত, এর জন্য দায়ী কি শুধু মুসলমান আধিপত্য, না, হিন্দুর জীবনের বিকৃতি এবং অধঃপতনও সমান ভাবে দায়ী ?

কেশবানন্দের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। একটা অবরুদ্ধ ক্রোধে তাঁর সর্ব দেহ মন যেন জ্বর-জর্জরতায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

মাধবানন্দ বলেই গেলেন কেশবানন্দের মানসিক অবস্থা তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন না তা নয়, কিন্তু সে দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

তিনি বললেন, শুধু মুসলমানকে দোষ দিয়ো না বিদ্বেষবশে, হিন্দুরও বিচার কর। বল তো, রাজা হিসাবে শুধু কি মুসলমানই অত্যাচারী? যেখানে যেখানে হিন্দু রাজা রয়েছে সেদিকে তাকাও তো। মুসলমান যে যে অত্যাচার করে সেই সেই অত্যাচারের জন্য হিন্দু রাজারাও কি দায়ী নয়?

এবার কেশবানন্দ অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদের মত জ্বলে উঠলেন। বললেন, আপনি গুরু, তাই কথার উত্তর দিতে কুণ্ঠা বোধ করছিলাম। এখনও কুণ্ঠা রয়েছে। তাই আপনাকে নাস্তিক, ধর্মবোধহীন বলতে বাধছে। এ কথার উত্তর মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষময় অস্ত্রাঘাতে খোদিত করে লিখে রেখেছে। তাকিয়ে দেখুন সোমনাথের দিকে, বৃন্দাবনে গোবিন্দ-মন্দিরের দিকে, কাশীধামে বেণীমাধবের ধ্বজার দিকে। এর পরও আর উত্তর চান?

—চাই, একটা জবাব চাই।

—বলুন।

—মুসলমান মন্দির ভেঙেছে, তারা মূর্তিপূজাকে মিথ্যা মনে করে বলে। মূর্তি যদি সত্যই হয় কেশবানন্দ, তবে মূর্তি ভেদ করে দেবতা আবির্ভূত হয়ে সেই সত্য প্রকট হল না কেন?

কেশবানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মাধবানন্দ বললেন, আমার ধারণা কী জান? হিন্দুই তার অনাচারে আচারের নামে অধর্মকে আশ্রয় করে দেববিগ্রহ থেকে দেবত্বকে নির্বাসিত করেছে। মাটির প্রদীপে আগুন ধরালেই প্রদীপ জ্বলে, আবার নিবিয়ে দিলেই নিবে যায়। জ্বালেও মানুষ, নেবায়ও মানুষ। যতক্ষণ সে ন্যায়কর্ম করে ততক্ষণ তার আলো না হলে চলে না, যখন সে অন্যায় করে তখন প্রথমেই সে আলোটা নিবিয়ে দেয়। অন্ধকার—চারিদিক অন্ধকার কেশবানন্দ; কাল রাত্রে আকাশে একটি তারাও দেখতে পাই নি। তারই মধ্যে দেখেছি বোধ করি এ দেশের সত্য অবস্থা। অন্ধকারে অনেক হানাহানি অনেক রক্তপাত, অনেক রাজা বদল হয়েছে কেশবানন্দ। আর অন্ধকারে নয়—আলো জ্বালো, জীবনে জীবনে আলো জ্বালো; আলোয় আলো হয়ে উঠুক, তারপর দেখবে সমাজে শান্তি আসবে, মন্দিরে দেবতা আসবেন, অধর্ম দূরে যাবে; রাজা ধার্মিক হবে।

কেশবানন্দ এতক্ষণে যেন স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে আত্মস্থ হলেন। তাঁর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ কিন্তু চোখ দুটি উজ্জ্বল স্থির। মাধবানন্দ বললেন, শোন কেশবানন্দ, শেষ কথা বলি। অধার্মিক রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে অধার্মিক প্রজার অভ্যুত্থান-বিদ্রোহ সে শুধু অধর্মকেই প্রবল করে তোলে, জীবনের দুঃখকেই বাড়িয়ে তোলে। অধার্মিক রাজারও স্বেচ্ছাচারের অধিকার নাই, অধার্মিক প্রজারও অভ্যুত্থানের অধিকার নাই কেশবানন্দ। অধিকার আছে শুধু অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের অভ্যুত্থানের।

কেশবানন্দ এবার বললেন, নিশ্চয়, সে-কথা আমি অস্বীকার করি না। এ-কথা শুধু আপনি গুরু, আপনার বাক্য গুরুবাক্য বলেই মানি না, সর্বান্তঃকরণে মানি। আমাদের দেশের সব মানুষই মানে। ধর্ম যেখানে সত্য, সেখানে হিন্দু-মুসলমান বিচার কেউ করে না। সিদ্ধ সাধক যিনি, তিনি হিন্দুই হোন আর মুসলমান হোন, তাঁর প্রতি মানুষের সমান ভক্তি। সেই কারণেই ধর্মদ্বেষী বিধর্মী রাজশক্তির পতনের সময় যখন আসন্ন তখন তার উচ্ছেদ করলে, আমি মহাধর্ম বলে মনে করি। প্রজার অধঃপতন, তাদের মধ্যে ধর্মের বিকৃতি সত্য; স্বীকার করি। কিন্তু সে অধর্মের পঙ্ক থেকে টেনে তোলার যে পন্থা আপনি নির্ধারণ করেছেন, তার সঙ্গে আমি একমত নই। রাজশক্তি অনুকূল হলে, সে কাজ সহজে হবে। শক্তি যদি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের হাতে আসে, তবে সে কর্ম হবে অতি সহজে।

—ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদের মধ্যে আজ কত অংশ ছদ্মবেশী পাপী চোর ডাকাত খুনী ব্যাভিচারী, আর কত অংশ সত্যকারের সাধু ঈশ্বরসন্ধানী তুমি বলতে পার কেশবানন্দ? এমন কি, নানান মাঠের দিকে তাকিয়ে কথা বল। যারা শুধু ডাল-রুটি খায়, যৌগিক পন্থায় দেহচর্চা করে ত্রিশূল হাতে মদমত্তের মত বেড়ায়, তারাও কি সত্যকারের সন্ন্যাসী? আজ সারা ভারতবর্ষে নিরীহ তীর্থযাত্রীদের ধন-প্রাণ সাধুর বেশধারী পাষণ্ডদলের অত্যাচারে বিপন্ন। এদের নিয়ে ধর্মরাজ্য স্থাপনের কল্পনা, আকাশকুসুম কেশবানন্দ। কেশবানন্দ, এতবড় রাজেন্দ্র গিরি গোস্বামী, তাঁর শক্তি অর্থের বিনিময়ে তিনি আজ বিক্রি করছেন, ধর্মপক্ষ অধর্মপক্ষ বিচার পর্যন্ত করেন না। আজ যদি হিন্দু-স্থানের রাজশক্তি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের হাতে আসে, তবে ওই রাজেন্দ্র গিরি

গোস্বামীই তো প্রধান হবেন। অনুমান করতে পার, কেমন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে ?

কেশবানন্দ আশ্চর্য ধীরতার সঙ্গে কথাগুলি শুনলেন, তারপর বললেন, শুনুন গুরু মহারাজ, আমি আপনাকে বলি। আপনি ধর্মনীতি জানেন, রাজনীতি জানেন না বা বোঝেন না। রাজেন্দ্র-গিরি গোসাঁইরা শক্তিমান দুর্ধর্ষ ; ওরা লড়াই করে, লড়াই জিততে জানে। কিন্তু ওরা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আজ দিল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখুন, বাদশাহের আমল চলে গিয়েছে। উজিরের আমল এসেছে। মুরশিদাবাদের হাজী আহম্মদের দিকে তাকান। গুরু মহারাজ, শিষ্যকে গুরুর আদেশ মানতে হয়, গুরুকেও শিষ্যের পরামর্শ শুনতে হয়। আমার পরামর্শ শুনুন। অন্যথায়, গুরুর অভিশাপ যেমন শিষ্যকে লাগে শিষ্যের অভিশাপও ঠিক তেমনি ভাবেই ক্রিয়া করে গুরুর উপর। আজ আমরা প্রতিটি শিষ্য একমত। আমাদের অনুরোধ রাখুন, পরামর্শ শুনুন, না হলে—

তার চোখের দিকে তাকিয়ে শঙ্কিত হলেন মাধবানন্দ। প্রচ্ছন্ন আগুন যেন দৃষ্টির উত্তাপে আভাস দিচ্ছে। কথা অসমাপ্ত রেখেই স্তব্ধ হয়েছিলেন কেশবানন্দ। মাধবানন্দ সেই কথাটি ধরেই প্রশ্ন করলেন, না হলে গুরুবধেও তোমরা নিরস্ত হবে না ?

—না, সে পাপ করব না। আপনাকে পঙ্গু করে খেলার পুতুলের মত সামনে ধরে রেখে আমরা কাজ করে যাব।

—আমাকে বন্দী করবে ?

—বন্দী নয়। অসুস্থ মতিভ্রান্ত গৃহকর্তাকে যে যত্ন এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে সর্বদাই চোখে চোখে রাখতে হয়, তাই রাখব। ভোরবেলা আপনি ফিরে এসে যখনই আশ্রমে প্রবেশ করেছেন, তখন থেকেই সেই যত্নে সেই ভাবেই আপনি আছেন গুরু মহারাজ।

এবার মাধবানন্দ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লক্ষ্য করলেন, দুটি তরুণ শিষ্য দুই দিকে নিস্পৃহের মত সামনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তারা যে অতি সতর্ক তাতে সন্দেহ নেই।

কেশবানন্দ আবার বললেন, আপনি আগুন জেলেছেন। সে আগুন

যখন জ্বলেছে তখন তার গতি নির্ধারিত হবে বায়ুর দ্বারা, তার সম্মুখে বিস্তৃত দাহ্যবস্তুর পরিমাণের দ্বারা। গুরুমহারাজ, আজ এ উদ্যমকে ঠেকাবার শক্তি কারুর নাই। চারিদিকে আয়োজন শুরু হয়েছে। এ আয়োজন মহাকালের অভিপ্রায়। বর্ষায় যেমন সকল বীজ অঙ্কুরিত হয়ে সবলে মাটি ঠেলে ওঠে, তেমনি ভাবে এর অভ্যুদয় হচ্ছে। শুনুন, ওপারের সুপুরে আনন্দচাঁদ গোস্বামী—সামান্য একজন বৈষ্ণব গুরু, সেও গড় তৈরি করছে। আমাদের আজ আপনি নিবৃত্ত হতে বলছেন কিন্তু যেদিন রাধাকে নির্বাসিত করে শুধু কংসারিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, হাতের বাঁশি ফেলে দিয়ে চক্র এবং অসি হাতে দিয়ে তাঁকে ভজনা করতে বলেছিলেন, সেদিন এ-কথা ভাবেন নি কেন ?

—কংসারিকেও পরিশেষে প্রভাসে যদুবংশ-ধ্বংস স্বচক্ষে দেখতে হয়েছিল কেশবানন্দ।

—উপায় নাই গুরু মহারাজ, দেখতে হয় দেখব; কিন্তু কংসারিকে যখন ভজনা করেছি তখন কুরুক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর আমাদের হতেই হবে।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ ॥

কেশবানন্দ যে সংবাদ পেয়েছেন সুপুরের আনন্দচাঁদ গোস্বামীর গড় তৈয়ারি সম্পর্কে, সে সংবাদ মিথ্যা নয়। সংবাদটা এখনও সকল লোকে জানে না। যারা গড়ের গড়নকাজ দেখেছে তাদের মধ্যেই সন্দেহ উদ্রিক্ত হয়েছে, যেন 'গড় গড়' মনে হচ্ছে।

আনন্দচাঁদ নব-বৃন্দাবন তৈরি করাচ্ছিলেন। যমুনা-পুলিন, দ্বাদশ-বন, গিরি-গোবর্ধন, রাস-মঞ্চ, দোল-মঞ্চ, ঝুলন-মঞ্চ ইত্যাদি বৃন্দাবনের অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভবনগুলি প্রকট করবার আয়োজন করেছেন অনেক দিন থেকেই। রাস-মঞ্চ, ঝুলন-মঞ্চ, দোল-মঞ্চগুলি তৈরি হয়েছে প্রথমেই। এখন তৈরি হচ্ছে যমুনা-পুলিন এবং ঘাটগুলি ; লম্বা নদীর আকারের ঝিল কাটা হচ্ছিল এবং চারিপাশে চারটি সিংহদ্বার তৈরি হচ্ছিল। হঠাৎ লোকের একদিন চোখে পড়ল যে, ঝিল-কাটা মাটিগুলি থেকে যে পাড় তৈরী হয়েছে, সে পাড় আর গড়বন্দীর পগার অর্থাৎ মাটির তৈরী সুদৃঢ় গড়বেষ্টনীতে কোন তফাত নেই। এবং সেই বেষ্টনীর উপর এমন ঘন করে গাছের ডাল কেটে লাগানো হয়েছে যে, আগামী দুটো বর্ষার জল পেয়ে ডালগুলি সজীব বৃক্ষে পরিণত হয়ে দুর্ভেদ্য বৃক্ষবেষ্টনীতে পরিণত হবে। মানুষ দূরের কথা, সে বেষ্টনী পার হয়ে শেয়াল-কুকুরও ঢুকতে পারবে না। তীর দূরের কথা, বন্দুকের গুলিও সে বেষ্টনী ভেদ করতে পারবে না। এবং চারপাশে যে চারটি ফটক তৈরি হচ্ছে তার চেহারাও ঠিক গড়ের ফটকের চেহারা নিচ্ছে। তবে এটা এখনও ঠিক, সর্বসাধারণের চোখে ঠেকবার মত গড়ন নেয় নি। যারা হাতেমপুর রাজনগর প্রভৃতি গড়ের চেহারা দেখেছে, তাদের মধ্যে যারা চতুর বুদ্ধিমান, তারাই এটা ধরতে পেরেছে।

দু-একজন এ নিয়ে একটু খোঁজখবরও করেছে। তাতে তারা যা শুনেছে, সে শুনে তারা বিস্মিত না হয়ে পারে নি। তারা শুনেছে যে, আপনা-আপনি অর্থাৎ যারা কাজকর্ম করছে হাতে-হাতিয়ারে, তাদের অজ্ঞাতসারেই এমনি চেহারা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আঁকাবাঁকা ঝিল কেটে মাটি ফেলে পাড় তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেল যে, ঠিক গড়বন্দীর পগার হয়ে গেছে। ফটক তৈরি করতে গিয়ে রাজমিস্ত্রীদের অজ্ঞাতসারেই গড়ের ফটক হয়ে যাচ্ছে।

আনন্দচাঁদ বলেছেন, শ্যামসুন্দরের অভিপ্রায়ে হচ্ছে। কী অভিপ্রায় এখনও বলেন নি।

আনন্দচাঁদের কথায় অবিশ্বাস করবে কে? গোস্বামী এ অঞ্চলে সিদ্ধপুরুষ বলে সুপরিচিত। গৃহস্থ বৈষ্ণবদের সর্বপ্রধান গুরু, মাথার মণি। বিচিত্র মানুষ। যুগলভাবের উপাসক, ভাবুকচূড়ামণি রসিকদের মহাজন অথচ নারী-সংস্পর্শহীন ব্রহ্মচারী, অকৃতদার। বিপুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী, অথচ নিরাসক্ত সন্ন্যাসী। বিষয় তাঁকে অর্জন করিতে হয় না, বিষয় তাঁর কাছে এসে প্রায় আত্মসমর্পণ করে। এ অঞ্চলের গৃহস্থ বৈষ্ণবদের যারা সন্তানহীন বা নিকট-উত্তরাধিকারীহীন, তাদের অন্তে তাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন আনন্দচাঁদ। তাদের পারলৌকিক ক্রিয়ারও দায় তাঁরই। তাঁর এ অধিকার বৈষ্ণব গৃহস্থ-সম্প্রদায়ই দিয়েছে। লোকের বিশ্বাস, আনন্দচাঁদ যাদের পারলৌকিক ক্রিয়া করেন, তাদের সংসার-জীবনের কর্ম যাই হোক না কেন, মোক্ষ তাদের অবধারিত। এমন অনেক ভক্ত আছে যারা নিঃসন্তান হয়েই মৃত্যু কামনা করে, যাতে তার পারলৌকিক ক্রিয়ার দায় আনন্দচাঁদের উপর গিয়ে পড়ে। এই ভাবেই আপনা থেকে বিপুল বিষয় আনন্দচাঁদের হাতে এসেছে। সে-বিষয় আনন্দচাঁদ তাঁর উপাস্য দেবতা শ্যামসুন্দরকে সমর্পণ করেন, তাঁরই সেবক হিসাবে পরিচালনা করেন—নিজে নিরাসক্ত সন্ন্যাসী।

বাউল-বৈরাগীদের এই অধিকার ছিল ইলামবাজারের প্রেমদাস মহান্তের। এখন তার উত্তরাধিকারিণী কৃষ্ণদাসী মা-জীর।

এ নিয়ে প্রেমদাস মহান্তের সঙ্গে আনন্দচাঁদের একটা নাকি আপোস-

মীমাংসা হয়েছিল। সে অনেক দিনের কথা, পঁচিশ বছর পূর্বের কথা। অবশ্য সবই লোকের কথা। লোকপ্রবাদ।

তখন বৈষ্ণবতন্ত্রে সাধনকামী বহু লোক সিদ্ধ পুরুষ বাউল বৈরাগী প্রেমদাস বৈরাগীর কাছে যারা দীক্ষা নিত বা সাধন ভজন শিক্ষা নিত, তাদের উপর এবং এই বাউলদের উপর ব্রাহ্মণ গুরু গোসাঁইরা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। যারা দীক্ষা নিত তাদের পতিত করবার বিধানও তারা জারি করেছিল, কিন্তু জাতহীন কুলহীন বাউলদের কী করবে তারা? ওদিকে পরকীয়া-মতে বিশেষ তন্ত্রে সাধন-ভজনের স্রোত এমনি প্রবল যে, এ বিধান সত্ত্বেও গোপনে প্রেমদাসের গুরুগিরি প্রায় অবাধে চলত। ব্রাহ্মণেরা অনেক-কিছু নতুন মতের প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা অর্থাৎ গুরু-পেশাধারী ব্রাহ্মণেরা বাড়িতে প্রায় হাট বসিয়ে দেবতার সেবা বসিয়ে দিয়েছিলেন। একটি খড়ো আটচালা নাটমন্দিরের চারিদিকে কালী দুর্গা শিব রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন করে ফুল বেলপাতা তুলসীপত্র আতপ চাল এবং গুড় দিয়ে যথাসাধ্য পূজার ব্যবস্থা করলেন। নিজে শাক্ত শৈব বৈষ্ণব যে মন্ত্রের উপাসক হোক, যে-কোন মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তাদের ছিলই, এবার সে ব্যবস্থাকে ফলাও করে প্রায় বীজমন্ত্রের ব্যবসা খুলে দিল।

প্রেমদাস হেসে বলত, বামুন মশায়রা খেয়া ঘাট ডাক নিয়েছেন গো। কড়ি দিয়ে মন্তর নিলেই লায়ের জায়গা কেনা হয়ে যাবে। বছরে বছরে পেনামী আর ছেরাদ্দের সময় গুরুবরণ সুখশয্যে দিয়ো, তা হলেই ওপারে নন্দনকাননে মৌরুসী পাট্টা কেনা হয়ে যাবে।

ব্রাহ্মণেরা, বিশেষ করে শাক্ত ব্রাহ্মণেরা অট্টহাসি হাসতেন। বলতেন, পটোদের পট দেখেছিস? নরকের সাজা? ন্যাড়ানেড়ীদের গরম তেলে ফেলে ভাজবে। সশব্দে বলতেন, ছ্যাক—কলো কলো। ওপথে ওই গতি।

শুধু ব্যঙ্গ-রহস্যেই এমন বিষয়ের শেষ হয় না। মানুষের অন্তরের তৃষ্ণা অকৃত্রিম, সে সুরায় মেটে না, সে শরবতেও মেটে না। সে জলধারার উৎসের জন্য ব্যাকুল। সেই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণ-গুরুরা শাস্ত্রের নজির দেখিয়ে শিষ্যের রাশিনক্ষত্র বিচার করে, চরিত্র এবং রুচি বিচার করে

তদনুযায়ী বীজমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন এবং ভরসা দিয়ে বিশ্বাস করতে বলছেন, এই নির্মল জল। অধিকাংশ জলই অশ্বত্থমার পিটুলি গোলা জল। পান করে দুগ্ধপানের স্বাদ পেয়েছে বলে বিশ্বাসও করেছে। সুপুরের ভট্টাচার্য-বংশ বিখ্যাত গুরুবংশ। এই বংশের ব্রজমোহন ভট্টাচার্য সিদ্ধ শক্তিসাধক। পাগল মানুষ। তিনি নিজে কাউকে দীক্ষা দেন না। কিন্তু কেউ তাঁদের পাটে মন্ত্রদীক্ষা নিতে এলে তিনি বীজ বিচার করে দেন অলৌকিক উপায়ে। তিনি বলেন, যা, ওই বাড়ির পিছনে পুকুরপাড়ে গিয়ে দেখ্, জবার গাছ আছে। যা তুলে আন্। ঢেকে আনবি। যেন আলো না লাগে। বুঝলি ?

সে ফুল তুলে নির্দেশমত ঢাকা দিয়েই নিয়ে আসে। ক্ষ্যাপা ভটচাজ বলেন, খোল্ ব্যাটা, ঢাকা খোল্, দেখি।

খুললে দেখা যায় কারুর জবাফুল জবাফুলই আছে। সে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা পায়। কিন্তু কারুর জবাফুল মালতীফুল হয়ে যায়। কারুর হয়ে যায় ধুতুরা। যার ফুল মালতী হয় তাকে নিতে হয় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা। যার হাতে জবা হয় ধুতুরা—তার ইষ্ট হল শিব।

এ ছাড়া আরও আছে—কোষ্ঠি বিচারে ত্রিপাপ প্রভৃতি দুঃসময়ে গ্রহ-শান্তি যাগের ব্যবস্থায় নবগ্রহের শক্তি দেবতা দশমহাবিদ্যার নবমহাবিদ্যার অর্চনা ছাড়া গ্রহযাগ হয় না। সে সব সময়ে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ছাড়া গতি থাকে না। এর ফলে বৈষ্ণব ধর্মের যতই প্রসার থাক্, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের প্রভাব ছিল অব্যাহত। কাজেই তান্ত্রিকদের কাছে বৈষ্ণবদের খাটো হয়ে থাকতে হত।

লোকে বলে, এই অঞ্চলে বৈরাগীদের ও বৈষ্ণব-গুরুদের সঙ্গে ব্রাহ্মণগুরুদের বিরোধ মিটিয়ে দিয়েছিলেন আনন্দচাঁদ।

আনন্দচাঁদেরা পুরুষানুক্রমে সুপুরের ভটচাজ-বংশেরই শিষ্য। এবং তাঁরা শক্তিমন্ত্রের উপাসক ব্রাহ্মণবংশ। এই বংশের সন্তান আনন্দচাঁদ জন্ম থেকেই অসাধারণ। রূপে অসাধারণ, অপরূপ রূপবান। তেমনি সুকণ্ঠ, তেমনি মেধা। প্রকৃতিতেও তেমনি অসাধারণ, এমন কি দেহপ্রকৃতিতেও। মাছ-ভাতের দেশ বাঙাল দেশের শাক্তবংশের ছেলে, সেই ছেলের জন্মাবধি অরুচি

আমিষে, এমন কি মাছের সংস্পর্শদুষ্ট খাদ্য পেটে গেলে আনন্দচাঁদ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বাল্যকাল থেকেই ধর্মে আসক্তি আনন্দচাঁদের। ভালবাসতেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি।

উপনয়নের পর দীক্ষার জন্য গিয়েছিলেন খোদ ব্রজমোহন ভট্টাচার্যের কাছে।

ক্ষ্যাপা ভটচাজ আনন্দচাঁদকে দেখে খুব খুশী হয়ে কাছে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, ওরে—ওরে—ওরে, তোর গলায় পৈতে ক্যানে রে! অ্যাঁ? তুই তো দ্বাপরে ছিলি গোয়ালিনী, তুই তো রাধা রে। নতুন সাধন করতে এসেছিস এ জন্মে।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন আনন্দচাঁদ।

ভটচাজ বলেছিলেন, তোর মনে নাই। তুই কুঞ্জবনে কালার সঙ্গে পীরিত করেছিলি, কুটিলে তোকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে বলে আয়ানকে ডেকে নিয়ে এল। তুই বললি—কী হবে কালাচাঁদ? কালাচাঁদ বললে—ভয় কী? আমি কালী হচ্ছি, তুমি আমাকে পূজা কর। কালা হলেন কালী, মালতীমালা হল জবার মালা, শ্বেতচন্দন হল রক্তচন্দন। দেখে শুনে আয়ান খুশী হল! রাধার মান বাঁচল। কিন্তু তার মাশুল দিতে হবে তো! এ জন্মে তোকে কালীকে কালা করতে হবে রে। জবাফুলকে মালতীফুল করতে হবে। হ্যাঁ, দীক্ষা তোকে আমি নিজে দোব। এই কালী-মন্ত্রে। সাধনা করতে করতে একদিন সামনে দেখবি, কালী হলেন কালাচাঁদ; শক্তিবীজ হয়ে যাবে বৈষ্ণববীজ। ভয় নাই রে, ভয় নাই। পনের আনা হয়ে আছে, বাকী এক আনা—আপনি হবে রে, আপনি হবে। কালীর সামনে আসন করে বসলেই বুকের ভেতরটা খালুবালু করবে, টনটন করবে, চোখ থেকে জলের বান ডাকবে; সেই জলের অভিষেকে কালী হবেন কালা। মুণ্ডমালা হবে বনমালা। জবার মালা হবে মালতীর মালা, অঙ্গের রক্তের দাগ ধুয়ে যাবে। বোস্ রে বেটা, বোস্। দিয়ে দি কানে ফুঁ। জয় কালী—জয় কালী—জয় কালী।

আনন্দচাঁদকে তিনি শক্তিমন্ত্রেই দীক্ষা দিয়েছিলেন। আনন্দচাঁদ বলতে পারেন নি, না না। আমাকে বৈষ্ণব যুগলমন্ত্রে দীক্ষা দাও।

কঠিন মর্ম-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল আনন্দচাঁদকে। মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে উঠতেন ঘুমের ঘোরে। সেই মর্মযন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি গিয়েছিলেন বৈরাগী বাউল সাধক প্রেমদাস মহান্তের কাছে। গিয়ে তিনি ভুল করেছিলেন। প্রেমদাসের সিদ্ধি ছিল যোগিনী-বিদ্যার সিদ্ধি; শুদ্ধ ভগবৎসাধনার সিদ্ধি থেকে সেই সিদ্ধি নীচের স্তরের সিদ্ধি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ তখন, তখন ডাকিনী যোগিনী পিশাচ প্রভৃতি নানান ধরনের সাধনা ও সিদ্ধির বিশ্বাস এবং অস্তিত্ব বিপুল এবং প্রবল। প্রেমদাস আনন্দচাঁদের মত এমন সর্বসুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে, বিশেষ করে তান্ত্রিক ভট্টাচার্যের শিষ্যকে, মন্ত্রভিক্ষার্থী হিসেবে পেয়ে আনন্দে উল্লাসে দু হাত তুলে নেচেছিল এবং আনন্দচাঁদকে যোগিনী-বিদ্যা দিয়ে এক রাত্রের সাধনায় সিদ্ধি পর্যন্ত পাইয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, জয় গুরু! জয় গুরু! তোমার জন্যেই তো বসে আছি গো—পরমধন নিয়ে। দোব—আজই দোব। এই রাত্রেই দোব। শ্যামা শ্যাম হবে চোখের পলকে—ভাবনা কিসের?

দিন দেখে নি, ক্ষণ দেখে নি, আনন্দচাঁদকে দীক্ষা দিতে বসে গিয়েছিল। শ্যামামূর্তি সত্যসত্যই নটবর বংশীধারী শ্যামরূপে প্রকট হয়েছিলেন আনন্দ-চাঁদের চোখের সম্মুখে। কিন্তু শুধু শ্যাম, পাশে রাধার প্রকাশ হয় নি।

আনন্দচাঁদ বলেছিলেন, রাধা কই মহান্ত? রাধা?

মহান্ত বলেছিলেন, তাই তো ঠাকুর!

ভটচাজ বলতেন, প্রেমদাস ডাকিনী-সিদ্ধি প্রভাবে শ্যামামূর্তিকে শ্যাম-বিগ্রহে রূপান্তরিত করেছিল। ডাকিনী-সিদ্ধির প্রভাবে অলৌকিক অনেক কিছু ঘটানো যায়, কিন্তু আসলে তা 'মায়া'র খেলা মাত্র; সত্য নয়।

শেষ পর্যন্ত প্রেমদাস নিজেই এ-সত্য স্বীকার করে বলেছিল, ঠাকুর, এর পর তোমাকে সাধন করে আসল সিদ্ধি পেতে হবে। আমি তোমাকে ডাকিনী-সিদ্ধি দিয়েছি। আর এর সঙ্গে যদি বামুনের জাত পৈতে সব ফেলে দিয়ে আমার মত ন্যাড়া বৈরেগী বৈরেগিনী নিয়ে ভজন করতে পার—

আনন্দচাঁদ তা পারেন নি। মুহূর্তে শ্যাম আবার শ্যামা হয়ে উঠেছিল। তিনি সভয়ে আসন ছেড়ে উঠে বলেছিলেন, না। না। না।

প্রেমদাস বলেছিল, এঃ, ন্যাংটা মেয়ের ভূতো ছেলে ভটচাজ বামুন মুড়ো

মেরে দিয়েছে। বামুনের সাধন মোক্ষম বাবা। এ একদিনের কাজ নয়; সময় লাগবে। তুমি ভেক নিয়ে বৈরেগী হয়ে এইখানে থাক—মন্তর-তন্তর দেব-দেবী বাদ দাও। মালাচন্দন করে বৈরেগিনী নিয়ে শুরু কর—

আনন্দ বলেছিলেন, না। তখন তাঁর সম্বিত ফিরেছে।

প্রেমদাস তখন বলেছিল, তা হলে ঠাকুর, আমার দোষ নাই। তোমার অদেষ্ট। কিন্তু আমার কাছে যা হোক কিছু পেলে তো, তা তার দক্ষিণে তো আমার পাওনা বটে।

আনন্দ বলেছিলেন, বল, কী চাও?

প্রেমদাস বলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি গো, তুমি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গুরু হবে বৈষ্ণব সমাজে। বল, আমাদের বাউলদের ওপর তুমি বিধেন দেবে না। বাক্যি দাও।

আনন্দ বলেছিলেন, দিলাম।

—বল গোসাঁই, আমাদের বৈরেগী-বৈরেগিনীরা যা করবে তা নিয়ে দেশের মাঝে দশে যে রটনাই করুক, তুমি কিছু বলবে না। ঠাকুর, মনসার কথার সেই কথা গো—যা গেল দেখবে তা মুখে বলবে না কোন লোকে, স্বগ্যে মত্তে পাতালে কোনখানে, কারুর কাছে। দেবতা পাপ বলুক, মানুষ পাপ বলুক, দৈত্যি পাপ বলুক, তুমি বলবে না।

—বলব না।

—আমাদের পাওনায় আমাদের পথে আমাদের ঘাটে আমাদের হাটে তুমি হাত বাড়াবে না।

—বাড়াব না।

—বাস্‌। তোমাকে যা দিয়েছি তা তোমার পারের কড়ি না হোক, ভবের হাটের মূলধন হবে বাবা।

সিদ্ধ তান্ত্রিক ব্রজ ভটচাজের কাছে এ সংবাদ অগোচর থাকে নি। সেই রাত্রেই তিনি ধ্যানযোগে জেনেছিলেন। পরের দিন প্রত্যুষে আনন্দচাঁদ ক্লান্ত দেহমন নিয়ে গ্রামে ফেরবার পথে ভটচাজ পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন, বলেছিলেন, করলি কী? ওরে ব্যাটা, এ তুই কী করলি? যোগিনী-সিদ্ধি পেয়ে পূর্ণসিদ্ধির পথে কাঁটা দিলি? ছি ছি ছি! তুই পনর আনা

নিয়ে জন্মেছিলি। আমি তোকে দীক্ষা দিয়ে পনর আনা তিন পয়সা করে দিয়েছিলাম রে ব্যাটা। শোন্ রে ব্যাটা। ওই বৈরেগী ব্যাটার যোগিনী-মন্ত্র নিয়ে তুই জাদুবিদ্যা পেয়েছিস—যা কালীর কালা হাওয়া দেখেছিস সে হল ভেল্কীবাজি। ওতে আমি যে তিন পয়সা তোকে দিয়েছি তার এক পয়সা তুই হারিয়েছিস। এই ঘাটতি দু পয়সার এক পয়সা যদি বা তুই সাধনভজনে পূরণ করতে পারিস, এক পয়সা ঘাটতি তোর থেকেই যাবে এ জন্মে। শোন্, তোর ষোল আনার পথে দুটো 'রা'য়ের কাঁটা ছিল। এক রাধা আর এক রাজ্য। মেয়ে আর মাটি। তা তোকেই 'রাধা' বলে মন্ত্র দেবার সময় মেয়ের বাধা আমি ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওদিকে তোর মন কিছুতেই যাবে না, ভুলবে না। কিন্তু 'মাটি' 'রাজ্য' তোর পথের এমন কাঁটা হয়ে রইল যে, কাঁটা এ জন্মে ঘুচবে না। যে জাদুমন্ত্র যেচে নিয়েছিস সেই মন্ত্রই মাটি এনে তোকে মালিক করে দেবে। শোন্ আরও বলি—

ভটচাজের কথা মিথ্যা হয় নি। আনন্দচাঁদের অলৌকিক শক্তির খ্যাতি কিছুদিনের মধ্যেই এমনভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, বৈষ্ণবমন্ত্র-অভিলাষী গৃহস্থ-সম্প্রদায় দলে দলে তাঁর পায়ে এসে গড়িয়ে পড়ল। অলৌকিক শক্তির প্রকাশ আনন্দচাঁদ ইচ্ছে করে দেখাতেন না, কার্যকলাপে ঘটনা-সংস্থান এমনিই হয়ে উঠত যে প্রকাশে তিনি বাধ্য হতেন। তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ; মন্ত্রসিদ্ধির যুগ ; সে যুগে আনন্দচাঁদের সিদ্ধবিদ্যা নিষ্ক্রিয় সুপ্ত থাকবার নয়, থাকেও নাই।

প্রথম খুসটিকুরির সিদ্ধ পীর সৈয়দ হোসেন সাহেব তাঁকে উপঢৌকন দিতে মাংস নিয়ে এলে আনন্দচাঁদ সেই রক্তসিক্ত মাংসকে রক্তরাঙা গোলাপ-ফুলে পরিণত করে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রকাশে বাধ্য হন। এ ছাড়া তাঁর উপায় কী ছিল ?

ভটচাজ তখনও বেঁচে, তিনি হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, ওরে, সাপ যতই লুকিয়ে রাখ্, ফোঁস সে করবেই। সাপের ওঝা সাপ না ধরেও থাকতে পারে না, কামড়ও খায়, মরেও ওতেই।

এর পরই ঘটে আর-একটি ঘটনা। যে ঘটনায় আনন্দচাঁদের জীবনের পথ এবং গতি নির্দিষ্টরূপে নির্ধারিত হয়ে যায়। আনন্দচাঁদ গিয়েছিলেন

মকর-সংক্রান্তিতে কেন্দুলীতে কদমখণ্ডীর ঘাটে অজয়ের প্রবাহের ধারে গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য। বহু জন-সমাগমের মধ্যে এসেছিলেন এক সন্তানহীনা তরুণী বিধবা ধনী-গৃহিণী। সাতাশ-আটাশ বছর বয়সের সুন্দরী। এই গৃহিণীটির সমাজে খুব সুনাম ছিল না। না-থাকারই কথা। বিবাহ হয়েছিল বৃদ্ধ ধনীর সঙ্গে, বৃদ্ধের চতুর্থ পক্ষে। বৃদ্ধের বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি সন্তানের। সন্তান একটি হয়েছিল। তার পরই বৃদ্ধ গত হন। বিধবাই হন পুত্রের মাতা হিসাবে সম্পত্তির একচ্ছত্রাধিকারিণী। তার পরই এই তরুণ বয়সের প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং সম্পত্তির প্রভাবে শক্তির মত্ততায় প্রায় স্বেচ্ছাচারিণী হয়ে ওঠেন। ফল পেতেও দেরি হয় নি, পাঁচ বৎসরের সুন্দর ছেলেটি মারা যায়। লোকে ভেবেছিল, এই আঘাতে তাঁর চৈতন্য হবে; কিন্তু আশ্চর্যের কথা ফল হয়েছিল বিপরীত। বিধবাটি যেন বন্ধনহীন হয়ে স্বেচ্ছাচারে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি এই ধরণের মেলায় তীর্থে যেতেন বিপুল সমারোহ করে, উদ্দেশ্য পুণ্য সঞ্চয় নয়, প্রমত্ততার ঘূর্ণাবর্তে অবগাহন করা। জয়দেবের মেলায় আনন্দচাঁদকে দেখে তিনি উন্মত্ত হয়ে উঠে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। আনন্দচাঁদ একটু হেসে বলেছিলেন, আমি তো যেতে পারব না, তাঁকে আসতে বল এইখানে। প্রমত্তা বিধবা তাই এসেছিলেন এবং এসেই স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, গোপাল—আমার গোপাল—ওরে গোপাল! দুই হাত বাড়িয়ে আনন্দচাঁদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কে? তুমি? আমার গোপাল কই? আমার গোপাল?

প্রবৃত্তি-প্রমত্তা বিধবা আনন্দচাঁদের কাছে এসে তাঁর মধ্যে দেখেছিলেন তাঁর মৃত সন্তানকে। মনে হয়েছিল তাঁর পাঁচ বছর বয়সের সেই সন্তানটি বসে আছে। দু হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে এসে দেখলেন, কোথায় গোপাল? গোপাল নয়, বসে আছেন আনন্দচাঁদ।

আনন্দচাঁদ হেসে বলেছিলেন, কেন মা, এই তো আমি তোমার গোপাল

বিধবা আবার আনন্দচাঁদের মধ্যে তাঁর মৃত সন্তানকে দেখেছিলেন। এবং এর পর আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন আনন্দচাঁদের পায়ের উপর। চোখের

জলে ভেসে গিয়েছিল বিধবার প্রবৃত্তির তাড়না। দুটি পা ধরে স্বীকার করেছিলেন জীবনের সকল পাপ।

আনন্দচাঁদ বলেছিলেন, সব পাপ তো চোখের জলে ধুয়ে আমার পায়ে ঢেলে দিলে, আবার ভয় কী?

বিধবা বলেছিলেন, আবার যদি সেই মতি জাগে?

—জাগবে না। আমি তোমায় মন্ত্র দেব। সেই মন্ত্রজপে রক্ষা পাবে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বিধবা বলে উঠেছিলেন, না না না।

—কেন?

—আমার গোপালকে তো তা হলে দেখতে পাব না তোমার মধ্যে! তুমি যে আমার গুরু হবে!

—তবুও পাবে। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি।

—তা হলে আর এক শর্ত করতে হবে। আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি তোমাকে নিতে হবে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সুখে চোখ বুজব, জেনে যাব, আমার ধন আমার গোপাল পেলে।

—নেব। কিন্তু আমার দেবতার নামে নেব।

—সে তোমার যা খুশি।

বিধবাকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়ে তাঁর পরলোকের ভার নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন আনন্দচাঁদ। সংবাদটা সেই দিনই সেই মেলার জনতার মারফতে দিকে দিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

ব্রজমোহন ভটচাজ হা-হা করে হেসেছিলেন। বলেছিলেন, আমি জানি, আমি জানি। মাটির চোরা বালিতে বেটার পা ডুববেই। ডুবল। শেষ পয়সা খামতি থেকে গেল, থেকে গেল, থেকে গেল—জয় কালী, জয় কালী, জয় কালী!

এ কথা কানে পৌছলে আনন্দচাঁদ চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। যে কর্ম তিনি করেছেন তার ফল তাঁকে পেতেই হবে।

সে ফল সারা জীবনই পেয়ে চলেছেন। আজ গৃহস্থ বৈষ্ণবদের গুরুর গুরু তিনি। উত্তরাধিকারীহীন গৃহস্থ বৈষ্ণবের সম্পত্তি আজ এসে তাঁকেই অর্সায়। ইষ্টদেবতা গোবিন্দের নামে তিনি গ্রহণ করেন। গোবিন্দের আজ বিপুল সম্পত্তি। ধর্মসাধনার সঙ্গে সে সম্পত্তিও তাঁকে পরিচালনা করতে

হয়। বাউল বৈরাগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তারপর আর তিনি সম্পর্ক রাখেন নি। তবে তাদের স্নেহ করেন। প্রেমদাস বাবাজীও তাঁর সম্প্রদায়কে দূরে দূরে থাকতেই বলে গেছে।

—তেলে জলে মিশ খায় না। ভুল আমারও, গোসাঁইয়েরও। তোরা আর ভুল করিস না। যাস না ওর কাছে, ওরও সহ্য হবে না, আমাদেরও না। তবে বামুন বৈরাগীর মন্তরে সিদ্ধ হলে রাজা হয়, দেখ্‌ চোখের ওপর। রাজদরবার গেরস্তের জন্যে, সম্পত্তিবানের জন্যে। আমাদের মত ভিখারীর জন্যে নয়।

*　　*　　*

সেইদিনই কেশবানন্দ চলেছিলেন এই আনন্দচাঁদের সঙ্গে দেখা করতে। বাস্তববাদী বুদ্ধিমান লালাতনয়টি আনন্দচাঁদ সিদ্ধপুরুষ কি না বিচার করেন নি। বিচার করে বুঝেছিলেন আনন্দচাঁদ শক্তিমান এবং বুদ্ধিমান। বিলম্ব তিনি করবেন না। হয়তো বিলম্ব ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু এর আগে কিছু করা সম্ভবপর ছিল না। সমস্ত সংবাদ তাঁকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। শুধু আনন্দচাঁদেরই নয়, এখানকার সকল বর্ধিষ্ণু লোকের নির্ভুল ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন এই চতুর রাজনীতিবিদ সন্ন্যাসী। এবং নারকেলের মত ছোবড়া ছাড়িয়ে খোলা ভেঙে তার শাঁস বের করার মত সমস্ত ইতিহাসের মর্ম উদ্‌ঘাটিত করে তার আসল সত্যটি আবিষ্কার করেছেন। এককালের চতুর রাজকর্মচারীটি জানেন, লোকেরা লৌকিক জীবনে যত দুর্বল যত অসহায় হয় ততই তারা অলৌকিককে আঁকড়ে ধরতে চায়। না হলে তারা বাঁচতে পারে না। অবশ্য ধর্মসাধনায়, দেবমহিমায় অবিশ্বাসী তিনি নন; কিন্তু তিনি জানেন সে বস্তু সিন্ধুপ্রমাণ জলের মধ্যে বিন্দুপ্রমাণের মতই দুর্লভ। সেই বিন্দু যখন সিন্ধুকে ব্যাপ্ত করে তাকে ছাড়িয়ে ওঠে—তার লগ্ন আছে সময় আছে। ত্রেতায় রামের আবির্ভাব, দ্বাপরে কৃষ্ণভগবানের আবির্ভাব ত্রেতা এবং দ্বাপরের এক খণ্ডাংশে। তার আগে চলে তাঁর আবির্ভাবের জন্য লোকের তপস্যা। কল্কীর আবির্ভাবের বিলম্ব আছে। তার পূর্বে সনাতন ধর্মকে রক্ষার জন্য লৌকিক চেষ্টার প্রয়োজন আছে। সে চেষ্টা শুধু ভগবানের নামে আর ধর্মের বিচারের আয়োজনে সার্থক কখনও হয় না। সেখানে বিষয়বুদ্ধি, রাজনৈতিক

চতুরতার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। আজ সময়ের গুণে রাজনৈতিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে মুসলমান শক্তি ভাঙছে; স্বাভাবিক ভাবে মুঘল বাদশাহী শক্তির চাপে যে সব শক্তি চাপা ছিল তারা উঠছে। মঠ, সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবে শাসন-শৈথিল্যের সুযোগে মাথা তুলছে।

হাতেমপুরের হাতেম খাঁ ফৌজদারের বিষয়বুদ্ধি ছিল। এ অঞ্চলের বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ রাঘব রায়কে দমন করে হাতেমপুরে গড় তৈরি করবার সময় এই সত্যটা সে বুঝেছিল। এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র একটি ঘটনার মধ্যে ভাবীকালের সংঘটনের আভাস অনুভব করেছিল। সেই কারণেই, এ অঞ্চলের মঠ-মহান্ত, ব্রাহ্মণ, গুরুদের উপর—হিন্দু জমিদারদের অপেক্ষাও সতর্কতর কঠিন দৃষ্টি রেখেছিল। কোনও অজুহাতে সে কোনও মঠে বা মন্দিরে গড়বন্দী শক্ত পাঁচিল তৈরি করতে দিত না, নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী পাইক রাখতে দিত না। হাতেম খাঁর মৃত্যুর পরই আনন্দচাঁদ গোস্বামীর নববৃন্দাবনের গড়ন বিচিত্রভাবে আপনা আপনি দ্বারকার যাদবপুরীর গড়ন নিচ্ছে। ঝিল হচ্ছে গড়খাই, পাড় হচ্ছে গড়বন্দীর বাঁধ। সিংহদ্বার তৈরী হচ্ছে চারটি। সিংহদ্বার স্তম্ভগুলির নীচে থেকে উপর পর্যন্ত যে বন্দুকধারী সৈন্যসন্নিবেশের সুচতুর ব্যবস্থা থাকবে, সে সম্পর্কে কেশবানন্দ নিঃসন্দেহ।

আনন্দচাঁদ সামান্য গৃহস্থ-সন্তান। আর মাধবানন্দ, তাঁর গুরু, জমিদার-সন্তান। আনন্দচাঁদ গৃহী সন্ন্যাসী হয়ে সম্পত্তি অর্জন করে যে সত্যটা বুঝেছেন, মাধবানন্দ সম্পত্তি বর্জন করার জন্যই সে সত্যটা বুঝতে পারছেন না।

কেশবানন্দ দাঁড়ালেন।

এখান থেকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন আনন্দচাঁদ গোস্বামীর নববৃন্দাবনের সংগঠন। হ্যাঁ। গোস্বামীর দূরদৃষ্টি আছে। গড়টি দৃঢ় হবে তাতে সন্দেহ নেই।

কেশবানন্দের সঙ্গী বললে, ওই যে আনন্দচাঁদ গোস্বামী। ওই আসছেন। এই দিকে।

কেশবানন্দ আজ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এসেছেন। সঙ্গে দুজন

আশ্রমবাসী ব্রহ্মচারী এবং গ্রামের চারজন পাইক সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। সঙ্গে আছে তাঁদের ধ্বজা। পাইকদের একজন দেখিয়ে দিলে সঙ্গী ব্রহ্মচারীকে। ব্রহ্মচারী কেশবানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।—এই দিকে। ওই আসছেন।

কেশবানন্দ দেখছিলেন গড়বন্দীর বাঁধ। চমৎকার হয়েছে। সঙ্গীর কথায় দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকালেন।

বাঃ, সুন্দর সুপুরুষ লোকটির মহিমা আছে।

আনন্দচাঁদ আসছিলেন, সঙ্গে একদল লোক—ভক্ত সম্প্রদায়।

কেশবানন্দ অগ্রসর হলেন। আনন্দচাঁদও তাঁদের ধ্বজা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি দাঁড়ালেন। কিছু বললেন দলস্থ লোকেদের। দল থেকে দুজন লোক তাঁদের দিকে এগিয়ে এল।

কেশবানন্দ হাত তুলে বললেন, জয়, কংসারি কাহ্নাইয়ালালকি জয়!

আনন্দচাঁদের লোকেরা বললে, জয় শ্যামসুন্দর!

কেশবানন্দ বললেন, গোস্বামী ঠাকুরের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছি। ওপারের কংসারি মঠ থেকে আসছি আমরা।

—আসুন আসুন। শ্যামসুন্দর আজ ভক্তের আগমনে তৃপ্ত হয়েছেন।

এরই মধ্যে একজন দ্রুতপদে এগিয়ে চলে গেল। সংবাদ দিল আনন্দচাঁদকে।

আনন্দচাঁদও অগ্রসর হলেন। কাছাকাছি হতেই সম্ভাষণ জানালেন, নমো নারায়ণায়!

প্রত্যাভিবাদনে নারায়ণকে প্রণাম জানিয়ে কেশবানন্দ বললেন, ত্রুটি স্বীকার করছি, অনেক পূর্বেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমাদের কর্তব্য ছিল।

হেসে আনন্দচাঁদ বললেন, কর্তব্য আমারই ছিল আগে। যেহেতু না আপনারাই এখানে আগন্তুক। বিশেষ করে কেন্দুলীতে সন্ন্যাসী ছদ্মবেশী বর্গীদের সঙ্গে আপনারা যে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন, তাতে তার পরদিন থেকেই নিত্য ভাবি আপনাদের আশ্রম দর্শন করে আসব। কিন্তু—

'কিন্তু' বলে চুপ করলেন আনন্দচাঁদ।

কেশবানন্দ বললেন, অতিথিকে আতিথ্যে কার্পণ্য অবশ্যই অধর্ম। কিন্তু

বিশ্বাস একটি কর্ম দেখেই করা যায় না। আপনার দোষ নেই গোস্বামী-গুরু।

—না। সে জন্য নয়। যেতে দ্বিধা হয়েছে এই হেতু মহারাজ যে, আপনারা শ্রীমতী রাধাকে নির্বাসিতা করেছেন।

—ধনুর্যজ্ঞের কাল সমাগত হলে শ্রীমতীকে পশ্চাতে রেখে প্রভুকে যেতেই হয় গোস্বামী-গুরু। ধনুর্যজ্ঞ শেষ হলে কুরুক্ষেত্র এগিয়ে আসে। আপনার বৃন্দাবনে দেখছি যাদবপুর দ্বারকার আয়োজন। এ পুরীতে হাতের বাঁশি প্রভু বাজাবেন কখন? চক্রই বা ধরবেন কোন্ হাতে?

কেশবানন্দের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আনন্দচাঁদ। কেশবানন্দ বললেন, তত্ত্বের কথা কইতে আমি আসি নি গোস্বামী-প্রভু। তত্ত্বে আমি পারঙ্গমও নই। সে কথা বরং কোনদিন আমাদের গুরুর সঙ্গে হবে আপনার। আমি এসেছি এইটুকু বলতে যে, রাত্রি তৃতীয় প্রহর সমাগত। শিবাসংকেত শুনতে পাচ্ছি। আমরা, যারা তীর্থযাত্রী, যে যে মন্দিরেই যাই না কেন, এ সময় আমাদের একসঙ্গে দল বেঁধে চলা উচিত নয় কি?

—আসুন, ভিতরে আসুন। এ আলোচনা তো পথে দাঁড়িয়ে হবে না।

—চলুন।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতে কাতর কণ্ঠে 'ঠাকুর!' 'ঠাকুর!' বলে ডাকতে ডাকতে কে এগিয়ে আসছিল। আনন্দচাঁদ ঘুরে দাঁড়ালেন। কে? কী চায়? ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর। এমনি একটি গুরুতর ভাবনায় মন যখন ব্যাপৃত এবং সেই গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য যে মুহূর্তে পা বাড়িয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্তটিতে পিছু-ডাকার মত এই ডাক তাঁর ভাল লাগল না। মুখ থেকে আপনি বেরিয়ে গেল, কী বিপদ!

কেশবানন্দ বললেন, আপনার কোন শিষ্যকে বলুন ওর আবেদন শুনতে। আর আমাদের আলোচনা অনেক পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে। ওর এ ডাকে তাতে বাধা হয় নি। চলুন।

আনন্দচাঁদ একজন শিষ্যকে ওই লোকটির আবেদন শুনতে আদেশ দিয়ে কেশবানন্দকে নিয়ে তাঁর পুরীমধ্যে প্রবেশ করলেন। কয়েকটি বাঁক ফিরে একটি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

যে লোকটি চিৎকার করে ঠাকুরকে ডাকছিল, সে কয়ো। কয়োর মত হতশ্রী মানুষের চেহারাও এমন বিপর্যস্ত, কাদায় ধুলায় তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এমনই বিকৃত ও বিচিত্রিত যে, তাকে চেনবার উপায় ছিল না।

উপায়ান্তরহীন হয়ে সে এসেছে আনন্দচাঁদ গোস্বামীর কাছে। কাল রাত্রে মা-জী অর্থাৎ কৃষ্ণদাসী নিরুদ্দেশ। কয়ো তার পিছন পিছন জয়দেব-কেঁদুলীর শ্মশান পর্যন্ত গিয়েছিল, সে মাধবানন্দকেও দেখেছিল, মা-জীর সেই উন্মাদিনী উলঙ্গিনী রূপ, তার সেই অভিশাপ দেওয়া, তাও দেখেছিল। তারপর সে তারই অনুসরণ করেই আসছিল। উলঙ্গিনী উন্মাদিনী আসছিল অজয়ের শীর্ণ জলধারার পাশে পাশে বালুচরের উপর দিয়ে। কয়ো সভয়ে দূরত্ব বজায় রেখে আসছিল তটের উপরের পথ ধরে। এরই মধ্যে অন্ধকারে হঠাৎ মাঝপথে কৃষ্ণদাসী কোথায় হারিয়ে গেছে। কয়ো অনেক খুঁজেও পায় নি। অবশেষে ভোরের সময় ক্লান্ত হয়ে ধুলোকাদা মেখে আখড়ায় ফিরে দেখেছে যে, আখড়াও শূন্য; মোহিনী নাই। আখড়ার দরজা খোলা, ঘরের দরজা খোলা, বিছানা জিনিসপত্র বিপর্যস্ত, মেঝের উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে, মোহিনীর হাতের চুড়ি-ভাঙার টুকরো সকালের আলোয় ঝিকমিক করছে। আশপাশের লোকের কাছে সন্ধান করেও সংবাদ পায় নি। কেউ দেয় নি। ওই সংবাদ না-দেওয়াতেই সে মোহিনীর সঠিক সংবাদ পেয়েছে, তাকে বর্বর অক্রূরের চরেরা চুরি বা ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই কয়ো ছুটে এসেছে আনন্দচাঁদ ঠাকুরের কাছে। আনন্দচাঁদ এখানকার গৃহস্থ বৈষ্ণবদের গুরুর গুরু। অক্রূর, অক্রূরের বাপ যত পাষণ্ডই হোক, নিজেদের তো বৈষ্ণব বলে! তোমার কথা অবশ্যই শুনবে। গোস্বামী ঠাকুর, মোহিনীকে রক্ষা কর—এই আবেদন জানাতে ছুটে এসেছে।

সে এসে টলতে টলতে বসে পড়ল সামনের ফটকে। ভাঙা কর্কশ কণ্ঠে ডাকলে, গোস্বামী ঠাকুর! ঠাকুর!

ঝড়ে-লাট-খাওয়া ভগ্নকণ্ঠ কাকের মতই তার সে কণ্ঠস্বর।

—ঠাকুর, তুমি রক্ষা কর অভাগিনীকে। ঠাকুর! ঠাকুর! ঠা-কু-র!

কেশবানন্দ এবং আনন্দচাঁদ তখন হিন্দুস্থানের রাজশক্তির প্রস্তর-কঠিন স্বরূপকে চোখের সামনে ধরে তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করছিলেন। চুলের মত অসংখ্য সরু দাগ দেখা দিয়েছে তার সর্বাঙ্গে। এই দাগগুলি ক্রমে ফাটলে পরিণত হবে। তারপর একদিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

কালস্য কুটিলা গতি। যদুপতির মথুরাপুরী আছে, কিন্তু সে যাদব-গৌরব নাই। রঘুপতির সূর্যবংশ-গৌরবও ভেঙে পড়ে। কালধর্ম।

—কিন্তু কালধর্ম পূর্ণ হয় প্রকট হয় মানুষের চেষ্টায় উদ্যমে। রাজা গিয়ে রাজা হওয়া তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সিংহাসন খালি থাকে না, পূর্ণ হয়ই। ধর্মের অভ্যুত্থানের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ পথ চাই গোস্বামী-গুরু। নদী অনেক নেমেছে পাহাড় থেকে। কিন্তু গঙ্গাজী যখন নামেন তখন স্বর্গ থেকে নামেন, তখন তাঁকে ধরবার জন্য রুদ্রের মাথা পাতার প্রয়োজন হয়। আজ সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। আমি আপনার অস্ত্র-সংগ্রহের ভার নিলাম। আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

ঠিক এই সময়টিতে কয়োর শেষ উচ্চারিত সর্বোচ্চ কণ্ঠের দীর্ঘায়িত 'ঠা-কু-র' ডাকের শব্দ বন্ধ দ্বার ভেদ করে ক্ষীণ হয়েই অবশ্য ভেসে এল, কিন্তু তার মধ্যেও কয়োর চেরা কর্কশ কণ্ঠস্বরের স্বরূপটি ঢাকা পড়ল না। তার সঙ্গে আরও ছিল মর্মান্তিক একটি আকুতি। তারই স্পর্শে চমকে উঠলেন আনন্দ-চাঁদ।—কে? এমন আকুতির সঙ্গে কে ডাকে? পরক্ষণেই একটু তিক্ত অথচ সকৌতুক ব্যঙ্গহাসি দেখা দিল তাঁর মুখে। বললেন, ও, ইলাম-বাজারের সেই ধর্মাধর্ম-জাতি-বিচারহীন উচ্ছিষ্টভোজী বৈরাগী পশুটা?

কেশবানন্দও কয়োর কণ্ঠস্বর চিনেছিলেন, তিনিও হাসলেন, বললেন, পশু নয়—পক্ষী। কউয়া।

আবার ডাক ভেসে এল, ঠাকুর গো!

আনন্দচাঁদ বন্ধ দুয়ারের দিকেই মুখ ফিরিয়ে ডাকলেন, বাইরে কে রয়েছে?

বাইরে থেকেই সাড়া এল, আমি প্রভু, দীনদাস!

আনন্দচাঁদ বললেন, ইলামবাজারের ওই লোভী বৈরাগীটাকে খাদ্য দিয়ে বিদায় কর। দেখ গত রাত্রের উদ্বৃত্ত খাদ্য কী আছে! চিৎকার করতে নিষেধ কর।

—করেছি প্রভু। কিন্তু ও সেজন্য চিৎকার করেছে না। খেতেও চায় না।

—খেতে চায় না? কয়ো? তবে কী চায়?

—কাল রাত্রে উন্মাদিনী কৃষ্ণদাসী—প্রেমদাস মহান্তের বেটার বউ কোথায় চলে গিয়েছে। খুঁজে—

—কী বিপদ! উন্মাদধর্মে কোথায় কোন্‌দিকে গিয়েছে, আবার আসবে। অবশ্য অপঘাত ঘটলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তার আমি কী করব?

—আরও আছে প্রভু। কৃষ্ণদাসীর কন্যাটিকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাত্রে আখড়ায় কারা ডাকাতি করে মেয়েটিকে নিয়ে চলে গিয়েছে। কয়ো বলছে, ইলামবাজারের দে-সরকারের ছেলে অক্রূর। তার উদ্ধারের জন্যেই ও এসেছে, বুক চাপড়ে কাঁদছে।

আনন্দচাঁদ মুহূর্তে যেন আগুনের মত জ্বলে উঠলেন। কী করবেন তিনি? প্রেমদাসের কাছে যে বাক্য দান করেছিলেন, সে বাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। কৃষ্ণদাসীর আচার-আচরণের কোন কথাই তিনি তো না-জানা নন। দে-সরকারের সঙ্গে সাধনভজনের নামে ব্যাভিচারের কথা তিনি জানেন, দে-সরকারের ওই বর্বর পুত্রটার জন্য কন্যাকে বিক্রি করার কথাও তিনি শুনেছেন। কিন্তু কোনদিন কোন শাসন করেন নি, কোন প্রশ্ন করেন নি, দু-চার জন বৈরাগী মহান্তও তাঁর কাছে এসে এর প্রতিবিধানের জন্য তাঁর সাহায্য চেয়েছে; কিন্তু তিনি নীরব থেকেছেন, সাহায্য করেন নি। এই পরিণাম কৃষ্ণদাসীদের অনিবার্য। তিনি কী করে নিবারণ করবেন?

কেশবানন্দ বললেন, ইলামবাজারের শেঠ দে-সরকার কি গোস্বামীপাদের শিষ্য?

—আমার ভক্তের শিষ্য। আমার নয়। পরক্ষণেই বিচিত্র হেসে বললেন, দে-সরকার বণিক। সে সর্বক্ষেত্রেই বণিক। গুরুর কাছে সে দীক্ষা নিয়েছে দক্ষিণা দিয়ে। দীক্ষা তার ধর্মের নামে ব্যাভিচারের জন্য। পাপ করে সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবে দীক্ষাবলে—এই ছলনায় নিজেকে ছলবার জন্য মহারাজ। গুরুকে এরা অর্থ দেয়, তাদের সর্ব কর্মে ধর্মে অধর্মে গুরুর সমর্থন পাবার জন্য। এদের আপনি জানেন না।

হেসে কেশবানন্দ বললেন, খুব জানি গোস্বামীপাদ। আপনার থেকেও

বোধ করি বেশী জানি। শুধু গুরু নয়, রাজা গুরু ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই ওদের এক সম্পর্ক। হাতেমপুরের হাতেম খাঁর সঙ্গে দে-সরকারের সম্পর্ক খুব নিবিড় ছিল। জয়দেবের মহান্ত মহারাজ আমাকে বলেছিলেন। যেদিন ওর ওই পাষণ্ড ছেলেটা ছদ্মবেশী বর্গী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কলহ করে আহত হয়, সেদিন আমাদের গুরু মহারাজের দিকে থুৎকার নিক্ষেপ করেছিল। আমি ভবেছিলাম, ওকে শাস্তি দেব। জয়দেবের মহান্ত বলেছিলেন, ওকে ঘাঁটাবেন না, হাতেম খাঁকে আপনাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে। আমরা শক্ত হয়ে বসতে পারি নি বলে চুপ করে গিয়েছিলাম। শুনেছি ওর নিজের পাইক-লাঠিয়ালের দলটিও নেহাত উপেক্ষার নয়।

আনন্দচাঁদ বললেন, ওকে আমি কঠোর সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করব। আর ওকে দণ্ড না দিলে ধর্ম বিরূপ হবেন।

কণ্ঠস্বর তাঁর গভীর ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে তখন।

কেশবানন্দ বললেন, এ সময়ে যা করবেন, গভীরভাবে বিবেচনা করে করবেন গোস্বামীপাদ। আপনার বৃন্দাবন দ্বারকা হয়ে উঠছে।

—মহারাজ, এ ঝিল এ গড় পুরনো কালের ভগ্ন কীর্তি। আমি কিনে দেবতার নামে সংস্কার করাচ্ছি মাত্র।

—তবুও বিবেচনা করবেন। যে কোনদিন কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার দশা অথবা ব্রজের গোবিন্দ-মন্দিরের দশা হতে পারে আপনার মন্দিরের। বিশেষ করে হিন্দু যদি হিন্দুর বিপক্ষে গোপন সংবাদ দেয়, তা হলে তার গুরুত্ব কত প্রচণ্ড হবে ভেবে দেখবেন।

আনন্দচাঁদ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন কেশবানন্দের দিকে।

কেশবানন্দ বললেন, সুজাখাঁ মৃত্যুর পূর্বে বীরভূমের বাকী রাজস্বের জন্য বীরভূম-অভিযানের সংকল্প করেছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা জামিন হয়ে লক্ষ টাকা পেস্কাস দিয়ে মিটমাট করে দিয়েছেন। বীরভূমের নবাবের এখন অর্থাভাব। এদিকে সুজাখাঁ গত হয়েছে, সরফরাজ খাঁ নবাব হবেন। এখন নজরানা ভেট পাঠাতেই হবে। এ সময়ে ফৌজদার নবাব, শিকার খুঁজছে, অজুহাত খুঁজছে। এর পর বিবেচনা করে দেখবেন সাবধানতার প্রয়োজন আছে কি না!

আনন্দচাঁদ ডাকিনী-বিদ্যা প্রভাবে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারেন, মানুষের ভবিষ্যৎও দেখতে পান ; কিন্তু এই ভাবে গোটা দেশের ভবিষ্যৎ কখনও দেখতে পান নি, অবশ্য দেখতেও চেষ্টা করেন নি।

কেশবানন্দ আবার বললেন, তা ছাড়া, মহাযজ্ঞে বহু বলি বহু আহুতির প্রয়োজন গোস্বামীপাদ। শুধু দেবতাই বলি আহুতি পান না, ভূত প্রেত পিশাচ রক্ষ এদেরও দিতে হয়। সাধনভ্রষ্টা একটা স্বৈরিণীর কন্যা, তাও তো সে বিক্রীতা।

আনন্দচাঁদ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কঠিন সমস্যা তাঁর সম্মুখে।

ঠিক এই সময়েই বাইরে থেকে দীনদাস বললে, প্রভু !

উত্তর দিতে পারলেন না আনন্দচাঁদ। বোধ করি শুনতেই পেলেন না। দীনদাস আবার বললে, মুরশিদাবাদের মোক্তারের কাছ থেকে লোক এসেছে, চিঠি এনেছে। জরুরী চিঠি। আর বলছে, দিল্লীতে নাকি বড় গোলমাল !

কেশবানন্দের কপালে ভ্রূতে প্রশ্নের কুঞ্চনরেখা জেগে উঠল : কী হয়েছে ? বাদশা মহম্মদ শা—

—না মহারাজ, বলছে ইরানের বাদশা নাদির শা আটক পার হয়ে পাঞ্জাবে ঢুকেছিল। পাঞ্জাব লুঠ করেই সে ফিরে যাবে ভেবেছিল লোকে। কিন্তু সে ফিরে যায় নি। সে দিল্লীর দিকে আসছে। যে দিক দিয়ে আসছে সব শ্মশান করে দিয়ে আসছে। এতদিনে সে দিল্লী ঢুকেছে। দখল করে বসেছে। যে খবর নিয়ে এসেছে যে আসবার সময় পথে খবর পেয়েছে নাদির শা দিল্লী দখল করে ছারখার করে দিয়েছে।

চমকে উঠলেন আনন্দচাঁদ !

কেশবানন্দ মুহূর্তে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠলেন। চোখ দুটি তাঁর বিস্ফারিত, তারা দুটি যেন প্রদীপের মত জ্বলছে, ইরানের বাদশা নাদির শাহ ! প্রথম জীবনে ভেড়াওলা নাদির শা, সাক্ষাৎ শয়তান যাকে ভর করে বিশ্ববিজয়ী করে তুলেছে ?

তাঁর উত্তেজিত মুখের রেখায় মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন ঘটতে লাগল, প্রদীপের মত জ্বলন্ত চোখের তারা দুটিও যেন নিবছে আর জ্বলছে, নিবছে আর জ্বলছে।

হঠাৎ তিনি চারিদিক চেয়ে দেখলেন, তারপর ঘরের মেঝেতে ফরাসের চৌকির নীচে রাখা বৃহৎ গুরুভার একখানা পাথর দু হাতে সবলে মাথার উপর পর্যন্ত তুলে সেখানাকে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিলেন। খোয়া-বাঁধানো মেঝেটা ফেটে চৌচির শুধু হল না, গর্ত হয়ে গেল। পাথরখানাও ভেঙে গেল তিন টুকরো হয়ে।

কেশবানন্দ গর্তের কাছে এসে বললেন, হিন্দুস্থানের বাদশাহী—

পাথরখানার কাছে এসে বললেন, ইয়ে হ্যায় নাদিরশাহী—

তারপর বললেন, দুনো যায়েগা। নাদিরশাহীও থাকবে না। লগ্ন এসেছে। এখন খুব হুঁশিয়ার গোস্বামীপাদ। মহাযজ্ঞে আগুন জ্বলেছে।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ॥

"অশেষ করুণা এবং মহিমার আধার, সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, নিয়ম ও ন্যায়ের বিধানকর্তা, সৃষ্টি এবং ধ্বংস-শক্তির উৎস, মহামহিমাময় ঈশ্বর, যাঁহার বদান্যতা ও অনুগ্রহের মূল হইতে আলোকদাতা সূর্যের প্রকাশ, তাঁহার যিনি ছায়া, সেই সম্রাট সৌভাগ্যবান অভিজাতদিগের মধ্য হইতে বিশেষ সম্মানিত, জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন, ন্যায়নীতি ও মহত্ত্বের আদর্শে একনিষ্ঠ ব্যক্তিদের, প্রদেশের সুবাদার সেনানায়ক নবাব ফৌজদার বহাল করেন এই হেতু যে, ঈশ্বরের অভিপ্রেত ন্যায়নীতি নিয়ম শৃঙ্খলা, দেশে সমাজে যেন সূর্যকিরণ, বায়ু ও বর্ষণের মতই পক্ষপাতশূন্য এবং সূক্ষ্ম হয়। কিরণ উত্তাপ বর্ষণের ভার যেমন তিনি সূর্যের উপর অর্পণ করিয়াছেন, মানুষের সমাজে ন্যায়বিচারের ভার তেমনি তিনিই অর্পণ করিয়াছেন সম্রাটের উপর। সেই অমোঘ নিয়মে যে বৃক্ষ সদম্ভে মস্তকোত্তলন করিয়া বহু বৃক্ষের উপর অত্যাচার করে, তাহার মস্তকে বজ্র-নিক্ষেপে তাহা নাশ করিয়া তিনি বহু অসহায় বৃক্ষকে রক্ষা করেন, আলোক ও জল দ্বারা তাহাদের পালন করেন। সম্রাটের নির্দেশে শাসনে নিয়মে, সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ শাসকগণ দেশের সেই নিয়মেই নিঃশঙ্কতা ও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। ঈশ্বরের রাজ্যে, একজন রাজা ও একজন সামান্য ভিক্ষুকের ভাগ্যফল, যাহা পূর্বজন্মের কর্ম দ্বারা নির্দিষ্ট, অনুসারে ভোগসুখের তারতম্য সত্ত্বেও তাহাদের প্রাণের মূল্য এক। সেই নিয়মেই সম্রাটের বিচারা-লয়ে একদা এক বিধবার পুত্রকে দৈবক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরের আঘাতে বধ করার জন্য ন্যায়পরায়ণ কাজী সাহেব স্বয়ং সম্রাট নাসিরুদ্দিনের বিচার করিয়াছিলেন এবং সম্রাট অবনত মস্তকে সে বিচার শিরোধার্য করিয়াছিলেন। ইসলামের

মহামান্য পয়গম্বর সামান্যতম মানুষকেও সকলের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়া গিয়াছেন। অশেষ করুণার আধার ঈশ্বর, অন্যায় অত্যাচারে অত্যাচারিত সামান্য প্রাণীর দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন। সামান্যতম ব্যক্তি অন্যায়-ভাবে পীড়িত হইলে, তাহা জ্ঞাত হইবামাত্র ঈশ্বরের ছায়াস্বরূপ সম্রাটের বক্ষ হইতেও তেমনি দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। সম্রাটের রাজ্যে শাসকবৃন্দ সেই সব গুণের শরিক, তাঁহারাও বিচলিত হন।

"মহামান্য ফৌজদার অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীল শ্রীযুক্ত মহম্মদ হাফেজ খাঁ জনাব আলি বাহাদুর—আপনি অভিজাত, আপনি ধার্মিক, আপনি নির্ভীক, আপনি দয়ার্দ্রহৃদয় অথচ ন্যায়পরায়ণ। আপনার শাসনাধীনে প্রজাবর্গ ধনী-নির্ধন, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সুখেই কালাতিপাত করিতেছে। তবুও মৃত্তিকার গহ্বরে দিবসকালেও অন্ধকারের মত সেই অন্ধকারগহ্বরবাসী হিংসক অজগরের মত লুক্কায়িতভাবে অন্যায়কারী অত্যাচারী যে রহিয়াছে ইহা সত্য, এবং সে সত্য সূক্ষ্মদূরদৃষ্টিসম্পন্ন মহামান্য ফৌজদার সাহেবও অস্বীকার করিবেন না। বহু ক্ষেত্রে ইমারতের মধ্যেও এমন অজগর বাস করে। আপনার এলাকাধীনে গঞ্জ ইলামবাজারে এমনি এক অজগরচরিত্রের ব্যক্তি অর্থসম্পদের ইমারতের গহ্বরে আত্মগোপন করিয়া বিষনিশ্বাসে বায়ু বিষাক্ত করিতেছে; বহু অসহায় জীবকে কবলগত করিয়া নাশ করিতেছে, গ্রাস করিতেছে। আমি ইলামবাজারের ধনী ব্যবসায়ী রাধারমণ দে-সরকার এবং তাহার পুত্র অক্রূর দে-সরকারের কথা বলিতেছি।"

মাধবানন্দ হাতেমপুরের ফৌজদার হাফেজ খাঁয়ের উদ্দেশে পত্র রচনা করছিলেন। ধুলাকাদা মেখে কয়ো সামনে একটা গাছতলায় শুয়ে কাঁদছিল। কয়ো সুপুরে গোসাঁই ঠাকুরের ওখান থেকে হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে এখানে এসেছে।—নবীন গোসাঁই, তুমি বাঁচাও। তোমার জন্যেই গোসাঁই, তোমার জন্যেই এ সর্বনাশ, তুমি বাঁচাও।

প্রথম সে মাধবানন্দের কাছে আসে নি, আসতে ভরসাও হয় নি, মনও চায় নি। সে তো রথযাত্রার দিন এসে গোসাঁইয়ের কাছে কৃষ্ণদাসীর দুর্দশার কথা জোড়হাত করে নিবেদন করে বলেছিল, সিদ্ধপুরুষ, দয়া কর। কিন্তু দয়া হয় নি। গোসাঁই দেখিয়ে দিয়েছিল হাতেমপুরের ফৌজদারের

দরবার। ফৌজদার লোক ভাল, তার বেগম আরও লোক ভাল; কিন্তু রাজা বাদশা ফৌজদারের মন গরিবের দুঃখে কাঁদতে চাইলেও কাঁদবার তাদের অবকাশ কোথায়? ভগবান যে ভগবান, তারই সময় হয় না। শুধু সময়? এর বিচার করাও তো সোজা নয়। ভাবতে গেলে কয়োর চোখের সামনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হিজিবিজি হয়ে যায়। কয়ো এই গড়জঙ্গলের দিকে তাকায় আর ভাবে, বনে বাঘ আছে, হরিণ আছে। বাঘ বলে—ভগবান খেতে দাও, হরিণ দাও মেরে খাই। হে ভগবান, হে ভগবান! হরিণ বলে—ভগবান, বাঘের হাত থেকে বাঁচাও, কচি ঘাস দাও; ভগবান, হে ভগবান!

ভগবান কী করে? ওদিকে তখন দ্রৌপদীকে হয়তো চুলে ধরে দুঃশাসন রাজসভায় এনে তার কাপড় ধরে টানছে। দ্রৌপদী ডাকছে—গোবিন্দ, রক্ষা কর। ঠাকুর তখন বাঘ-হরিণের কথা কানে তোলেন, না দ্রৌপদীকে কাপড় জোগান? কিংবা কুরুক্ষেত্রে রথের ঘোড়া চালান? তা ছাড়া 'অক্কুরুর' যদি ফৌজদারকে বলে—জনাব, আমি বড়লোকের ছেলে, আমার অনেক টাকা, তোমাকে দফায় দফায় খেলাত দি, পেশকস্ দি; আমার দরবারও তো তোমাকে শুনতে হবে। আমার যদি লোকলস্কর না থাকে তো আমি কিসের বড়লোক? আমার বড় বাড়ি ঘোড়া পালকী না থাকলে যেমন চলে না, তেমনি মোহিনীর মতন দু-চারটে সেবাদাসী না থাকলে চলবে ক্যানে? বাদশার ঘরে দশ হাজার বিশ হাজার বাঁদী, নবাবের ঘরে হাজার দু হাজার, ফৌজদার কাজী জমিদার এদের ঘরে গণ্ডায় গণ্ডায়; কুলীন বামুনদের শ-দরুনে পরিবার; অক্কুরুরের দোষই বা তা হলে কোথায়? ওই তো সেদিন সেই নীল মানিকটা পেয়ে খুশী হয়ে তাকে খাইয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলছিল, বলতে বলতে কী খবর এলো কোথা থেকে, বাস্, ফৌজদার হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল; হয়ে গেল খতম। কোথায় মোহিনী, কে মোহিনী, কেই বা কয়ো—কে তার খোঁজ রাখে, খবর রাখে!

তাই সে মাধবানন্দ বা ফৌজদার এদের কাছে না গিয়ে, উপায়ান্তরহীন হয়ে শেষ ছুটে গিয়েছিল আনন্দচাঁদ ঠাকুরের কাছে। কিন্তু সেখানেও

ঠাকুর যখন দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে আর দরজাই খুললেন না, তখন হতাশ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে ইলামবাজারে ফিরেই আসছিল। হঠাৎ পথে কয়ো ওপারের বনের দিকে তাকিয়ে রাগে ক্ষোভে অধীর হয়ে উঠল: ওই নবীন গোঁসাই—ওই নবীন গোঁসাই সব সর্বনাশের মূল। ওরই অভিশাপে মা-জী পাগল হয়ে গেল। মা-জী—কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী যখন কেশবিন্যাস করে, কপালে তিলক নাকে রসকলি কেটে, পান-দোক্তায় ঠোঁট রাঙা করে পথ দিয়ে চলে যেত তখন পথের লোক দাঁড়িয়ে দেখত তার রূপ। সে যখন কথা বলত, তখন লোকে অবাক হয়ে শুনত, ভাবত, কথা তো সবাই বলে কিন্তু এমন কথা এ মেয়ে কেমন করে বলে—এ কথা, কোন্ কথা, যার ধার ক্ষুরের মত, যার ছটা বেলোয়ারি চুড়ির ঝিকিমিকির মত, কণ্ঠস্বরে বাঁশির সুর, কথার সঙ্গে হাসিতে মধুর আমেজ। কয়ো মা-জীকে ভয় করত, তার আচার-আচরণ ভাল লাগত না তার, তবু ভালবাসত; মন্দ কথা মন্দ মানে করতে ভাল লাগে নি, ভরসা হয় নি। একদিন সে বুড়ো বাউলদের দু-চারজনের কথা শুনেছিল—তারা বলাবলি করছিল, "মা-জী সাক্ষাৎ রাধা-রসের দূতী গো। ওই রসে ডগমগ। চলনে হাসি, বলনে হাসি, রঙ্গে হাসি, ব্যঙ্গে হাসি। রসের পিঠে, রসে রসে এলিয়ে আছে, তুলে ধরতে গলে পড়ে। সাক্ষাৎ রসময়ের কৃপা না হলে কি জীবনে এত রস ঢোকে? জয় রাধে—জয় রাধে! রসেই আশ, রসেই বাস, রসেই ভোজন, রসেই শয়ন, রসেই স্বপন, রসেই জাগরণ। চামড়ার চোখে চেয়ে দেখে মা-জীকে বিচার কর না, ঠকবে।" বুড়ো বাউল বলাইদাস গান গেয়ে উঠেছিল—সেই গান, যা তাদের একান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া কারুর কাছে গাইতে নাই, গাইতে মানা—সেই গান একে অপরের কানের কাছে মুখ এনে রসের ঘোরে মুচকি মুচকি হেসে গুন গুন করে গেয়েছিল—

> "রসের ভজন রসের পূজন রসের ভোজন কর।
> রসেতে মজিবি রসিকে পূজিবি রসেতে বাঁধিবি ঘর॥
> রসেতে শয়ন রসেতে স্বপন রসে হাসি রসে কাঁদা।
> রসের সাগরে ডুব দিলে পরে রসময় পড়ে বাঁধা॥"

অন্ধকারে গাছতলায় শুয়ে ছিল কয়ো। তার ধাঁধা জটিল হয়ে উঠছিল; কৃষ্ণদাসী আরও রহস্যময়ী হয়ে উঠছিল তার কাছে।

সেই মা-জী উন্মাদ পাগল হয়ে গেল ওই নবীন গোঁসাইয়ের রোষে, তার শাপে।

—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোঁসাই, দায়ী তুমি।

রাগে ক্ষোভে ক্ষ্যাপার মত এই চিৎকার করতে করতে সে ইলামবাজারের রাস্তা থেকে সরে সরে কখন যে অজয়ের কূলে এসে হাজির হয়েছিল, কখন যে নদী পার হয়ে এপারে এসে বনের মধ্যে প্রবেশ করে আশ্রমের ফটকে এসে উঠেছিল, সে সম্পর্কে কোন সচেতনতাবোধও তার ছিল না। প্রচণ্ড ক্রোধে ক্রুদ্ধ কয়ো আশ্রমের দুয়ারে চিৎকার করছিল—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোঁসাই, দায়ী তুমি।

মাধবানন্দ অশ্রান্ত পদক্ষেপে মন্দিরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে ফিরছিলেন।

কেশবানন্দ তাঁকে বন্দী করে চলে গেছেন; শ্যামানন্দ এবং আরও কয়েক-জন তরুণ সন্ন্যাসী নতদৃষ্টিতে বা উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর দৃষ্টিব সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়ের সঙ্কোচ বা লজ্জা এড়িয়ে তাঁর উপর বোধ করি প্রহরা দিয়েই বসে ছিল। মাধবানন্দ তাদের সঙ্গে একবারমাত্র কথা বলেছিলেন—একটি প্রশ্ন করেছিলেন, কেশবানন্দের উপলব্ধিকেই কি তোমরা সত্য বলে মনে কর? আমি ভ্রান্ত বলে তোমাদের বিশ্বাস?

উত্তর তারা দিতে পারে নি। নীরবে যে যে-ভাবে বসে ছিল সেই ভাবেই বসে থেকেছিল।

মাধবানন্দ আর প্রশ্ন করেন নি। তাদের মৌনতার মধ্যেই তাদের উত্তর তিনি পেয়েছিলেন। দোষ দেন নি। এরা নিতান্ত তরুণ। প্রত্যেকেই তাঁর থেকেও বয়সে নবীন। এবং এদের দু-তিনজনকে বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই কোন-না-কোন আঘাতে আহত হয়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছে। কারও ঘর ভেঙেছে সমাজের আঘাতে, কারও ঘর ভেঙেছে রাজা বা নবাব জায়গীরদার কি ফৌজদারের আঘাতে, কারও সংসার ছারখার হয়েছে রাজায় রাজায় সংঘর্ষের মধ্যে, কারও ঘর লুটে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে ডাকাত,

লুটেরার দল। ঘর এরা ত্যাগের প্রেরণায় ছাড়ে নি, ঘর হারিয়ে গেছে বলে উপায়ান্তরহীন হয়ে সন্ন্যাসী। প্রতিষ্ঠা হারিয়ে গৈরিক নিয়ে ভিক্ষুকের প্রতিষ্ঠাহীনতার লজ্জা থেকে আত্মরক্ষা করেছে। বুকের মধ্যে এদের ক্ষোভ হিংসা চাপা আছে, নেবে নি। সকলেই দিল্লী থেকে কাশী পর্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী। কয়েকজন সমৃদ্ধ সম্পন্ন ঘরের ছেলে, ঘর ভেঙেছে কোন লড়াইয়ে বা সুবাদার-জমিদারের অত্যাচারে। পথে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার জন্য ভিক্ষুকের চীরবস্ত্র গায়ে না জড়িয়ে গেরুয়া কাপড় গায়ে দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নেওয়ার লজ্জার হাত থেকে নিষ্কৃতি খুঁজেছে। বাকী কয়েক-জন নিতান্তই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে—ঘর-পালানো ছেলে সব; কারও মধ্যে একটা হা-ঘরে প্রকৃতি আছে, কেউ ঘরে দুষ্কৃতি করে কেউ বাইরে দুষ্কৃতি করে ঘর ছেড়েছিল। সকল লজ্জা সকল অপরাধ থেকেই আত্মরক্ষার পক্ষে এ দেশে গেরুয়া আবরণের মত আর-কিছু নাই। এদেরও বুকে আগুন রয়েছে, ওই এক আগুন। সেই আগুনের উত্তাপে ওদের বুক শুকিয়ে তৃষ্ণার্ত, কিন্তু সে তৃষ্ণা অমৃতের নয়—সে তৃষ্ণা মদিরার। শক্তির মদিরা।

ঠিক এই সময়টিতেই কয়োর চিৎকার এসে তাঁর কানে ঢুকল।—দায়ী তুমি। দায় তোমার। দায় তোমার। দায়ী তুমি। নবীন গোঁসাই, দায়ী তুমি।

এতক্ষণে মাধবানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ওই চিৎকার, তাঁর চিন্তা এবং পদচারণার গতিতে একটি ছেদ টেনে দিল চকিতে।

কয়োর কণ্ঠস্বর চিনতে দেরি হল না তাঁর। কয়োকে মনে হতেই, কয়োর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষ্ণদাসীকে মনে পড়ে গেল। গতকাল রাত্রির ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠল। উঃ, হতভাগিনীর কর্মফলের সে কী নিদারুণ পরিণাম! সে কী মর্মযাতনা তার! সে কি তা হলে আরও কোন নিষ্ঠুরতর পরিণামে—? শিউরে উঠলেন মাধবানন্দ। নইলে নির্বোধ জড়বুদ্ধি কয়ো এমন কাতর আবেগে তাঁকে দায়ী করে চিৎকার করে কেন? কয়োর ধারণার কথা তো জানেন। সে নিজের মুখে বলে গেছে—নবীন গোঁসাই, তুমি সিদ্ধপুরুষ, তোমার রোষে পড়েই কৃষ্ণদাসীর এই অবস্থা। প্রশ্ন করেছিল, হতভাগী বষ্টুমীর কি অপরাধটা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল গোঁসাই?

মাধবানন্দ শ্যামানন্দের দিকে মুখ ফেরালেন, ডাকলেন, শ্যামানন্দ! মাধবানন্দের এ কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। এ কণ্ঠস্বরে আদেশের সুর এবং নেতৃত্বের গাম্ভীর্যের গুরুত্ব অলঙ্ঘনীয়। কেশবানন্দ হয়তো একে লঙ্ঘন করতে পারে, কিন্তু শ্যামানন্দ পারে না।

শ্যামানন্দ চকিত হয়ে সামনের গাছটির উপর ইচ্ছাকৃত প্রসারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতে চাইলে; কিন্তু মাধবানন্দ বললেন, শোন। ওই বৈরাগী ভিক্ষুকটিকে ডাক। নিয়ে এস এখানে। যাও।

শ্যামানন্দ অবনত মস্তকে বেরিয়ে গেল, কয়োকে ডাকবার জন্য ইতস্তত করতেও সাহস করলে না।

* * *

কয়োর কাছে সকল কথা শুনে মাধবানন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কৃষ্ণদাসী গতরাত্রির অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে। উন্মাদিনী মরেছে। অজয়ের জলস্রোত এখন অগভীর, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দহ আছে। দহে কুমীর আছে।

কৃষ্ণদাসীর মর্মযাতনার অবসান যদি এ ভাবেও হয়ে থাকে তবে সে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এক মুহূর্ত পরে অকস্মাৎ শিউরে উঠলেন তিনি। কৃষ্ণদাসীর নিষ্ঠুরতম পরিণতির জন্য নয়, মুহূর্তে তাঁর চিন্তা কৃষ্ণদাসীর দিক থেকে চলে গেছে গোটা সমাজের বিকৃত অবস্থার দিকে। তাঁর দৃষ্টিতে তিনি যেন দেখলেন, গোটা সমাজটাই আজ কৃষ্ণদাসীর মত প্রেমসাধনা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ব্যাভিচারমগ্নতার নেশায় বিকৃত মানুষের মত বিহ্বলচিত্ত হয়ে উঠেছে। তিনি শিউরে উঠলেন। তারাও কি ঠিক ওই ভাবে জীবননদীর দহে পড়ে অপঘাতে শেষ হয়ে যাবে?

তাঁকে স্তব্ধ দেখে কয়ো আবার চিৎকার করে উঠল, তোমাকেও সে শাপান্ত করে গিয়েছে। ডাকিনীসিদ্ধ মা-জীর শাপ তোমাকেও লাগবে।

শ্যামানন্দ তাকে ধমক দিয়ে উঠল, এ-ই! কাকে কী বলছিস রে বৈরেগী?

—ঠিক বলছি। আরও বলছি, মোহিনীর এ দশা হল কোন্ অপরাধে—

বল, বল তুমি গোসাঁই? তাকে তুমি একদিন নাগা গোসাঁইদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, তোমাকে সে সাক্ষাৎ ঠাকুরের মত ভক্তি করে। তার এই দশা আবার তুমি করলে! বল, কেনে করলে, কোন্ পাপ তার? তার উদ্ধার যদি না হয় তবে তার দায় তোমার, সেই দায়ে তোমাকে আমি শাপান্ত করব।

এবার মাধবানন্দের মোহিনীকে মনে পড়ল। সরলা কিশোরী মেয়েটি বড় অসহায় বড় ভীরু, মায়ের মুখের ছাপ মেয়েটির মুখে পড়ে নি। এ মেয়ে যেন ওই জাতের নয়। অক্রূরকে মনে পড়ল। কুৎসিত বীভৎসদর্শন বর্বরটার আহত অবস্থাতেও সেই থু-থু করে থুৎকার নিক্ষেপের ছবি ভেসে উঠল চোখের উপর; সেই কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজ মনে পড়ে গেল। অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মাধবানন্দ। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন, বোস্ তুই।

—কী করব বসে? কী হবে?

—বোস্, উপায় আমি করছি। তুই কিছু খা। শ্যামানন্দ, ওকে কিছু খেতে দাও।

—আগে বল কী উপায় করবে?

—ফৌজদারকে আমি পত্র লিখে দিচ্ছি, সেই পত্র নিয়ে তুই যা। ফৌজদার অবশ্যই বিধান করবে।

—ছাই করবে। করবে না, করবে না।

—করবে। আমি বলছি।

—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ, আমি বলছি।

—তার চেয়ে গোসাঁই, তুমি তাকে শাপ দাও, তার পক্ষাঘাত হোক, সে বোবা হোক, মোহিনী তার চোখের ছামনে কালীর মত ভয়ঙ্করী হয়ে উঠুক।

—চিৎকার করিস নে কয়ো। তোকে খেতে বলছি, তুই খা। আমি পত্র লিখে দি, তুই ফৌজদারের কাছে নিয়ে যা। যদি ফৌজদার প্রতিবিধান না করে, আমি বিধান করব। যা তুই শ্যামানন্দের সঙ্গে।

তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কাগজ এবং দোয়াত কলম নিয়ে বসলেন। ফৌজদার হফেজখাঁকে পত্র লিখবেন।

মনের উত্তাপ এবং আবেগের বশে পত্র রচনা করলেন। দীর্ঘ পত্র। ঈশ্বরের অভিপ্রেত ন্যায়ের ভিত্তির উপর রাজধর্মকে স্থাপিত করে সেই ন্যায়-বিচারের দাবি জানিয়ে অক্রূরের শাস্তি ও মোহিনীকে উদ্ধার করবার প্রার্থনা জানালেন। পরিশেষে লিখলেন—"ঈশ্বরের ন্যায় ও করুণার উপর একটি পিপীলিকার যে অধিকার আছে আপনার দরবারে—বাদশাহের রাজ্যে এই হতভাগিনী অসহায়া বালিকারও অবশ্যই ততটুকু অধিকার আছে। একটি পিপীলিকাকে অকারণে বধ করিলে মানুষকেও সর্বশক্তিমানের দরবারে শাস্তি পাইতে হয়। শুধু তাই নয়, এই সংসারে ওই পিপীলিকাবধের পাপ জমা হইয়া বিশ্বসংসারের পাপের ভার বৃদ্ধি করে। এবং একদা পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহামারী, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়। মানুষের রাজ্যে এমনই ভাবে পাপ জমা হইলে আমাদের শাস্ত্রে বলে—ভগবান আবির্ভূত হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া তাহার অবসান ঘটাইয়া থাকেন। জনাব আলি, একটি সামান্য অসহায়া বৈষ্ণবকন্যার দীর্ঘনিশ্বাসও উপেক্ষার নয়। নিরপরাধের দীর্ঘনিশ্বাস অগ্নির তুল্য; এক কণা অগ্নি সময়বিশেষে ধূমায়িত বহ্নিপুঞ্জে যুক্ত হইয়া দীপ্যমান করিয়া সর্বনাশা বহ্নিদাহের সৃষ্টি করিতে পারে। সে সময় না হইলেও, সে সময়কে এক মুহূর্ত সন্নিকট করিয়া তোলে। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানে উপেক্ষা করিলে রাজ্যের অকল্যাণ ঘটিবে। অতএব আপনি ইহার প্রতিকার করুন।"

পত্র শেষ করে মাধবানন্দ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কয়োর হাতে দিয়ে বললেন, ফৌজদারের হাতে দিবি। ঠিক সেই মুহূর্তে বিদ্যুতালোকে সমস্ত বনভূমি চকিতে দীপ্ত হয়ে উঠল, পর-মুহূর্তেই বজ্রগর্জনে থর থর করে কেঁপে উঠল সব। দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে; উতলা বাতাস উঠেছে; অনেক দূরে বোধ করি বনভূমির অপর প্রান্ত থেকে একটা অবিশ্রান্ত ঝর ঝর শব্দ উঠছে; শব্দটা যেন চলমান—দূর থেকে নিকটে আসছে এগিয়ে। একটানা ঝর-ঝর-ঝর-ঝর শব্দ। বর্ষণ নেমেছে,

এগিয়ে আসছে নৈর্ঋত কোণ থেকে। আরও কিসের শব্দ। ক্যাও—ক্যাও—ক্যাও! বনের শাখায় বসে ময়ূরেরা ডাকছে।

মাধবানন্দ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বর্ষার মেঘমেদুর আকাশের কী একটা বিষণ্ণ মায়া আছে! সেই মায়া মনকে বিষণ্ণ করে তোলে, উদাস করে দেয়। তেমনি বিষণ্ণ উদাসীনতার মধ্যেই মাধবানন্দের এই মুহূর্তে অকস্মাৎ মনে হল, হতভাগিনী মোহিনীর ভাগ্যের প্রতিচ্ছবি আকাশে বাতাসে ফুটে উঠেছে। নিজের করুণার কাছে তাঁর নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হচ্ছে। বিচিত্র ভাবে নিজের অজ্ঞাতসারে অনিচ্ছায় কৃষ্ণদাসীর শোচনীয় পরিণতি, তার সঙ্গে মোহিনীর এই দুর্দশার সকল কারণের মূলের সঙ্গে তিনি যেন জড়িয়ে গেছেন।

* * *

ঝরঝর শব্দে বর্ষণ নেমে এসেছিল কখন।

চিন্তামগ্ন মাধবানন্দের খেয়াল ছিল না। ধারাবর্ষণের মধ্যে সব লুপ্ত হয়ে গেছে। বন ঢেকে গেছে, আকাশ ঢেকেছে, অজয়ের তটভূমি, অজয়, অজয়ের পরপার—সব ঢেকে গেছে। তাঁর চিন্তা ভাবনার দিক্‌দিগন্ত সব যেন এমনি একটা কিছুর মধ্যে হারিয়ে গেছে, ঢেকে গেছে। তিনি ভাবছিলেন, যদি ফৌজদার কোন প্রতিবিধান না করে? তারপর? কী করবেন তিনি? অসহায় কোটী কোটী জীব এই সৃষ্টির ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের মধ্যে বলি হচ্ছে; ভাল মরছে, মন্দ মরছে, তারই মধ্যে সৃষ্টি চলেছে আপন পথে। মহাকুরুক্ষেত্রের শেষ আজও হয় নি, কতকালে হবে কে জানে! সেই যজ্ঞে নিজেকে বলি দিয়েছে কৃষ্ণদাসী। তিনি মন্ত্র পড়েছেন। আবার মোহিনীও বলি হবে? তিনি পুরোহিতের মত মন্ত্র পড়েই চলবেন? কয়ো বলে গেছে, ঝুলন-পূর্ণিমার দিন মোহিনী বলি হবে। রমণ দে-সরকার অনুষ্ঠান করে ব্যাভিচারী পুত্রের হাতে মোহিনীকে তুলে দেবে। বলির পশুর মতই মোহিনীর সকল আর্তনাদ ব্যর্থ হবে। পরশু পূর্ণিমা—একদিন পর।

—গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ মুখ তুলে তাকালেন। কেশবানন্দ ঘরে প্রবেশ করেছেন।

মাধবানন্দ উত্তর দিলেন না। শুধু তাঁর মুখের দিকেই চেয়ে রইলেন। কেশবানন্দের সর্বাঙ্গ সিক্ত; মাথার চুল থেকে জল ঝরছে। চোখ দুটি রাঙা, বোধ হয় ভেজার জন্যই এমন রাঙা হয়েছে।

—ফৌজদার যদি আপনার পত্র উপেক্ষা করেন ?

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ।

—কয়োর হাতে আপনি যে পত্র দিয়েছেন, সে পত্র আমি পড়েছি। পত্র আপনারই উপযুক্ত হয়েছে। কিন্তু জয়দেবের মহান্ত মহারাজ বললেন—গঙ্গাজী যখন অলকাপুরী থেকে মর্ত্যধামে নেমেছিলেন তখন শিব তাঁকে মাথা পেতে ধরেছিলেন; সে মাহাত্ম্য সাক্ষাৎ শিবরুদ্রের যেমন তেমনি অলকাবাহিনী গঙ্গারও বটে। মাটির এই পাপপুণ্যময় ধরতিতে গঙ্গা অবতরণ করার পর তাঁর জলে মাটি মিশেছে। শিবের জটা বেয়ে জল তাঁর যত বাড়ে, ধরতির মাটি তাতে তত বেশী মেশে। তাই বন্যার কালে গঙ্গার মধ্যে যত জল, তত মাটি। তখন তাই তার প্রবাহে সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের শক্তি বেশী। তাই গঙ্গায় বান ডাকলে তখন এক কেন, শত শিবলিঙ্গ সাজিয়ে বাঁধ দিলেও বানের গতি রোধ হয় না; বানে যা ভাঙবার তা ভাঙে। তোমার গুরুকে বলবে—ঈশ্বরের নিয়ম সূর্য মানে, চন্দ্র মানে, বাতাস মানে, বর্ষা মানে; কিন্তু মানুষের মধ্যে তার দশা হয়—কাচস্বচ্ছ অলকানন্দার অমৃতবারির ধরতির বুকে বহতা গঙ্গার ঘোলা জলের মত। রাজবিধান গঙ্গার ঘোলা জল, আর রাজা হল ওই পথলের শিবলিঙ্গ। সুবাদার ফৌজদার কাজী এ তো নুড়ি ভাই। গায়ে একটা সাদা দাগের বেড় থাকে সেটা দাগই ভাই, উপবীত নয়। গঙ্গাজলের মহিমা গেয়েছে তোমার গুরু, এক নুড়ির কাছে! হা রে গঙ্গাজল, যার আধা হল মাটি আর কাদা!

—তুমি বলছ, ফৌজদার হাফেজখাঁ আমার পত্র অনুধাবন করবে না? পরক্ষণেই বললেন, তুমি কি কেন্দুলীর মহান্তের কাছে গিয়েছিলে? তুমি তো সুপুরে গোস্বামীপাদের কাছে গিয়েছিলে!

—সেখান থেকে আমি মহান্ত মহারাজের কাছেও গিয়েছিলাম। সুপুরে সংবাদ পেলাম আগুন জ্বলেছে। দিল্লীতে নাদির শাহ এসে চেপে বসেছে। এ খবর দু মাসের পুরনো। এতদিনে কী হয়েছে কেউ জানে না। কিন্তু

দিল্লীর বাদশাহী তক্ত যে পাথরের উপর বসানো, সে পাথরখানায় বাদশা-জাদারা হাতুড়ি মেরে মেরে ফাটিয়েছিল, নাদির শাহের ইরানী হাতুড়ির ঘায়ে সেটা ভেঙেছে। আর তো বসে থাকবার সময় নেই। তাই মহান্ত মহারাজের কাছে না গিয়ে পারি নি। এ খবর হাতেমপুরেও এসেছে গুরু মহারাজ। এখন আপনার পত্র পড়ে অনুধাবন করবার মত তার সময় নাই বলেই আমার ধারণা।

মাধবানন্দ হাত তুলে উপরের দিক নির্দেশ করে বলতে গেলেন—ফৌজদার না শুনলে তাঁর হাত। আমি কী করব কেশবানন্দ? কিন্তু বলতে গিয়েও পারলেন না বলতে। চুপ করে আকাশের দিকে নয়, মাটির দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

কেশবানন্দ বললেন, আপনি কি কয়োকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ফৌজদার প্রতিকার না করলে—। কথাটা শেষ করলেন না তিনি, অসমাপ্তির মধ্যে ইঙ্গিতে প্রশ্নটিকে সামনে ধরে দিলেন।

মাধবানন্দ মুখ তুললেন। বললেন, ধর্মসাধনার পথে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম। তুমি তাকে এই কালের সুযোগে বিধর্মীশাসন উচ্ছেদের কাজে প্রয়োগ করতে চাও। বিধর্মীর উচ্ছেদের সঙ্গে অধর্মের উচ্ছেদ করবে কেশবানন্দ? বল তা হলে—

মাধবানন্দ আসন ছেড়ে উঠলেন। কংসারি-বিগ্রহের বেদীর এক পাশে থাকত একখানি তরবারি, অপর পাশে একখানি ঢাল। তরবারিখানি হাতে তুলে নিয়ে মাধবানন্দ বললেন, তা হলে আমি তোমাদের সকলের ইচ্ছা এবং চেষ্টার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দিচ্ছি। বল।

কেশবানন্দ নতজানু হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে বললেন, জয় কংসারি! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ঝুলন-পূর্ণিমার পূর্বেই অসহায়া মেয়েটিকে আমরা উদ্ধার করব।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ॥

কী করবেন মাধবানন্দ ?

বাকী সারাটা দিন এবং রাত্রি ও পরের দিন তিনি ওই চিন্তা করে দেখলেন। কয়ো ফিরে এখনও আসে নি। সংবাদ পেয়েছেন, ফৌজদারের লোক এসে রমণ দে-সরকার এবং তার বর্বর ছেলেটাকে আজ সকালে প্রায় গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে।

কেশবানন্দই তাঁকে খবর দিয়েছেন। কিন্তু বিশেষ আশা তিনি প্রকাশ করেন নি। বরং ব্যঙ্গহাসি হেসে বলেছেন, ফৌজদার অথর্ব অজগরের মত পড়ে ছিল, তার মুখের সামনে সে শিকার পেয়েছে। দিল্লীর অবস্থার কথা শুনে অর্থ সংগ্রহের জন্য সকলেই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। অর্থ ভিন্ন সামর্থ্য শক্তি সব-কিছুই আকাশকুসুম। এদিকে সরফরাজ খাঁ মুরশিদাবাদের তক্তে বসেছে, তার নজরানা চাই। রমণ সরকারের অর্থদণ্ড হবে। ফৌজদারের কিছু সুবিধা হল।

পর-মুহূর্তেই বলেছেন, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সে বৈষ্ণব-কন্যাকে নিশ্চয় উদ্ধার করব। আমার উপর ভার দিয়েছেন। আমি নিয়েছি ভার, সে ভার উদ্ধার না করতে পারলে আমার নরক হবে। শুধু চঞ্চল হয়ে আমার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না।

—না, করব না। যা হয় তুমি কর। শুধু আমার বাক্য যেন নিষ্ফল না হয়। ওই সরলা অসহায়া মেয়েটি উদ্ধার হোক। তা হলেই আর অনুশোচনা থাকবে না। কৃষ্ণদাসীর জন্য তাঁর অনুশোচনা নেই। না, নেই। এই পরিণতিই তার অনিবার্য।

কৃষ্ণদাসী রাত্রির অন্ধকারে ফসলকীট শ্যামাপোকার মত জন্মেছিল। তিনি অন্ধকারের মধ্যে সূর্যোদয়ের তপস্যায় হোমকুণ্ড জেলে বসে আছেন, তাতে শ্যামাপোকা-কৃষ্ণদাসী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরল; তিনি কী করবেন তাতে? তর্পণের সময় 'আব্রহ্মস্তম্ব' পর্যন্ত জগৎকে জলগণ্ডূষ যখন তিনি দেবেন, তখন তার মধ্য থেকে একটি জলকণা সে পাবে, দেবেন তাকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে আত্মসম্বরণ করলেন মাধবানন্দ।

এই সরলা অসহায়া মেয়েটি রক্ষা পেলে তাঁর আর কোনও গ্লানি থাকবে না। মেয়েটির কিশোর-চিত্তটি তাঁর সম্মুখে সূর্যের সম্মুখে ফুলের মত মেলে ধরেছিল, তিনিও ঠিক তেমনি ভাবেই প্রত্যক্ষ করেছেন—সেখানে বিমুগ্ধতা আছে, ভক্তি আছে, আর কিছু নাই; সে নিষ্পাপ। পাপ দণ্ডিত হয়েছে অমোঘ নিয়মে, কিন্তু তিনি হয়েছেন তার হেতু। সেই কারণেই ওই নিষ্পাপ মেয়েটিকে রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। তাঁর অন্তর বলছে। হায়, যদি তাঁর পুণ্যময় ইচ্ছামাত্রেই মেয়েটি রক্ষা পেত! কিন্তু সে পুণ্য এখনও তাঁর সঞ্চিত হয় নি। সকল সময়ে ইচ্ছাশক্তিতেও কাজ হয় না। ভগবানের অবতারেরও হয় না। তাঁকেও সেতুবন্ধন করে সমুদ্র পার হয়ে যুদ্ধ করে রাবণকে ধ্বংস করতে হয়; তাঁকেও কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করে অশ্বরজ্জু ধরতে হয়—তাতেই শেষ নয়, অশ্বরজ্জু ছেড়ে চক্রও ধারণ করতে হয়। হোক, তাই হোক। কুরুক্ষেত্রই হোক। সমগ্র ভারতভূমে দিকে দিকে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন কার্যকারণে গড়ে উঠছে; প্রখরতম গ্রীষ্মে এক দিকে বায়ুস্তর শুষ্ক হয়ে উঠছে, অন্য দিকে বৃক্ষশাখা শুকিয়ে ভিতরের অগ্নিকে উন্মুখ করে তুলছে; শাখায় শাখায় সংঘর্ষে উন্মুখ অগ্নি জ্বললে সমস্ত অরণ্য জুড়ে আগুন জ্বলবে। এ সময়ে শান্তিজল সিঞ্চন, শান্তিমন্ত্র উচ্চারণের সময় নয়। এখন আহুতি-মন্ত্র উচ্চারণের সময়, আহুতি দেবার সময়। তাই করবেন, তাই-ই দেবেন তিনি। এই মহাকালের মহাযজ্ঞে তিনি প্রথম আহুতি দিয়েছেন তাঁর সংসার, জীবন, ইহলোক, তাঁর ধ্যান-ধারণা; দ্বিতীয় আহুতি দেবেন জীবনমুক্তি পরলোক। প্রথম বলি হয়েছে পাপিষ্ঠা বৈষ্ণবী কৃষ্ণদাসী, দ্বিতীয় বলি হোক বর্বর পশুতুল্য ওই ধনী-পুত্রটা। ভগবানের যদি অন্য অভিপ্রায় হয় তবে ফৌজদার অবশ্যই

প্রতিবিধান করবে। না করলে কেশবানন্দ বলির ভার নিয়েছেন। কেশবানন্দ নির্ভীক ছেত্তা।

অকস্মাৎ একসময় মাধবানন্দ অনুভব করলেন যেন দিন শেষ হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরটায় অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। অন্ধকার কোণে কোণে ঝিঁঝিপোকাগুলি প্রখরভাবে মুখর হয়ে ডাকছে। দিন শেষ হয়ে গেল! এত শীঘ্র! পরক্ষণেই হাসলেন। কাল যেমন নিজের গতিতে চলে, মানুষের মনও তেমনি নিজের গতিতে চলে। সে যখন আনন্দে আপনার মধ্যে সমাহিত তখন কাল চলে এগিয়ে, মনের এক দিন শেষ হতে হতে হয়তো কালের তিন দিন পার হয়ে যায়; তপস্বীদের একটি সমাধিতে একবার চোখ বন্ধ করে চোখ খুলতে খুলতে একটা কাল কেটে যাওয়ার কথা মিথ্যা নয়। আবার মন যখন চঞ্চল অধীর, বাইরে ছোটে, সে তখন কালের চেয়েও দ্রুততর গতিতে চলে—তখন কাল পড়ে পিছিয়ে; একটি উদ্বেগের রাত্রে মানুষের কালো চুল সাদা হয়ে যায়, একরাত্রে গোটা যৌবন অতিক্রম করে মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হয়। কিন্তু আলো জ্বালতে হবে। কই, আশ্রমের সেবকেরা কোথায়? তিনি আসন ছেড়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন: শ্যামানন্দ!

বাইরে এসে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। না, দিন শেষ হয় নি, আকাশে আবার মেঘ উঠেছে। পশ্চিম দিগন্ত থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ নিঃশব্দ সঞ্চারে বনভূমির মাথা পার হয়ে চলেছে পূর্ব দিগন্তের পানে। মৃদুমন্দ বাতাসও বইতে শুরু করেছে। বেলা অবশ্য অপরাহ্ণ পার হয়েছে, পশ্চিম দিকে বনের প্রায় শেষের দিকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের আভাস বোঝা যাচ্ছে। প্রবল বর্ষণ নামবে আবার। আকস্মিকভাবে মেঘ উঠে আসার জন্যই সন্ধ্যা নেমেছে বলে ভ্রম হয়েছে তাঁর। কিন্তু আশ্রমটি অত্যন্ত স্তব্ধ বলে মনে হচ্ছে। মানুষ থাকলে তার অস্তিত্বের একটা আভাস অনুভব করা যায়, তাও অনুভব করা যাচ্ছে না। কোথায় গেল সব?

—কেশবানন্দ!

—শ্যামানন্দ!

—যাদবানন্দ!

—গোপালানন্দ !

এবার সাড়া এল : গুরু মহারাজ !

বিশালদেহ সরল সহজ গোপালানন্দ। সে এসে দাঁড়াল।

—এরা সকলে কোথায় গোপালানন্দ ?

গোপালানন্দ জোড়হাত করে বলল, ওহি কউয়াঠো আইলো গুরু মহারাজ, কেশব মহারাজজীকে সাথ কী বাতচিজ হইলো, কেশব মহারাজজী সবকইকে লিয়ে বাহার হোই গেলেন। হামাকে বোল দিলন কি—গুরু মহারাজকে বাতানা কি হমলোক যাচ্ছে, গুরু মহারাজকে হুকুম তামিল করকে ঘুমেঙ্গে।

মাধবানন্দ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন শুধু। দাঁড়িয়েই রইলেন আকাশের দিকে চেয়ে। ফৌজদার প্রতিকার করে নি। কেন্দুলীর মহান্ত ভরতদাস মহারাজের কথাই সত্য; ঈশ্বরের ন্যায়নীতির অনুসরণে রাজ্যের নীতি, স্বর্গের গঙ্গার ভূমিতলবাহিনী অবস্থার মতই মহিমা সত্ত্বেও মৃত্তিকামলিন। শাসকরাজা ফৌজদার-সুবাদারে আর শিবত্বরহিত নুড়িতে কোন প্রভেদ নেই। জীবনের গ্লানি থেকে পরিত্রাণ আজ শাসননীতি এবং শাসক হতে অসম্ভব। আজ মুক্তির জন্য যজ্ঞের প্রয়োজন।

আকাশের মেঘ দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেল প্রায়। ঘন কালো রঙ ফিকে হয়ে আসছে, সীসার রঙের মত রঙ ধরছে। স্বল্পদীপ্তির সূক্ষ্ম বিদ্যুৎরেখা খেলে গেল—তামসীর মুখের স্মিত হাস্যের মত। মৃদু গম্ভীর গর্জনধ্বনি বেজে গেল গড়জঙ্গলের মাথায় মাথায়। দীর্ঘায়িত মৃদু গুরুগুরু ধ্বনি। মেঘ-মল্লারের আসর পড়েছে, মহামৃদঙ্গে গৌরচন্দ্রিকার ঘা পড়ছে।

—গুরু মহারাজ !

—কিছু বলছ, গোপালানন্দ ?

—না, গুরু মহারাজ, আপ কুছ আদেশ করে—?

—না। যাও তুমি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম—এরা গেল কোথায় ?

গোপালানন্দ চলে গেল।

মাধবানন্দ পদচারণা শুরু করলেন।

বাতাস প্রবল হয়ে উঠল। দূর থেকে ঝর ঝর শব্দ ক্রমশ নিকট হয়ে

আসছে। বনভূমির পাতায় পাতায় পল্লবে পল্লবে সঙ্গীতধ্বনির মত সুর উঠছে। অজয়ে বন্যা আসবে।

কী ভাবে কেশবানন্দ এ কাজ উদ্ধার করবে? শক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে বিফল হবে না তো? কেশবানন্দ থাকতে তা হবে না। এরা কি বন্দুক নিয়ে গেছে? হতাহতের সংখ্যা বেশী হবে? হোক। পাপ যেখানে শক্তিকে আশ্রয় করে অসুর সেখানে। এ ছাড়া পথ নেই।

আকাশের দিকে আবার চাইলেন। এখনও সূর্যাস্ত হয় নি? না। এখনও হয় নি। এখনও পাখিরা ডাকে নি। শৃগালেরা সন্ধ্যা ঘোষণা করে নি।

ওঃ, মন বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ছুটে চলেছে, মনের গতির সঙ্গে কাল চলছে না। জীবনের উদ্বেগের সঙ্গে নিরুদ্বেগকালের সম্পর্ক নেই।

মাধবানন্দ আবার মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করে গীতা খুলে বসলেন। ওদিকে আবার বর্ষণ নামল বাইরে।

হঠাৎ একসময় গোপালানন্দ ঘণ্টাধ্বনি করলে, শিঙায় ফুৎকার দিলে। সন্ধ্যা হয়েছে তা হলে। গোপালানন্দ আরতির প্রদীপ নিয়ে আসছে। আরতির জন্য উঠলেন মাধবানন্দ।

এক পসলা প্রবল বর্ষণের পর বর্ষণ ক্ষান্ত হয়ে এসেছে। দুরন্ত বাতাসে মেঘ দ্রুতগতিতে চলে গেছে, তারই মধ্যে যতটা সম্ভব প্রবল বর্ষণ হয়েছে। শীতল হয়েছে পৃথিবী। পূর্বদিগন্তে মেঘান্তরালে শুক্লা-চতুর্দশীর চাঁদ উদিত হয়েই আছে। মেঘাচ্ছন্নতার মধ্যেও তার আভাস ফুটে উঠেছে। আলো এবং অন্ধকারের সংমিশ্রণে এ প্রকাশ হয়েছে অপরূপ—দুই রঙের মিশ্রণে এ যেন তৃতীয় রঙের সৃষ্টি। কলরোল তুলে জলস্রোত নামছে সেনপাহাড়ীর মাথা থেকে অজয়ের দিকে; আশ্রমের আশপাশের শালবনের গাছের পাতা থেকে পাতায় জলবিন্দু ঝরছে; এর শব্দ বিচিত্র; সব নিয়ে এ এক সঙ্গীত। মেঘ-মল্লারের সমাপ্তিপর্ব। মধ্যে মধ্যে এখনও মেঘ ডেকে উঠছে। দূর পূর্বদিগন্তে বিদ্যুৎরেখা ঝলসে উঠছে। বর্ষণ চলছে, এগিয়ে চলছে।

গোপালানন্দ আরতির আয়োজন করে দিয়ে ঘণ্টায় ঘা দিলে, শিঙাধ্বনি তুললে। মাধবানন্দ আরতির পঞ্চপ্রদীপ তুলে ধরলেন।

পঞ্চশিখার ছটায় কংসারির হাতের তরবারি ঝকমক করছে, ঝলসে

ঝলসে উঠছে। অন্যদিন তো ওঠে না! না, এ তাঁর মনের বিভ্রান্তি? না, এ সত্য। এ-ই সত্য। বিগ্রহ সত্য হলে এও সত্য। সংশয় কেন? মস্তিষ্ক থেকে পা পর্যন্ত রক্তধারা চঞ্চল বেগেই প্রবাহিত হচ্ছিল, সে বেগ দ্রুততর হল।

আরতি শেষ করে আবার তিনি বসলেন গীতা নিয়ে। কংসারির তরবারিতে আজ বহ্নিচ্ছটার মধ্যে তিনি ইঙ্গিত পেয়েছেন; কেশবানন্দ এতক্ষণ দলবল সমবেত করেছে নিশ্চয়; কেশবানন্দ পাষণ্ডদলন করে অনাথা নিরপরাধ সরলা মেয়েটিকে উদ্ধার না করে ফিরবে না। বিচক্ষণ কেশবানন্দ, এককালে রাজকর্মচারীর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কেশবানন্দ, পুণ্য-কর্ম-উদ্যত কেশবানন্দ —তার সম্মুখে বর্বর পাপী ও ধনী পিতাপুত্র ভয়ে আত্মসমর্পণ করবে। উদারান্নের জন্য অর্থ নিয়ে যারা তাদের দাসত্ব করে, তারা কেশবানন্দের উদ্দেশ্যের কথা শুনে সভয়ে সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াবে। কেশবানন্দ নিশ্চয় বলবে—বাধা দিলে শুধু প্রাণই হারাবে না, ইহকালই শুধু যাবে না তোমাদের, ওই নিরপরাধ বালিকার ধর্মনাশে সমুদ্যত পাপীর সহায়তা করার পাপে পরকালও হারাবে, অনন্ত নরকে নরকস্থ হবে। সরে দাঁড়াও। কংসারির সেবক আমরা, পাপীকে ধ্বংস করে পুণ্যাত্মার প্রতিষ্ঠা আমাদের ধর্ম। আমাদের বিপক্ষে যে দাঁড়াবে, সে অধর্মপক্ষ সমর্থনের পাপে ভগবানের বিধানে ধ্বংস হবে। এই পাপে ভীষ্ম হত হয়েছেন, দ্রোণ ধ্বংস হয়েছেন। সাবধান! এখনও পাপপক্ষ থেকে সরে দাঁড়াও, অনুতাপ কর, ভগবানের চরণে শরণ নাও, ধর্মকে আশ্রয় কর। অসহায়া কিশোরী কুমারীকে রক্ষা কর।

উদ্যত হাতিয়ার সম্বরণ করে তারা কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হরিধ্বনি দিয়ে অস্ত্র রেখে বলবে, আমরা ধর্মের পক্ষকে বরণ করছি। উদ্ধার করুন, আপনারা মোহিনীকে উদ্ধার করুন।

প্রৌঢ় রমণ দে-সরকার পায়ে আছাড় খেয়ে পড়বে।—মার্জনা করুন। এখনি মুক্ত করে দিচ্ছি আমি তাকে।

হয়তো বর্বর পশু অক্রূর মানবে না। চিৎকার করবে; অস্ত্র হাতে নিয়ে উন্মত্তের মত বাধা দিতে আসবে।

মাধবানন্দ বিগ্রহের দিকে একাগ্র দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন—মনে মনে কামনা করলেন, তোমার প্রভাবে যেন কেশবানন্দের মধ্যে দৈবশক্তির সঞ্চার হয়; কেশবানন্দ সেই শক্তিতে বলীয়ান হয়ে শুধু বলবে—ওইখানে, ওইখানেই পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্ পাষণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে বর্বর অক্রূর পঙ্গু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। নির্বাক। শক্তিহীন পঙ্গু চোখে বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি।

উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে উঠে পড়লেন মাধবানন্দ। মন তাঁর আর ধ্যানে মগ্ন নয়, বাইরের জগতে ছুটে চলেছে, ইলামবাজারের দিকে। ও-পারের ঘটনা তাঁর মনের কল্পনায় ঘটে চলেছে। পা দুখানিও আপন অজ্ঞাতে চলতে শুরু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে স্থির হয়ে কান পেতে দাঁড়ালেন। দলবদ্ধ মানুষের পায়ের শব্দ, মৃদুস্বরে কথা বলার শব্দ তো শোনা যায় না! ওপার থেকে কেশবানন্দের গম্ভীর কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে না। সমবেত কণ্ঠের হরিধ্বনিও না। শোনা যাচ্ছে জল-কলরোল, জলস্রোত নামছে; তার সঙ্গে হাজার হাজার ব্যাঙের আনন্দ-চিৎকার; মধ্যে মধ্যে এক-একটা প্রমত্ত ময়ূরের কেকাধ্বনি। আকাশের দিকে তাকালেন, কত রাত্রি হল?

এতক্ষণে তাঁর মন স্থানকালে বাঁধা পড়ল। অপরূপ! অপরূপ বাঁধা পড়েছে—স্থান ও কালের বেষ্টনীর মধ্যে হয়তো আকস্মিকভাবে, হয়তো বা কার্যকারণের অনিবার্য বন্ধনে। অপরূপ! এ কী রূপ! অবিশ্রান্ত বর্ষণে ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ গলিত হয়ে ক্ষয়িত হয়ে ক্ষীণস্তর একখানি স্ফটিক আস্তরণের মত পাতা রয়েছে। না। অতি ক্ষীণ এক স্তর মেঘ মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে তার উপর। যেন মসলিনের সূক্ষ্ম একখানি আস্তরণ মৃদু বাতাসে দুলছে। তারই অন্তরালে চতুর্দশীর চাঁদ অবগুণ্ঠনবতী স্মিত-হাস্যমুখী কোন স্বর্গকন্যার মত আকাশ-অঙ্গনে চলন্ত একখানি আসন পেতে বসে আছে।

মনে পড়ে গেল, বাদশাহ আলমগীর, মসলিনের-তৈরী-পোশাক-পরা কন্যা জেবউন্নিসাকে দেখে বলেছিলেন—লজ্জাহীনা। চাঁদেরও রূপ তেমনি হয়েছে, কিন্তু চাঁদ লজ্জাহীনা বলে তিরস্কারের অতীত। মানবীর অঙ্গে রূপের

মাধুরীর সঙ্গে মোহ আছে, তাই তারও লজ্জা আছে, তার দিকে তাকাতেও লজ্জা আছে। চাঁদের শুধু রূপের মাধুরীই আছে, মোহ নেই।

মাধবানন্দ একেবারে মুক্ত অঙ্গনতলে নেমে এসে দাঁড়ালেন। নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে দিলেন বনভূমির মাথার উপর। মেঘের অবগুণ্ঠনে ঢাকা চাঁদের ওই অপরূপ মাধুরী বনভূমির মাথায় মাথায় রূপালী রেখার একখানা মায়া-জালের মত বিছিয়ে রয়েছে। সদ্য-বর্ষণস্নাত শালের ঘনশ্যাম পাতাগুলির উপর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত আলোর ঝিকিমিকি ঠিকরে পড়ছে। মাঝে মাঝে বাতাসের আন্দোলনে পাতার দোলায় দোলায় যেন এই নিবছে এই জ্বলছে, আলো যেন পাতার মাঝে ডুব দিচ্ছে আবার ভেসে উঠছে।

মাধবানন্দ ধীরে ধীরে এসে নিমগাছের তলায় পাথরখানির উপর বসলেন। পাথরখানা এখনও ভিজে রয়েছে, গাছের পল্লব থেকে টোপায় টোপায় জল ঝরছে মধ্যে মধ্যে। থাক্ ভিজে, পড়ুক জল, তিনি পাথরখানার উপর বসলেন। মন বাঁধা পড়েছে এবার প্রকৃতির রূপের খেলায়। সম্মুখে অজয়, ওপারে কেন্দুবিল্ব ; মনে পড়ল গীতগোবিন্দ।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার সঙ্গে আজ ঠিক মিলছে না। "মেঘৈর্মেদুর-মম্বরং বনভূবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ।" অম্বর আজ মেঘমেদুর নয় ; বনভূমি সুশ্যাম, তমাল না হোক—শালতরুর শ্যামলতা গাঢ়ই বটে। জ্যোৎস্নার আলোয় শ্যাম আভা যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে। মেঘাড়ম্বর বিষণ্ণ নয়—প্রসন্ন। দীপ্তিমতী হয়ে এমন হলে বালক কৃষ্ণকে রাধার হাতে দিয়ে নন্দ তাকে গৃহে পৌঁছে দেবার কথা হয়তো বলতেন না।

আবার মন ফিরে এল বাস্তব বর্তমানে, আজকের দিনের ঘটনাবর্তে, উদ্বিগ্ন চিন্তায়। মানুষের সাড়া উঠছে নিকটেই কোথাও। একদল লোক যেন কলকল করতে করতে আসছে।

ফিরল? তা হলে কেশবানন্দরা ফিরল পাষণ্ডদলন করে, অসহায়াকে উদ্ধার করে? আসন থেকে উঠে পড়লেন। এসে দাঁড়ালেন আশ্রমের ফটকে। কথা এবার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

—তিন পোর চেঁয়ে বেশী হবেক আমি বলে দেলম। এক শ্যার কর‍াকরি।

—হঁ। এক স্তার লয়, এক মণ। মাগুর লয়, কুমীর বটে উটা তোর। হঁ।

—উ রি মা রে! উ রি মারে! উ! উ! উ! আর্ত নারীকণ্ঠ!

—সাপ! সাপ! সাপ!

কলরব উঠল। পর-মুহূর্তেই আর্ত কলরব হাসিতে ভেঙে পড়ল।

—মরণ দশা, ল্যা-লীর দড়িতে পা দিয়ে (খড়ের দড়িতে) ঢঙ দেখ ছুঁড়ীর!

—হি-হি-হি! মাইরি বলছি, তুর কিরে (দিব্যি) আমি বলি গেলম, লিলেক আমাকে যমে, খেলেক কালে। অমন মাগুর মাছটো আর খ' হল নাই আমার। হি-হি-হি!

নারীকণ্ঠের কৌতুকহাস্যে বনের পল্লবদল যেন চকিত হয়ে উঠছে। পল্লীবাসী দরিদ্রের দল, আজ এই বর্ষণের পর নালায় খালে জলের ঢল নামার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিল মাছের সন্ধানে। মাছ ধরে ফিরছে। কেশবানন্দেরা নয়। কিন্তু ওরা কি ওপারের কোনও কোলাহল শোনে নি? নিস্তব্ধ রাত্রি, অজয়ের ওপারের কোলাহল এপারে আসবে না? এত বড় কোলাহল! এ কোলাহল তো ক্ষুদ্র হবে না!

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ডাকলেন, কারা যায়! কারা তোমরা?

—আমরা গ। গাঁয়ের লোক। মাছ-ধরনে যেয়েছিলাম গ।

—অজয়ের ধার থেকে আসছ তোমরা?

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে আসতে প্রশ্ন করলেন মাধবানন্দ এবং কথা শেষ হতে হতে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে চিনতে তাদের দেরি হল না। তখন মেঘ কেটে খানিকটা নীল আকাশের প্রকাশ হয়েছে প্রায় মাথার উপর, আধখানা চাঁদ তার মধ্যে পূর্ণ জ্যোতিতে দীপ্যমান। তাঁকে চেনবামাত্র তারা সসম্ভ্রমে বললে, গোসাঁই-বাবা মহারাজ!

—হ্যাঁ। অজয়ের ওপার থেকে কোনও গোলমাল শোন নি তোমরা?

—গোলমাল? আজ্ঞা, কই না তো! বরং চুপচাপ গ সব। বাদলের ঠাণ্ডিতে সব ঘুম দিছে লাগছেক।

—হুঁ। আচ্ছা, তোমরা যাও।

চিন্তিত মনে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। গ্রাম্য লোক কটি তাঁর স্তব্ধতার গাম্ভীর্যে শঙ্কিত হয়ে আর দাঁড়াতে সাহস করলে না, নীরব হয়েই স্থান ত্যাগ করলে।

মাধবানন্দ কণ্ঠস্বর উচ্চ করে ডাকলেন, গোপালানন্দ!

আশ্রমের ফটক থেকেই সাড়া দিল গোপালানন্দ: গুরু মহারাজ! গুরু মহারাজ আশ্রম ছেড়ে বাইরে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। মাধবানন্দ লোক কয়টির সামনে দাঁড়ালেন যখন, তখন সে ফটকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। মাধবানন্দ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, সেও আছে।

সাড়া দিয়ে সে এসে কাছে দাঁড়াল। বলিষ্ঠদেহ স্থূলবুদ্ধি গোপালানন্দ, গুরু মহারাজের আশেপাশে ঘোরে মন্ত্রমুগ্ধ পোষা বাঘের মত। গুরু বসে থাকেন, সে তাঁর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। গুরু মহারাজ স্তোত্র পাঠ করেন, সে দূর থেকে উৎকর্ণ হয়ে শোনে। পোষা পাখির মত শুনে যতটা আয়ত্ত হয়, সেইটুকুই ঠিক তেমনিভাবে, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত নকল করে আবৃত্তি করতে চেষ্টা করে। ভালবাসে হৃষ্টপুষ্ট গাভী কটিকে। মধ্যে মধ্যে অকারণে কাঁদে। প্রশ্ন করলে স্থূলদৃষ্টি মেলে উত্তর দেয়: ভর দুনিয়া দুখ, দুখ আওর দুখ মালুম হোতা হ্যায়—ওহি দুখসে রোতা হ্যায় মহারাজ।

কতদিন মাধবানন্দ নিজে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছেন। তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছেন, আনন্দ হ্যায় ভগবানমে। উনকো দর্শন তুমারা মিলেগা বেটা।

মধ্যে মধ্যে সামান্য কারণে রাগে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। তখন সামনে এসে দাঁড়ান কেশবানন্দ। কেশবানন্দকে তার প্রচণ্ড ভয়; মাধবানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণের সময় কেশবানন্দই তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

হাতজোড় করে গোপালানন্দ বললে, গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ বললেন, তুমি গিয়ে অজয়ের ধারে দাঁড়িয়ে থাক। ও-পারে কোন গোলমাল শুনলেই ওখান থেকে শিঙা বাজিয়ে আমাকে জানাবে।

ও-পার থেকে কেশবানন্দরা ফিরছে দেখলেই বা বুঝলেই আমাকে এসে খবর দেবে।

গোপালানন্দ বললে, হাঁ গুরু মহারাজ।

—শিঙা নিয়ে যাও গোপালানন্দ।

যেতে যেতে ফিরে গোপালানন্দ সবিনয়ে হেসে বললে, হাঁ হাঁ বাবা গুরু মহারাজ।

শিঙা নিয়ে সে চলে গেল; তার মোটা গলার গান ক্রমশ দূরে চলে গেল।

"তনি সুখ মিলে ভিখ্‌দাতা
সুখদাতা।"

* * *

মুহূর্ত দীর্ঘ হয়ে যেন প্রহর মনে হচ্ছে। সময় চলছে না। এরই মধ্যে দ্বিপ্রহর ঘোষণা করে শিবারব ধ্বনিত হল; প্যাঁচারা ডাকল, বাদুড়েরা উড়ল। আর থাকতে পারলেন না মাধবানন্দ, নিজেও বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়ে পড়বার সময় তরবারিখানি টেনে নিলেন কংসারির বেদী থেকে।

কী হল? কেশবানন্দেরা ভয়ে পারলেন না অগ্রসর হতে? প্রথম উদ্যমেই ব্যর্থতা? দু পাশের ঘন শালবনের মধ্যে এখনও জলস্রোত নামছে; পায়ের তলায় রাঙা মাটি নরম হয়ে খানিকটা পিছল হয়েছে। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। পথও ভাল দেখা যাচ্ছে না। সেই ছায়াচ্ছন্ন জ্যোৎস্নার দীপ্তিময় শ্যামবর্ণাভা যেন ম্লান হয়ে গেছে। ও! আকাশে মেঘ আবার গাঢ় হয়ে উঠছে; পশ্চিম দিগন্তে আবার একখানা নিকষ-কালো মেঘ মুখ বাড়িয়ে বুক পর্যন্ত যেন এগিয়ে আসছে। তারই প্রথম অংশটা চাঁদকে ঢাকছে। অন্ধকার মুহূর্তে মুহূর্তে ঘন হচ্ছে যেন মহাকাল-প্রেয়সী সতী দক্ষযজ্ঞের সূচনায় শ্যামা থেকে কৃষ্ণা কালী হয়ে উঠছেন।

অকস্মাৎ নিশীথ-রাত্রির এই কৃষ্ণরূপান্তর চকিত হয়ে উঠল বিদ্যুৎ-চমকের দীপ্তিতে, তারই সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শিঙা বেজে উঠল। মাধবানন্দ উল্লসিত হয়ে প্রাণ খুলে ডাক দিয়ে উঠলেন, জয় কংসারি!

তাঁর ডাক শেষ হতে হতে মেঘ ডেকে উঠল গুরু গুরু গুরু গর্জনে।

কিন্তু সে গর্জন মাধবানন্দের মনে যেন ধরাই পড়ল না। মনে হল, গোপালানন্দের শিঙাধ্বনিই দিগ্‌দিগন্তে বিপুল হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চলছে।

—জয় কংসারি! তোমার নির্দেশ, তোমার ভক্তদের মধ্যে সার্থক কর। পাপীর ক্ষয় হোক, সাধু পুণ্যাত্মার জয় হোক; নিরীহ, অসহায়, পরিত্রাণ লাভ করুক।

দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন তিনি। হ্যাঁ, তিনিও কোলাহল শুনতে পাচ্ছেন। ও-পারে আ-আ-আ ধ্বনি উঠছে। প্রচণ্ড কিছুর আঘাতশব্দ উঠছে যেন— ভুম-ভুম্-ভুম্। বোধ করি দে-সরকারের বড় দরজায় ঢেঁকির ঘা পড়ছে। ঢেঁকি দিয়ে ঘা মারলে গড়ের দরজাও ভেঙে পড়ে। বড় বড় জমিদারের ঘরে ডাকাতেরা এই ভাবেই দরজা ভাঙে।

সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ডাকাতি! এ কি ডাকাতি নয়? স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন মাধবানন্দ। কতক্ষণ তার স্থিরতা নেই। তিনি যেন পাথর হয়ে যাচ্ছিলেন। উপায় নেই। আর মুক্তি নেই। ও-পারের কোলাহল বাড়ছে। মধ্যে মধ্যে মেঘ ডাকছে। কোথায় যেন বাজ পড়ল, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-দীপ্তি, পরক্ষণেই ভয়ঙ্কর মেঘগর্জনে সব কেঁপে উঠল। সেই মুহূর্তেই নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার ধ্বনিত হয়ে উঠল কোথাও। কাছেই কোথাও। যেন ওই নদীর ধারে!—আ—

মাধবানন্দের সর্বশরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। তিনি ছুটলেন।

—আ—। ছেড়ে দাও। বাঁচাও। আ—

মাধবানন্দ দিক লক্ষ্য করে ছুটে এসে উঠলেন অজয়ের বাঁধের উপর। চিৎকার করে ডাকলেন, গোপালানন্দ!

একটা ক্রুদ্ধ জান্তব গর্জনে উত্তর এল: আঃ—

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিদ্যুৎ চমকের মধ্যে মাধবানন্দ দেখলেন, এই দিকেই ছুটে আসছে একটি বালিকা—কিশোরী। চকিতে দেখাতেই মনে হল অপরূপা মেয়ে। তার পিছনে দুই বাহু বিস্তার করে ছুটে আসছে লালসায় উন্মত্ত দানবের মত গোপালানন্দ।

মাধবানন্দ কঠোর চিৎকারে শাসন করে হাঁক দিলেন, গো-পা-লা-ন-ন্দ! মেয়েটি সেই মুহূর্তেই তাঁর পায়ে এসে চিৎকার করে আছাড় খেয়ে পড়ল:

ওগো গো-সাঁ-ই! কে? মোহিনী? কিন্তু সে দেখবার তখন সময় ছিল না। তার পিছনে কামার্ত গোপালানন্দ সেই ক্রুদ্ধ জান্তব চিৎকারে উত্তর দিল: আঃ! চোখ দুটি তার জ্বলছে। উন্মত্ত দৃষ্টি, পাশব কামার্ততায় সে ভ্রূক্ষেপহীন, তার জ্ঞান বুদ্ধি ভয় সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সে গুরু মহারাজকে চিনতে পারছে না। দাঁতে দাঁত টিপে, কঠিন আক্রোশে সে তাঁর উপর আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে।

মাধবানন্দ মুহূর্তে তাঁর হাতের তরবারিখানার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ বিদ্ধ করে দিলেন গোপালানন্দের বুকে। উষ্ণ তরল একটা ধারা পিচকারির মুখের ধারার মত তাঁর দেহে এসে লাগল। বারেকের জন্য চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। চোখে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, রঙ কালো মনে হচ্ছে আলোর অভাবে কিন্তু উষ্ণ স্পর্শে, গাঢ়তায়, গন্ধে বলে দিচ্ছে—রক্ত।

মাথার মধ্যে যেন বজ্রপাতের বিদ্যুদ্দীপ্তি খেলে গেল। তীব্রতম উত্তেজনায় থরথর করে কেঁপে উঠলেন মাধবানন্দ। জীবনে তাঁর এই প্রথম স্বহস্তে অস্ত্রাঘাতে আততায়ীকে হত্যা। অসহায়া ভীতার্তা একটি কুমারীকে রক্ষা করতে, কামোন্মত্তায় হিংস্র পশুতে পরিণত গোপালানন্দের দানবের মত শক্তিকে প্রতিহত করে তাকে হত্যা করেছেন। গোপালানন্দ তাঁর শিষ্য। সে তাঁর সন্তান হলেও এমনি দৃঢ়হস্তে তরবারি ধরতেন তিনি। দুই কানের পাশ দিয়ে যেন আগুনের উত্তাপ অনুভব করছেন। চোখ যেন জ্বলছে। প্রবল বর্ষণসিক্ত দিনটির বাতাসের শৈত্য স্নিগ্ধ বলে মনে হচ্ছে।

পরক্ষণেই হতচেতন মেয়েটিকে কাঁধের উপর তুলে নিলেন এবং দৃঢ় মুষ্টিতে রক্তাক্ত তরবারিখানা ধরে অকারণে উদ্যত করে ফিরলেন। আশ্রমে ফিরে মন্দিরের দাওয়ার উপর নামাতে গিয়ে নামালেন না। এদিকের সেবকদের ঘরের দাওয়ায় ধুনি অর্থাৎ অহরহ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডটার পাশে মেয়েটাকে নামিয়ে দিলেন। মেয়েটার বেশবাস সর্বাঙ্গ জলে ভিজেছে, হাত দুটোর স্পর্শ যেন হিমের স্পর্শ। ধুনির কাঠগুলি একটু ঠেলেও দিলেন।

তারপর নিজে ঊর্ধ্বলোকে মুখ তুলে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রবল একটা গতিবেগে তিনি যেন ভেসে চলেছেন।

নিয়তি ? বুঝতে পারছেন না, তাঁর মন এবং মস্তিষ্ক যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। তিনি যেন নিজে চলছেন না। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন—আঃ, তারপর কী ? স্মৃতিও যেন বিস্মৃতির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হারিয়ে যাচ্ছেন নিজে।

একসময় করুণ আবেগভরা নারীকণ্ঠের মৃদুস্বরে এবং পায়ের উপর কোমল কিছুর স্পর্শে চমকে উঠলেন মাধবানন্দ।—কে ?—ওঃ, সেই মেয়েটি ! সচেতন হয়ে উঠলেন এতক্ষণে। দৃষ্টি নামালেন।

কখন চেতনা পেয়ে মেয়েটি উঠে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ে বলছে, দয়াময় নবীন গোসাঁই ! ঠাকুর ! ওগো দেবতা !

এ কী, এ যে মোহিনী ! হ্যাঁ, এ তো মোহিনী ! সেই ভাষা।

—ওঠ। ওঠ, তুমি ওঠ। পা ছাড়। ওঠ।

তাঁর বাক্য অবহেলা করবার মত শক্তি মোহিনীর নেই, সে পা ছেড়ে উঠে হাত জোড় করে নতজানু হয়ে দেবতার সম্মুখে পূজার্থিনীর মত বসল।—তোমার দয়া ছাড়া আমি বাঁচতাম না গোসাঁই। ঠাকুর, তুমি আমার সাক্ষাৎ ভগবান।

এর উত্তর দিতে পারলেন না মাধবানন্দ। ওদিকে ধুনির আগুন চমকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই আগুনের আভা পড়েছে মোহিনীর সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য মনে হচ্ছে। এ তো ভিখারিণী অসহায়া মেয়ে নয়, এ যে কোন অপরূপা রাজনন্দিনী, মহার্ঘ বেশবাস, কপালে চন্দনের ছাপ, চোখে কাজল। কেমন করে হল ? তবে কি—

॥ চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ॥

ওই কটি কথা বলেই যেন সকল আবেগ শেষ করে নিঃশেষ হয়ে গেছে মোহিনী। ক্লান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েছে ছিন্নমূল লতার মত। চোখ দুটি আপনা থেকে বুজে আসছে, মধ্যে মধ্যে ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। উপবাসক্লিষ্ট বিশীর্ণ মুখ। তার সে মুখ দেখে করুণা না হয়ে পারে না। চোখ থেকে জলের ধারা নেমে আসছে।

মাধবানন্দ অধীর হয়ে উঠলেন। অন্তরে মমতা বিগলিত তুষারের মত স্রোতবতী হয়ে উঠছে, অন্য দিকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্বেগে উত্তেজনায় তিনি আগ্নেয়গিরির মত উত্তাপে বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছেন। ওই কলুষিত দেহটাকে বাঁচাতে নরহত্যা করলেন তিনি? আত্মা মরেছে অক্রূরের হাতে? তার কী হল? তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। আবার প্রশ্ন করলেন, কী হয়েছে বল? তুমি একা কেন? একলা তুমি কেমন করে এলে?

—অজয় পার হয়ে বনে বনে অজয়ের ধারে ধারে পালিয়ে এসেছি গোসাঁই। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, তুমি আমাকে বাঁচাও।

—তুমি বেঁচেছ?

এ প্রশ্নে অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল সরলা গ্রাম্য কিশোরীটি।

—যদি বেঁচেছ তো এই প্রেতিনীর সাজ কেন তোমার? অক্রূর তোমাকে—

এবার বুঝল মোহিনী। ঘাড় নেড়ে স্মিত হেসে বললে, না, সে আমাকে ছুঁতে পারে নি, সেও তো তোমার দয়া ঠাকুর। ওদের বাপ-বেটাকে

যে ফৌজদার ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেও তো তুমি চিঠি নিকে দিয়েছিলে গোসাঁই। বিকেলে ফিরে এসে বড় সরকার আমাকে বললে—তোর নবীন গোসাঁই তোকে ছাড়িয়ে নিতে ফৌজদারকে চিঠি নিকেছিল, এবার কী করে ছাড়ায় দেখি! কায়স্থ বৈষ্ণবের ছেলের সেবাদাসী হতিস, এবার যা, নবাবী হারেমে বাঁদী হয়ে থাকবি, যা। আমাকে সাজিয়ে-টাজিয়ে নৌকায় তুলে দিয়েছিল সন্‌জের সময়। ভোর ভোর আমাকে শহরে নবাবের কাছে নিয়ে যেত।

সঠিক বুঝতে পারলেন না মাধবানন্দ—কী বলছে মোহিনী। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, নবাবের কাছে পাঠাচ্ছিল তোমাকে?

—রাজনগরে রাজার কাছে ঘোরস'র (সওয়ার) পাঠিয়েছিল বড় সরকার। বুদ্ধি খাটিয়ে চিঠি নিকেছিল—

বড় সরকার—রাধারমণ দে শুধু কৃতী ব্যবসায়ীই নয়, তার সঙ্গে সে কূটবিষয়বুদ্ধিতে চতুর তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। ফৌজদার হাফেজ খাঁ উদার মুসলমান, ন্যায়বান শাসক। তিনি পত্র পড়ে অভিভূত হয়ে, ভোর-রাত্রে সওয়ার পাঠিয়ে, সরকারদের পিতাপুত্রকে নিজের কাছারিতে হাজির করেছিলেন। কিন্তু রমণ সরকার হাতেমপুর রওনা হবার পূর্বেই ফৌজদারের লোক্‌দের কাছে সকল বিবরণ জেনে নিতে কিছু অর্থব্যয় করতে কার্পণ্যও করে নি, ভুলও করে নি। এবং রাজনগর দরবারে একখানি পত্র লিখে দ্রুতগামী সওয়ারের হাতে দিয়ে দুটি মূল্যবান পারস্যসাগরের মুক্তা ও স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে, গোবিন্দ স্মরণ করে, নির্ভয়ে রওনা হয়েছিল। তাতে সে লিখেছিল—মহামহিমান্বিত প্রবলপ্রতাপ ন্যায়বিচারকারী বীরভূমাধিপ শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজনগর-রাজ জনাবআলি বাহাদুরের সমীপে ইলামবাজার-অধিবাসী পুরুষানুক্রমে রাজানুগত তুলা ও গালা-ব্যবসায়ী রাধারমণ দে-সরকারের একান্ত বিনীত আরজি এই যে—। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দে-সরকার মুহূর্তের চিন্তায় আশ্চর্য কার্যকরী প্রতিরোধ-পন্থা আবিষ্কার করেছিল।

নবাব সুজাউদ্দিন গত। নবাবজাদা সরফরাজ খাঁ মসনদে বসেছেন।

সরফরাজ খাঁর চরিত্র অতি বিচিত্র। তাঁর হারেমে প্রায় হাজারখানেক উপপত্নী। কেউ বলে—নারীবিলাসী কামুক, কেউ বলে—নাবাবজাদার বিচিত্র ধনসাধন-পন্থায় ওরা তাঁর সহচরী। উপপত্নীর অসুখ হলে নবাবজাদা কোরান মাথায় সারাদিন প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকেন। দে-সরকার নিজেও নারী নিয়ে ধর্মসাধনা করেছে। চতুর ব্যবসায়ী, টাকা-আনা-পাই নিয়ে সারাদিন অঙ্ক কষে; গুদামে মাল বোঝাই করে ধরে রেখে ছ মাস পরের বাজার-দর বাঁধে। সে হিসেব করেই রাজনগরের রাজাকে জানাল যে, ভাবী নবাব সাহেবের ধর্মসাধনার পথে সহায় হইবার যোগ্যতা আছে এবং সেবায় তাঁহাকে তুষ্ট করিবার নিষ্ঠা আছে দেখিয়া একটি বৈষ্ণব-বালিকাকে তাহার মায়ের কাছ হইতে উচিত মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া অন্যান্য উপঢৌকনসহ তাহাকে রাজধানী মুরশিদাবাদে ভেট পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছি। এবং নিজের জন্য রায় খেতাব প্রার্থনা করিয়াছি। কিন্তু অজয়ের ওপারে গড়জঙ্গলে আগন্তুক এক ধর্মান্ধ সন্ন্যাসী ইহাতে হিন্দু-কন্যা মুসলমানের হাতে সমর্পণ করা হয়—এই অজুহাত তুলিয়া হাতেমপুরের নূতন ফৌজদার সাহেবের বরাবর এক পত্র পেশ করিয়াছে। সন্দেহ হয়, এই বৈষ্ণব সাধু নিজেই নবাবের নামে ক্রয়-করা এই অপরূপ গুণ ও রূপবতী কুমারীটিকে মনে মনে কামনাও করে। হাতেমপুরের ফৌজদার বয়সে নবীন—ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্য অধীনকে এবং তদীয় পুত্রকে একরূপ গ্রেপ্তারই করিতেছেন।

এর ফলে বেলা দুপহর নাগাদ রাজনগর থেকে সওয়ার এসে হাতেম-পুরের ফৌজদারী কাছারিতে নবাবী হুকুমত জারি করে দে-সরকারদের পিতাপুত্রকে মুক্তি দেয়। সেই দেখেই কয়ো ছুটে এসেছিল আশ্রমে। কয়োর সংবাদ নিয়েই কেশবানন্দরা বের হয়ে গেছে। কয়ো একটা সংবাদ পায় নি। সে সংবাদ হল এই যে, রাজনগরের রাজার আরও একটি হুকুম ছিল। সে হুকুম দে-সরকারের উপর। হুকুম ছিল, ওই বাঁদীকে ভেট সহ অবিলম্বে আগামী প্রত্যুষের মধ্যে যেন মুরশিদাবাদ রওনা করা হয়। এই হুকুম খেলাপে দে-সরকারকে মন্দ অভিপ্রায়ের জন্য দায়ী করা হইবে।

রাজনগরের ঘোড়সওয়ার নিজে দাঁড়িয়ে, মোহিনীকে নৌকায় চাপানো দেখে তবে রাজনগর ফিরে গেছে। দে-সরকার আপসোস করে বলেছিল,

রাজকুল, চিরকালই বুনো তেঁতুলের মত জোঁদা টকই থাকল রে বাবা, যত গুড় দিয়েই রাঁধ না কেন, খেলে শুধু অম্বল নয়—অম্বলশূল হবে।

সাজিয়ে-গুজিয়ে মোহিনীকে নৌকায় তুলে দিয়ে, তার সঙ্গে গালার খেলনা, মসলিন, বিষ্ণুপুরের রেশমী কাপড় এবং আরও নানান জিনিসে নৌকা সাজিয়ে, মাল্লা-মাঝি এবং পাহারাদার জিম্বা করে নেমে যাবার সময় দে-সরকার মুখভঙ্গি করে মোহিনীকে বলেছিল, যাও, নবাবী হারেমে গিয়ে বাঁদীগিরি কর, গরম গোস্ত আর প্যাঁজ-রসুনের কালিয়া পোলাও খেয়ে বষ্টুমী-জন্ম সার্থক কর। তোমার নবীন গোসাঁইয়ের বাবার বাবা এলেও এ থেকে রক্ষে নাই।

জিম্মায় রেখে গিয়েছিল জন দুই পাইক আর মাল্লাদের। কিছুক্ষণ পর এসেছিল ফুলজান বিবি, সে তার সঙ্গে যাবে।

অতি সরল, ভীরুপ্রকৃতির মেয়েটি প্রথমটায় দে-সরকারের এত কথা শুনেও বুঝতে খুব কমই পেরেছিল। যেটুকু বোধশক্তি, তাও ভয়ে বিহ্বলতায় দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। এমন মনোহর সাজে সেজে নৌকায় চড়ে এইটুকু শুধু বুঝেছিল যে, তাকে নবাবী হারেম নামক কোন জায়গায় পাঠানো হচ্ছে। নৌকার ছইয়ের মধ্যে খাঁচায় বন্দিনী হরিণীর মত দু পাশের দুটি ছোট ঘুলঘুলির কাছে এসে বাইরের দিকে চেয়ে ভয়ার্ত এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রবল বর্ষণ নামল, দুই পারের সমস্ত-কিছু বর্ষণধারার মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেল। তারপর সন্ধ্যা হল, রাত্রি নামল, সে একসময় ক্লান্ত হয়ে পাটাতনের উপর বিছানো একখানা শতরঞ্চির উপর বসে পড়ল। অন্ধকার হয়ে গেছে ছইয়ের ভিতর, সেই অন্ধকারই যেন পৃথিবীজোড়া অন্ধকার, তারই মধ্যে সে ডুবে গেছে। মাল্লারা বাইরে খানিকটা ঢাকা অংশের মধ্যে তামাক খেতে খেতে গল্প করছিল ফুলজান বিবির সঙ্গে। ফুলজান বিবি ইলামবাজারের গালার চুড়ির বিখ্যাত চুড়িওয়ালী। সে বরাত দিয়ে চুড়ি তৈরি করিয়ে হিজড়ে ঝাঁকাওলীর মাথায় চাপিয়ে বড় বড় জমিদার মহাজন থেকে কাজী ফৌজদার মনসবদার সাহেবদের অন্দরে গিয়ে বহু-বেটী-বিবিদের চুড়ি পরিয়ে আসে। বছরে দু-তিনবার মুরশিদাবাদ যায়, তখন সুবা বাংলার সুবাদার, নবাব বাহাদুরের

হারেমে গিয়ে চুড়ি পরিয়ে আসে। হারেমের খোজা বাঁদী বেগম, এমন কি নবাবও তাকে চেনেন। নবাব সুজার ফররা-বাগেও সে অনেকবার গিয়েছে। চেহেল-সেতুনের সব সে চেনে। বিশেষ করে নতুন নবাব সরফরাজ খাঁ তাকে ভাল করে চেনেন। হাজারখানেক বেগম। নবাবের খেয়ালে সব বেগমকে কখনও একরকম চুড়ি পরিয়েছে, কখনও রকম রকম পরিয়েছে। ফুলজান প্রৌঢ়া কিন্তু সাজ-সজ্জা করে তরুণীর মত। পান এবং দোক্তার সঙ্গে তার ফুরসি নিয়ে সে মাল্লাদের গাল দিচ্ছিল আর গল্প করছিল: উল্লু—বুরবক—ছোট জাত—ছোট আদমী, জহান্নমে যা। এই তোরা ছিলম বানিয়েছিস! তোবা—তোবা—তোবা! আমার খুসবইদার তমকুল এমন করে বানালি যে সব বরবাদ হয়ে গেল! নবাব সুবাদার হলে কী করত জানিস রে বেকুফ! ফুরসির নল সটাকসনি আছড়ে ফেলে হাঁকত—আবে কৈ হায় রে? কোতল করনা ছিলমবরদারকো। হঁ! দে রে বুরবক, উল্লু, বন্দর, একটা কাঠি-উঠি দে; খুঁচে-খেঁচে দেখি কী হয়! আরে, বোলাও না, ওহি লেড়কীকে বোলাও; তম্‌কুল পিলাতে তালিম দেই দি। নবাবী হারেমে যাবে, আর ওর যা সুরত, আর নতুন নবাবের যা নজর, তাতে ওর নসীব খুলবে। সঙ্গে সঙ্গে হারেমে কি ফররা-বাগে ভেজবে। একদিনমে বেগম বনেগী। পেশোয়াজ ওড়না পরিয়ে কিংখাবের বিছানায় বসিয়ে বাঁদীরা শরবৎ আনবে, তারপর পান, তারপর হাতে তুলে দেবে ফুরসির নল। বেকুফের মত টেনে কেশে মরবে। বমি করবে।—তার চেয়ে আন ওকে, তালিম দেই দি। নসীবওয়ালী গরিবের বেটী হত—ভুঁড়িওলা তুলাবেচা সরকারের ওই ভাল্লুর মত বেটাটার বাঁদী, নয়তো ওই ওপারের ওই যে নতুন হিন্দু ফকির—ওরই পোষা কুত্তি, তা না। একদিনে নসীব খুলল, চলল শহর মুরশিদাবাদ, সুবা বাংলার সুবাদার জঙ্গ বাহাদুর নবাব-উল-মুল্‌ক্ সরফরাজ খাঁ বাহাদুরের চেহেল-সেতুন না হয় ফররা-বাগ! হা-রে-হা! হা-রে-হা! নে, কই হয়েছে, দে দেখি টেনে। তুই বেটা টেনে টেনে এতনা ধুঁয়া নিকাললি রে কি কই ইটাকে ভাঁটা মে আগ লাগা মালুম হোতা। ছোটা আদমী, ছোটা জাত, উল্লু বান্দর কাঁহাকা! আমার যদি একতিয়ার থাকত তো তোদের চাবুক লাগাতাম। আর ওই হিন্দু ফকিরকে ধরে এনে কলমা

পড়িয়ে এক বুঢ্ঢীর সঙ্গে নিকা দেওয়াতাম। হাঁ। এই এমন ছোকরী, তার উপর তার নজর!

মাল্লা একজন বলেছিল, আমাদের গাল দিচ্ছ দাও, নবীন গোসাঁইকে নিয়ে পড়লে কেনে? সে কী করলে?

—হাঁ? কী করছে? কেয়া কিয়া হায়? ওহি ওহি ফকির তো সব করলে রে বুরবক! ওর নজর ছোকরীর উপর ছিল কিনা—তাই কউয়ার পাশ যব শুনলো কি, অক্রুর ছোকরীকে ঘর মে লে গিয়া, কাল পূর্ণমাসী রোজ, উসকী সেবাদাসী বানা লেগা, ব্যস—এক চিঠ্ঠি লিখা ফৌজদার হাফেজ খাঁ বরাব্বর। হঠ্, হঠ্, পানের পিচ ফেলে নিই আগে।

পানের পিচ ফেলে নতুন পান জর্দা খেয়ে খুসবইওয়ালা তমকুলের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ফুলজান বক বক করে বকে একলাই নদীর বুকে নৌকার মজলিসটি জমিয়ে রেখেছে।

মোহিনী উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেই চলেছে। যতই শুনেছে, ততই বেদনা, নৌকার তলায় অজয়ের জলের মতই বেড়ে চলেছিল। নৌকাখানার দোলা বাড়ছিল, ছলছল শব্দ ক্রমশ যেন কলকল ধ্বনিতে রূপান্তরিত হচ্ছিল, সেই শব্দের অন্তরাল দিয়ে মোহিনী কাঁদতে কাঁদতে একটি কথাই বলে চলেছিল—ওগো গোসাঁই, ওগো দেবতা, যদি ওই অক্রুরের মত কুমীরের হাত থেকে বাঁচালে, এতই দয়া যদি করলে, যদি দাসী হিসেবেই আমাকে চেয়েছ, তবে মাঝনদীতে ছেড়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিলে কেনে? আমি যে সাঁতার জানি না দয়াল! কুমীর ছেড়েছে, এখন ভেসে চলেছি হাঙরের দহে। দেবতা, নবাবের হাত থেকে বাঁচাতে তুমি ভগবানকে খত নিকলে না ক্যানে? তোমার খত তো তাঁর দরবারে পৌছয়! ঠাকুর! দয়াল! ওগো নবীন গোসাঁই!"

এরই মধ্যে শেয়াল ডাকল, রাত্রি এক প্রহর হল। ফুলজান ছইয়ের মধ্যে এসে খানা নিয়ে বললে, খা, ছোকরী, খেয়ে নে! বাইগুনের কাবাব আছে, রোটী আছে, ঠাণ্ডি ভাত আছে, পিঁয়েজ দিয়ে বহুত তরিবত করে কুরতি

কলাইবাটা আছে, পুঁটিমাছের কালিয়াভি আছে। খা। পোলাওয়ের থারি, মুরগ মসল্লম খাবি ছুদিন পর, তখন দেখিস ফুলজানের হাতের পাকানো খানা ভাল, না, নবাবের বাবুর্চিখানার খানা পাকানো ভাল!

মোহিনী শুধু ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, সে খাবে না।

ফুলজান আরও বার দুয়েক খেতে বলে আর বলে নি, নিজেই খেতে বসে গিয়েছিল। বকা ফুলজানের স্বভাব, খাবার সময়েও বকেই চলেছিল। মোহিনীকেই বকছিল ফুলজান। ছোট জাত, ছোটলোকের বেটীর মন কি ফুলজান জানে না? জানে। তা না-খেয়ে কদিন থাকবি থাক্। কদিন ওই হিন্দু ফকিরের খুবসুরত মুখখানা ভেবে না-খেয়ে থাকা যায় দেখবে সে। আর ওই হিন্দু ফকিরকেও দেখবে সে। নবাবকে বলবে, ওকে কলমা পড়িয়ে ফুলজানের হাতে দাও, সে ওকে শায়েস্তা করে দেবে।

খাওয়া শেষ করে পান তামাক খেয়ে শুয়েই সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে শুরু করেছিল সে। মাঝিমাল্লারাও ঘুমিয়েছিল, ইলামবাজারের বাজার ঘুমিয়েছিল, ঘুমোয় নি বাতাস, ঘুমোয় নি অজয়ের ধারের শালবনের পত্রপল্লব, ঘুমোয় নি অজয়ের জল। বাতাসে শালবনের শাখাপল্লবের সন-সন সোঁ-সোঁ শব্দ কখনও কম হচ্ছিল, কখনও বাড়ছিল—অজয়ের কল-কল শব্দ বেড়েই চলেছিল। জেগে ছিল শুধু ছইয়ের দরজায় দে-সরকারের পাইকটা, সে মধ্যে মধ্যে গাঁজা খাচ্ছিল এবং অশ্লীল গান গেয়ে চলেছিল। আর জেগে ছিল মোহিনী। শুদ্ধ হয়েই পড়ে মনে মনে ভাবছিল, হায় গোসাঁই! গোবিন্দের দরবারে কেনে তুমি জানালে না নবীন গোসাঁই?

হঠাৎ একটা বিপুল কোলাহল উঠেছিল কোথায়। আতঙ্ক-করা কোলাহল। কয়েক মুহূর্ত পরেই গোটা নৌকাটা দুলে টলে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কে চিৎকার করে ডেকেছিল, ওরে—ওরে শম্ভা রে! জগা রে!

—কী? কে?

—সর্বনাশ হয়েছে। সরকার-বাড়ির গদিতে ডাকাত পড়েছে। ওরে, আমি ফড়কে বেরিয়েছি। তোদের খবর দিতে এসেছি। আয়, জলদি আয়। ডাকাত।

—বেরত ডাকাতের দল। পঞ্চাশ-ষাট জনা লোক। ঢাল তরোয়াল

শড়কি! পগগর বেঁধে চলে এয়েচে। ঢেঁকি দিয়ে দুয়োর ভাঙছে। চারিদিকে ঠিক ঠিক জায়গায় ঘাঁটি পেতেছে। শিগগির আয়।

—নৌকো?

—থাকুক পড়ে।

তারা চলে গেল। মাল্লারা এবং ফুলজান উঠে বসল। ফুলজান গাল দিতে বসল, নায়েব-নাজিম জঙ্গবাহাদুর মালিক-উল-মুল্‌ক্‌ নবাব বাহাদুরকে বলে, এই ডাকাতের দলকে সে এমন সাজা দেওয়াবে যে, লোকের ডরকে মারে রাত্রে ঘুম হবে না। দু পা ধরে কুড়াল দিয়ে দু দিকে ফেড়ে গাছে টাঙিয়ে দেবে। হাত পা টুকরো টুকরো করে কেটে জানোয়ারকে খাওয়াবে, কোমর পর্যন্ত পুঁতে ডালকুত্তা লেলিয়ে দেবে।

আরও গালাগাল দিত, কিন্তু বাধা পড়ল। আবার একজন ছুটে এল— ওই পাইকদেরই একজন। লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে মোহর জহরতের সেই হাতীর দাঁতের বাক্সটা নিয়ে ঝপ করে অজয়ের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে বললে, পালা, পালা সব। ডাকাতেরা মোহিনীকে লুটে নিয়ে যেতে এসেছে। বড় সরকারকে খুঁটিতে বেঁধে মশালের ছেঁকা দিয়ে শুধুচ্ছে— মোহিনী কাঁহা বাতাও? কয়ো বোরেগী মোহিনী মোহিনী বলে চেল্লাচ্ছে— সাড়া দে মোহিনী, তোকে নিতে এসেছি। মোহিনী! পালা। এখুনি কে বলে ফেলাবে মোহিনী লায়ের ভেতর আছে আর তারা ছুটে আসবে হে-রে-রে-রে করে। পালা। পাঁচ-সাতজনাকে দু ফাঁক করে দিয়েছে। এরা সেই ওপারের সন্ন্যেসীর দল; বর্গীদিকে তাড়িয়েছে; এদের হাতে রক্ষে নাই—

বলতে বলতে সে সাঁতরে ওপারে উঠে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তারপর শব্দ উঠেছিল কয়েকটা। ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঝপ্‌ ঝপ্‌। ফুলজান বু-বু করে কেঁদে উঠেছিল। এবং কয়েকটা বু-বু শব্দের পর অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে নৌকার উপরেই আছড়ে পড়ে গিয়েছিল।

ওগো গোসাঁই! ওগো দেবতা!—ওগো দয়াল! বলে এবার ছই থেকে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে মোহিনী বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন অজয়ের জল গর্ভের সমস্ত বালি ঢেকে কূলে কূলে ভরে উঠেছে।

কলকল শব্দ উতরোল উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। মোহিনী অজয়ের কূলের মেয়ে, সাঁতার তার না-জানা নয়, তার বুকও উল্লাস উচ্ছ্বাসে কানায় কানায় ভরা এই মুহূর্তে। অজয় ছুটেছে গঙ্গার দিকে, তার মন ছুটেছে নবীন গোসাঁইয়ের চরণতলের দিকে, গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে। তবুও সে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। পর-মুহূর্তেই মনে পড়েছিল, মাল্লাদের রান্না-বান্নার জন্য সঙ্গে নেওয়া হাঁড়ি-কলসীর কথা। খুঁজতে বেশী হয় নি, অল্পেই পেয়েছিল; একটা বড় কলসী নিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নৌকো থেকে। খানিকটা স্রোতে টানলেও সাঁতার কেটে কূলে উঠে অজয়ের বন্যারোধী বাঁধ ধরে সে ছুটে আসছিল।—গোসাঁই! দেবতা! দয়াল! চরণে আশ্রয় দাও। বাঁচাও। ঠাকুর!

হঠাৎ পথের উপর সামনে দাঁড়াল গোপালানন্দ।

—কৌন? কেয়া হুয়া? কী হইয়েসে?

একটা আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল মোহিনী। গোপালানন্দ বলেছিল, ডর নেহি—ডর নেহি।

মোহিনী ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

গোপালানন্দও তার দিকে তাকিয়েছিল। অকস্মাৎ একসময় তার দৃষ্টি হয়েছিল নিস্পলক। তারপর সে দৃষ্টির রূপান্তর ঘটতে লাগল। চকমকি-থেকে-ঝরে-পড়া একবিন্দু আগুন যেমন শোলার মধ্যে পড়ে মুহূর্তে মুহূর্তে ঝকমক করে বাড়ে—মুহূর্তে মুহূর্তে দীপ্ত হয় আবার ম্লান হয় ঠিক তেমনি ভাবে গোপালানন্দের দৃষ্টির মধ্যে আগুনের মত একটা কিছু দুটি চোখকে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডে পরিণত করে তুলেছিল। মোহিনী কেন ভয় পাচ্ছিল তার হেতু স্পষ্ট সে জানে না, কিন্তু ভয়ে সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এমন সময় দুই সবল বাহু প্রসারিত করে গোপালানন্দ তাকে জড়িয়ে ধরতে উদ্যত হয়ে বলেছিল, পিয়ারী! আ মেরে পিয়ারী!

চিৎকার করে উঠে মোহিনী পড়ে গিয়ে বাঁধের ঢালু গায়ে খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছিল, তাকে পাবার জন্য উন্মত্ত অধীর পদক্ষেপে ছুটে নামতে গিয়ে গোপালানন্দও পা পিছলে পড়ে গড়িয়ে গিয়েছিল আরও অনেকটা এবং একটা কাঁটার ঝোপে জড়িয়েও গিয়েছিল, কিন্তু তাতে তার ভ্রূক্ষেপ

ছিল না। সবলে টেনে ক্ষতবিক্ষত হয়ে নিজেকে মুক্ত করে উপরে উঠতে গিয়ে আরও দুবার পা পিছলে পড়েছিল। এই সময়টুকুর মধ্যে মোহিনী উঠে আর্তস্বরে চিৎকার করে ছুটেছিল বাঁধের উপরের প্রশস্ত পথ ধরে। পিছনে গোপালানন্দ, দুই বাহু তার প্রসারিত, চোখ প্রদীপ্ত, স্ফুরিত নাসারন্ধ্র।

অকস্মাৎ দেবতার আবির্ভাবের মত সামনে দাঁড়ালেন মাধবানন্দ।

মোহিনী বললে, ঠাকুর, দয়াল, ছামনে দেখলাম তুমি। আঃ ঠাকুর, আমার সব ভয় সব ভাবনা সব দুঃখু চলে গেল, আমি তোমার পা দুটির ওপর গড়িয়ে পড়তে গেলাম, কিন্তু কী হল মনে নাই। সব যেন আঁধার হয়ে গেল। অথৈ অন্ধকার হয়ে গেল স-ব।

* * *

মাধবানন্দ স্থির হয়ে সব শুনলেন। শুনেও স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন, সেই একই ভাবে। ভাবছিলেন ঘটনা একটা ঘটলে তারপর সে চলে আপনার নিজের গতিতে আপন পথে, তখন আর তাকে বল্গাবদ্ধ রথাশ্বের মত চালানো যায় না। সে চলে অজয়ের জলস্রোতের মত। তাঁর ইচ্ছামত ঘটনাস্রোত চলে নি গোপালানন্দ মরল। তাঁকেই মারতে হল; আশ্রমের সেবকেরা দস্যুর মত আচরণ করলে; মুখে কালি মেখে, ফেটা বেঁধে, পাগড়ি বেঁধে, ছদ্মবেশে আক্রমণ, ডাকাতি ছাড়া কী? প্রকাশ্য পরিচয় দিয়ে আক্রমণ করলে না কেন কেশবানন্দ? অবশ্য বুদ্ধির দিক দিয়ে ঠিকই করেছে সে, কিন্তু এ আক্রমণ যে তাঁর নির্দেশে সে কথা তো গোপন নেই। ভবিষ্যৎ ভাবনাও বর্ষার মেঘের বিদ্যুৎরেখার মত মুহূর্তে মুহূর্তে চকিতদীপ্তিতে উঁকি মারছিল। কাল—কাল কেন, আজ রাত্রেই এই কথা ছড়িয়ে যাবে চারিদিকে—গ্রামে গ্রামে। গ্রামের জন্য তিনি চিন্তিত নন। মানুষ দু ভাগ হয়ে যাবে। এক দল মানুষকে তিনি অবশ্যই পাবেন। দে-সরকার এবং তার ওই ছেলেটার প্রতি কেউ সন্তুষ্ট নয়; প্রায় নিত্য-অত্যাচারে পীড়িত তারা; রাজ-দরবারে অভিযোগ করে ফল পায় না, নীরবে ঈশ্বরকে ডাকে। তিনি ঈশ্বরের সেবকের কর্ম করেছেন। সামান্য কিছু লোক, ওই দে-সরকারের সমধর্মী সহকর্মীরা বিরুদ্ধে যাবে। রাজ-সরকারে অভিযোগ যাবে। তাঁকে দাঁড়াতে হবে দৃঢ় হয়ে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চকিতে

মনে হল, আর একদল মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবে। এ অঞ্চলের দৈহিক শক্তিশালী দুর্দান্ত লোকেরা, ডাকাতেরা, লাঠিয়ালেরা। চমকে উঠলেন তিনি।

সেই মুহূর্তটিতেই তাঁর পায়ের উপর অতি কোমল উত্তাপমধুর একটি স্পর্শ অনুভব করলেন; স্নায়ুশিরায় একটা কিসের তরঙ্গ ছুটে গেল। হৃৎপিণ্ড ধক করে উঠল; মন শিউরে উঠল। কে? কী? এ কী? কেন? বুঝেছেন তিনি কী হয়েছে, তবু প্রশ্ন করলেন। মোহিনী তাঁর পা দুটির উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ নির্জন নিশীথ, আকাশে বাতাসে বর্ষা-প্রকৃতির আকুলতা, আকাশে মেঘ ডাকছে—গুরু গুরু গুরু, চাঁদের আলো ঢাকা পড়ে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, বনের পল্লবে পত্রে মাতামাতি, মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আর কোথাও কিছু নেই, সব আড়াল পড়েছে, বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এরই মধ্যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে সরলা কিশোরীটি বিগলিত হয়ে উদ্ধারকর্তার পায়ের উপর নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। কৃষ্ণদাসী বষ্টুমীর মেয়ে, সে তার ভাষায় তার ভাবনার কথা অকপটে নিবেদন করে চলেছে: ওগো গোসাঁই, তুমিই আমার শ্যাম, তুমিই আমার ঠাকুর, আমি তোমার দাসী। ওগো, এত দয়া তোমার দাসীর ওপর! আঃ! আমার এত ভাগ্যি!

সর্পস্পৃষ্টের মত পা দুটি টেনে নিলেন মাধবানন্দ। কংসারি! কেশব! গোবিন্দ! গোবিন্দ! ওঠ। তুমি ওঠ। উঠে বস। বস।

উঠে বসল মোহিনী। মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন, দয়া ভগবানের, মানুষের নয়। এখন আমার কথার জবাব দাও। কে আছে তোমার আপনার জন?

—আপনার জন? কেউ নাই ঠাকুর তুমি ছাড়া। তুমিই তো বাঁচালে।

—আমি বাঁচিয়েছি তুমি অসহায় বলে। অধর্মের অত্যাচারকে রোধ করবার জন্যে বাঁচিয়েছি। এখন বল, কোথায় যাবে তুমি?

—কোথায় যাব? আমি এখানেই থাকব ঠাকুর।

—না। রূঢ় ভাবে মাধবানন্দ বললেন, না।

—তবে তুমি বলে দাও, আমি কোথায় যাব! সকরুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠের স্বর, সজল বাতাসের সঙ্গে বিগলিত হয়ে শুধু মিশেই গেল না, দুটি চোখের কোণ থেকে ধারা বেয়ে মাটির উপরেও ঝরে পড়ল।

মাধবানন্দ এবার কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললেন, ভাল, আশ্রমের কাছেই কোন গ্রামে তুমি থাকবে। কয়ো তোমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসে। তোমাকে পাপস্পর্শ করতে সে দেবে না। কয়োর সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে।

আর্তস্বরে মোহিনী চিৎকার করে উঠল, না, না, না। তোমার চরণ ছাড়া আমি কিছু ভজতে পারব না। ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

আবার চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। সংঘটিত কর্মের স্রোত এসে তাঁকে প্রবল আক্রমণে ভাসিয়ে নিতে চাচ্ছে। সরলা অসহায়া বলে যাকে উদ্ধার করেছেন, তার উদ্ভব যে পাপ থেকে; তার রক্তে পাপ, তার মর্মে পাপ, তার রূপে মোহ, তার ধ্যান ধারণা ভাবনা কামনা—সব পাপ—সব পাপ। প্রেম বড় সহজে বিকৃত হয়, কাম পঙ্কে পরিণত হয়, সারা বৈষ্ণবধর্মের বিকৃত পঙ্কের বিষ আকণ্ঠ পান করে ও বিষাক্ত। আজ সেই বিষপুষ্ট জীবনকামনা যেন জলসিক্ত লক্ষ লক্ষ বীজের মত একসঙ্গে ফেটে অঙ্কুর মেলে জেগে উঠেছে। ওর ওই জলসিক্ত দেহের রোমকূপে-কূপে যেন সর্বনাশের বীজোদ্গম হচ্ছে। তবু শেষ চেষ্টা করবেন তিনি।

—তুমি বৈষ্ণবী। গোবিন্দের চরণ ছাড়া তোমার ভজনা নেই। তিনি ছাড়া তোমার ধ্যান নেই। শ্যাম ছাড়া স্বামী নেই। মানুষ তোমার কেউ নয়। তোমার মায়ের পরিণাম তুমি দেখেছ। কয়ো তোমার স্বামী হিসেবে উপলক্ষ। ভজনা তোমার গোবিন্দের—শুধু গোবিন্দের। অন্য যাকে ভজতে যাবে, মহাপাপ হবে।

—মহাপাপ হবে? অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে মোহিনী। মুহূর্ত পরেই কিন্তু সে ঘাড় নেড়ে অস্বীকার করে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে মাধবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললে, না, না। তুমি ছাড়া কাউকে ভজতে আমি পারব না। ওগো গোসাঁই, তুমি—তুমি আমার শ্যাম, তুমি আমার গৌর, তুমি আমার ঠাকুর, তুমি আমার গোসাঁই। এবার তার কণ্ঠস্বরের আবেগ গাঢ়তর হয়ে উঠল, সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল, সে আবেগে বললে, ওগো গোসাঁই, তোমার তো অজানা থাকার কথা নয়, প্রথম দিনের দেখার কথা। তুমি প্রথম এলে নৌকার উপর ধ্বজা-পতাকা উড়িয়ে, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, আমি

অজয়ে চান করে আঁচল ভরে পলাশফুল কুড়িয়েছিলাম, তোমাকে দেখেই যে তোমার চরণে বিকিয়ে গেলাম। আমার অঙ্গ অবশ হয়ে গেল, দিনের আকাশে চাঁদ উঠল, আমার আঁচলের হাত এলিয়ে পলাশফুলের রাশ ঝর-ঝর করে মাটিতে পড়ে গেল; সে তোমারই চরণের উদ্দেশে, গোসাঁই, সেই পলাশের সঙ্গে মন হারালাম, পরান বললে—তুমি আমার সব পরানের পরান! সেই দিন থেকে যে আমার সাধ—আমি তোমার সেবা করব, তোমার সেবাদাসী হব।

মেয়েটা যেন ভেঙে পড়ে গেল আবেগে, সে নতজানু হয়ে বসে হাত-জোড় করে হাঁপাতে লাগল: দয়া কর। পায়ে রাখ। ওগো গো-সাঁ-ই!

—না। মাধবানন্দও কঠোর সংযমে বাঁধছিলেন নিজেকে; মোহিনীর আবেগ গাঢ়তর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সে বন্ধনকে দৃঢ়তর করছিলেন। এবার নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন তিনি, রূঢ় গম্ভীর স্বরে বললেন, না। সে 'না' এক গর্জনের মত।

মোহিনী কিন্তু তবু থামল না। সে যেন আজ আর-এক মোহিনী। পাথরের বাঁধ ভেঙে প্রথম-ঝরা ঝরনার মত। ঝরঝর কলকল শব্দে মুখর। সদ্য-যৌবনা বৈষ্ণবের মেয়ে, কৃষ্ণদাসীর মেয়ে মোহিনী। পরকীয়া-সাধনার ব্যগ্র কামনা তার রক্তে, তার সাধনের তন্ত্রে, তার আশৈশব-শেখা ও নিত্য-আবৃত্তি-করা মন্ত্রে; তার বাহির-মনে, তার ভিতর-মনে, তার স্বপ্নে, তার শোনায়, তার জানায়, তার দেহমনের একাগ্র কামনায়। তার উপর এই নিদারুণ বিপদ এবং আতঙ্ককর অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হয়ে এসে তার ভয় ভেঙেছে; আজ অপরাহ্ণ থেকে রাত্রির দুপ্রহর পর্যন্ত সে শুধু শুনেছে তার এই দেহখানা নিয়ে নানান জনের নানান কুৎসিত কথা। তারই মধ্যে শুনেছে নবীন গোসাঁইয়ের তার প্রতি করুণার কথা। রাত্রি দ্বিপ্রহরে, নবীন গোসাঁইয়ের স্নেহে মুক্তি পেয়ে আবেগে তার জীবনের ফুল ফুটেছে, সে অজয়ে ঝাঁপ খেয়েছে, সে অন্ধকার বনপথে ছুটে এসে এই নবীন গোসাঁইকে ডেকেছে; গোপালানন্দ মাঝখানে পথ আগলেছে দৈত্যের মত; দেবতার মত গোসাঁই তাকে বাঁচিয়ে, তাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে এসেছেন; চৈতন্যহারা অবস্থার মধ্যেও সে তাঁর দেহস্পর্শ অনুভব

করেছে। আজ তার রক্তের কণায় কণায় নারীজীবনের পরম উত্তেজনা ফেটে পড়ছে, আজ তার লজ্জা নাই, বাধাবন্ধ নাই, দেহমনের একাগ্র কামনা মুক্তকণ্ঠে বেরিয়ে এসেছে, এবার সে মুক্তকণ্ঠ উচ্চ হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে উঠল, তোমাকে নইলে আমি বাঁচব না, ওগো গোসাঁই, আমি বাঁচব না।

সে চিৎকার প্রাণ-ফাটানো চিৎকার। মাধবানন্দ চমকে উঠলেন, দৃঢ়তা সত্ত্বেও তিনি এমনটির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বনভূমির পল্লবান্দোলন-শব্দমুখরতাকে ছাপিয়ে সে চিৎকার ছড়িয়ে পড়ল। সামনের গাছটার কোটরে বসে অকস্মাৎ চকিত হয়ে একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল; একটা বাদুড় গাছ থেকে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী আবার পায়ের উপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

সর্পস্পৃষ্টের মতই চকিত আকর্ষণে পা টেনে নিলেন ও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মত তাকে ঠেলে দিলেন মাধবানন্দ এবং নিষ্ঠুরতম ক্রোধে বললেন, পাপিষ্ঠা!

একটি অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল মোহিনী।

নিষ্পলক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মাধবানন্দ যেন নিজের কথা সংশোধন করে বললেন, না, সাক্ষাৎ পাপ।

মোহিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলে উঠে বসল; সামনের অগ্নিকুণ্ডটার শিখা তখনও জ্বলছিল, সেই শিখার আভা তার মুখের উপর পড়ল; তার উপরের ঠোঁটখানা কেটে গিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাধবানন্দের পদাঙ্গুষ্ঠের নখের তীক্ষ্ণ রূঢ় আঘাতে কেটে গেছে। হাত বুলিয়ে মুছে নিয়ে মোহিনী আগুনের শিখার সামনে ধরে রক্ত দেখে যেন অবাক হয়ে গেল। নবীন গোসাঁই, তার শ্যাম, তার গৌর, তাকে—

মাধবানন্দ দীর্ঘপদক্ষেপে এ দাওয়া থেকে নেমে অঙ্গন অতিক্রম করে বিগ্রহের ঘরের দিকে চলে গেলেন। দাওয়ার উপর উঠে বললেন, কাল ভোরে তুমি চলে যেয়ো। আর যেন তোমার মুখ আমাকে দেখতে না হয়।

বিগ্রহ-গৃহের দুয়ারে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন।

দেহটা যেন অশুচি হয়ে গেছে। নিজের কাছে অস্বীকার করতে তো পারছেন না তিনি, তাঁর দেহকোষে-কোষে যেন লোভী শিশুর ক্রন্দনের মত ক্রন্দন উঠেছে। তারস্বরে চিৎকার করছে ওই কিশোরী কুমারীর সুকোমল উষ্ণ স্পর্শ। হয়তো বা মনের মধ্যে ওই মেয়েটিকে অসহায়া অভাগিনী বলে করুণা অনুভব করছেন; তার মধ্যেও কোথায় লুকিয়ে রয়েছে কামনার বীজ। অশুচি হয়ে গেছেন তিনি। স্নান প্রয়োজন, শুদ্ধি প্রয়োজন। অঙ্গনে নেমে তিনি দক্ষিণ দিকে গিয়ে নামলেন আশ্রম-সংলগ্ন প্রাচীন কালের পুষ্করিণীটিতে। ইছাই ঘোষের খনিত সরোবর। স্নান করে শীতল হ'ল দেহ মস্তিষ্ক। ফিরে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করে মন্দিরে ঢুকে বিগ্রহের সম্মুখে বসলেন। না, কংসারির শ্রীমুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না। দীপশিখা স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাই আসে। শিখা মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল করে দিতে হয়। দিলেন তাই। হ্যাঁ, এবার দেখতে পাচ্ছেন। কংসারির মুখমণ্ডলে নিরাসক্ত অথচ আনন্দময় দৃঢ়তা; চোখে প্রখর প্রসন্ন দীপ্তি। উদ্যত ডান হাতের মুষ্টিতে ধরা চক্র, বাঁ হাতে শঙ্খ। যেন বলছেন—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

কামনার রাত্রির অন্ধকার দূর হোক শ্রীমুখের দীপ্তিতে। হে কংসারি, তুমি বল, তুমি বল, জন্ম থেকে শৈশব থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তুমি যোগী। চৈতন্যময় প্রতিক্ষণের ভগ্নাংশেও জাগ্রত। তোমার জীবনে রাধা ছিল না, রাধা নাই, রাধা নাই। রাধা তোমাকে মোহগ্রস্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে চিরকাল কেঁদেছে—কেঁদেছে।

শ্রীমুখের মহিমায় গৃহাভ্যন্তর সত্যই বুঝি দিবালোকের চেয়েও প্রদীপ্ত ছটায় ভরে উঠল। জয় কংসারি! জয় কংসারি!

আঃ, কিসের এমন বিকট গর্জন? ও, মেঘ ডাকছে।

বাইরে বজ্রপাতের মত বিদ্যুৎ চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্জন। তার সঙ্গে বাতাস। দূরান্তর থেকে বনের মাথায় মাথায় ধারাবর্ষণের শব্দ সঙ্গীত তুলে বর্ষণ এগিয়ে আসছে। সন-সন ঝর-ঝর। ঝর-ঝর, ঝর-ঝর,

ঝর-ঝর-ঝর-ঝর। অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বিশ্বসংসার। যাক। মাধবানন্দও ধ্যানে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন।

আঃ! কে? কে ডাকে? ও, কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর। গভীর ধ্যানের মধ্যেও পৃথিবীর সঙ্গে যোগের একটি রন্ধ্র যেন মুক্ত ছিল; কেশবানন্দের প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা। সেই রন্ধ্রপথে ধ্বনি এসে পৌঁছেছে। কেশবানন্দ ডাকছে। কেশবানন্দ! উঠে পড়লেন তিনি। দেবতাকে প্রণাম করতে ভুলে গেলেন। আসন ছেড়ে এসে দুয়ার খুলে বাইরে এলেন।

—কেশবানন্দ!

হ্যাঁ, কেশবানন্দই বটে। সঙ্গে শ্যামানন্দ, যাদবানন্দ এবং অপর সকলে। আর ওটা কী? দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পশুর মত? ও! বর্বর অক্রূরটা। পাপ! ওরই পাপের জন্য তাঁর আজ—

—ওরে শালা, বদমাস, নচ্ছার, ভণ্ড, লম্পট—

বর্বর অক্রূর তাঁকে দেখে এই অবস্থাতেও গাল দিয়ে উঠল।

শ্যামানন্দ তাকে মুখে আঘাত করে বললে, চুপ রহো।

কেশবানন্দ বললেন, সেই মেয়েটিকে কোথায় লুকিয়েছে। আমরা পাই নি। তাই ওকে গুরু মহারাজের কাছে বেঁধে এনেছি।

আহত হয়ে অক্রূর চিৎকার করে উঠল পশুর মত, তারপরই অভ্যাস মত, থু-থু করে থুতু ছুঁড়তে আরম্ভ করলে: তোদের মুখে আমি থুতু দিই—থুতু দিই। ওরে চোর ডাকাত লম্পট বদমাশের দল, তোদের আমি ছাড়ব না—শূলে দোব, ফাঁসি দোব। জ্বালিয়ে দোব আশ্রম। তুই—তুই—তুই শালাকে কেটে কেটে নুন লঙ্কা দিয়ে দিয়ে মারব। মাধবানন্দের দিকে উন্মত্ত আক্রোশে থুতু ছুঁড়তে লাগল—থু-থু-থু-থু-থু—

মাধবানন্দের রক্তের আগুন তখন নেবে নি। সে আগুন খোঁচা খেয়ে আবার জ্বলল—দাউ দাউ করে জ্বলল। মুহূর্তে তিনি টেনে নিলেন কেশবানন্দের তরবারিখানা। তারপর বিদ্যুতালোক ঝলসে উঠে নিবে যাওয়ার মত চকিতে ঘটে গেল একটা বজ্রাঘাতের মত সংঘটন।

বিদ্যুদ্বেগেই তরোয়ালখানা উপরে উঠে অগ্নিকুণ্ডের ছটায় ঝলসে উঠে নেমে এল বজ্রের বেগে, পর-মুহূর্তে বৃত্রাসুরের ন্যায় কৃষ্ণকায় দুর্দান্ত অক্রূরের

মুণ্ডটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে গড়িয়ে পড়ল; কবন্ধ দেহখানা একটা নিদারুণ মূক আক্ষেপে সারাদিনের বর্ষণসিক্ত মাটির বুকটুকুকে কর্দমাক্ত করে তুলল। তাতে মিশছিল তারই গাঢ় লাল রক্ত। রাত্রির নিস্প্রভতায় মনে হচ্ছিল গাঢ় কালো সে রক্ত।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। কেশবানন্দ পর্যন্ত। মাধবানন্দ এমন পারেন, এ ধারণা যে তাদের স্বপ্নাতীত।

মাধবানন্দ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন বর্বরটার মৃত্যু আক্ষেপের দিকে। আক্ষেপ স্থির হয়ে গেল, তিনি হাতের রক্তাক্ত তরবারিখানা ফেলে দিলেন। বললেন, কামার্ত পশুর রক্তের জন্যে পৃথিবী আজ তৃষ্ণার্ত হয়েছিলেন। বাক্যশেষে এদিক-ওদিক চাইলেন। উষ্ণ গাঢ় রক্ত হাতে লেগেছে, অশুচি মনে হচ্ছে। জল! ওঃ, এই যে দাওয়ার উপর কয়েকটাই ঘড়া নামানো। একটা ঘড়ার কানা ধরে তিনি কাত করলেন। এ কী? এত ভারী! কী? জল তো নয়, কঠিন বস্তু কী, এ প্রশ্নের উত্তর এসে পড়ল তাঁর হাতে। অন্ধকারের মধ্যেও স্বর্ণবর্ণের স্বরূপ ঢাকা পড়ল না, আকার অগোচর রইল না। হাতে এসে পড়েছে একমুঠো মোহর। চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। ঘড়াটা ছেড়ে দিলেন, হাতের মোহরগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তিনি কেশবানন্দের দিকে তাকালেন।

কেশবানন্দ সে সবিস্ময় নীরব প্রশ্নের উত্তর দিলেন তৎক্ষণাৎ।

—পাষণ্ড পরাস্বাপহারী দে-সরকারের গুপ্ত সঞ্চয়। কংসারির সেবায় লাগবে। অধর্মের ধন ধর্ম-সংস্থাপনে ব্যয়িত হবে।

মাধবানন্দ উঠে দাঁড়ালেন। একটা বিপুল ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে তাঁর চিন্তাশক্তিও যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। স্পষ্ট প্রশ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, উত্তর দূরের কথা।

এরই মধ্যে কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর শুনলেন তিনি।

—শ্যামানন্দ, তৃতীয় প্রহরের শিবাধ্বনি শুনেছ?

—কই, না তো!

—কেউ শুনেছ?

মৃদু সম্মিলিত কণ্ঠের উত্তর হল, না।

কেশবানন্দ বললেন, তা হলে এক প্রহরেরও অধিক রাত্রি আছে এখনও। শোন শ্যামানন্দ, এখনই আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে। মুহূর্ত বিলম্বের অবসর নাই। গুরু মহারাজ!

—কেশবানন্দ!

—অক্রূরকে বেঁধে এনেছিলাম মোহিনীর সন্ধানের জন্যও বটে এবং দে-সরকারের প্রতিহিংসা শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যও বটে। বলে এসেছিলাম, ফৌজদার কি নবাবের দরবারে অভিযোগ করলে অক্রূরকে আমরা হত্যা করব। কিন্তু সে আর হবে না। এখন এ স্থান ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আশ্রম সুরক্ষিত নয়, শক্তি সঞ্চয় করি নি। সকাল হতে হতে আমাদের চলে যেতে হবে।

—চলে যেতে হবে? উপায় নেই?

আকাশের দিকে তাকালেন মাধবানন্দ। ঘন মেঘে আচ্ছন্ন আকাশ অন্ধকার; বনের মাথার সঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে গেছে। চারিপাশ অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই চলতে হবে, উপায় নাই।—তাই হোক। চল।

কেশবানন্দ সক্রিয় হয়ে উঠলেন, অস্ত্র সংরক্ষণের গুপ্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হলেন, ডাকলেন, শ্যামানন্দ, যাদবানন্দ, অস্ত্রগুলি বের করে শবের মত করে বাঁশে বাঁধ, তার পাশে বিছিয়ে দাও মোহর এবং শিরস্ত্রাণগুলি। এক-একটি শববাহকের দলে ভাগ হয়ে যাত্রা করব। এক-এক দলে আটজন। কিছু যাবে গরুর গাড়ির সঙ্গে। গাড়িতে যাবে অন্য অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাকী সব পড়ে থাক্। গাই বাছুর, তৈজস পত্র, খাদ্য-ভাণ্ডার সব পড়ে থাক্। গোপালানন্দ, গোকুলানন্দকে ডাক। গোপালানন্দ! গোপালানন্দ!

এতক্ষণে সচেতন হলেন মাধবানন্দ, ওই গোপালানন্দের নামই তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলে। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি যেন বেরিয়ে এল তাঁর বুক থেকে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাধবানন্দ গম্ভীর স্বরে বললেন, সে নেই কেশবানন্দ, আমি তাকে হত্যা করেছি।

—হত্যা করেছেন? আপনি?

—হ্যাঁ, ওই অক্রূরের মত। এমনি কামার্ত এবং বীভৎস হয়ে আক্রমণ করেছিল মোহিনীকে। আমার উপস্থিতি আমার নিষেধও তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারে নি। আমাকেও আক্রমণ করতে এসেছিল, আমি তাকে হত্যা করেছি।

—গুরু মহারাজ!

—রথ চলতে শুরু করেছে কেশবানন্দ, কংসারির রথ। কী করব? তিনি করিয়েছেন, আমি করেছি। আজ আমি তাঁর মুখকমলে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি।

তাঁর সে কণ্ঠস্বর আশ্চর্য। অলঙ্ঘনীয়। বর্ষার মেঘগর্জনের মত গাঢ় গম্ভীর।

সমস্ত সেবক-মণ্ডলী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কংসারির মুখকমলে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়েছে, গুরু মহারাজ দেখেছেন! শুধু চিৎকারে বিদীর্ণ হয়ে গেল একটি কর্কশ কণ্ঠ। কয়োর কর্কশ কাতর কণ্ঠস্বর। কয়ো সকলের পিছনে অন্ধকারে হতাশায় নির্বাক হয়ে বসে ছিল এতক্ষণ। মোহিনীর নাম শুনে সে চিৎকার করে উঠেছে।

—গোসাঁই! মোহিনী কোথা? মোহিনী?

—কয়ো?

—তাকেও কেটেছ?

—কাটাই উচিত ছিল, কিন্তু নারী-হত্যা করি নি। দেখ ওই অগ্নিকুণ্ডের পাশে শুয়ে ছিল। মূর্তিমতী পাপ।

—কই? কোথায়? গোসাঁই, কেউ নাই তো!

—তা হলে জানি না। খুঁজে দেখ।

—মোহিনী! মোহিনী! মোহিনী! কয়োর কর্কশ কাতর কণ্ঠস্বরে রাত্রির শেষপ্রহর ক্ষণে ক্ষণে যেন চমকিত হয়ে উঠল। ওদিকে যাত্রা শুরু হয়ে গেল সন্ন্যাসীদলের।

মাধবানন্দ নিঃশব্দে চলেছেন বয়েল গাড়ির উপর। মনে পড়ছে এবং মনে মনে অনুভব করছেন, মহাভারতের কথা। জতুগৃহে গভীর রাত্রে অগ্নি সংযোগ করে পাণ্ডবেরা যেমন নিঃশব্দে বারণাবত ত্যাগ করেছিলেন,

এ যাত্রাও তেমনি। নিরাপত্তার জন্য নয়, কুরুক্ষেত্রের জন্য। আশ্চর্য ভাবে এই নিঃশব্দ গোপন যাত্রা চলেছে কুরুক্ষেত্রের দিকে। নূতন কুরুক্ষেত্র। আশ্চর্য অনিবার্য গতি! ওঃ! জীবনে সিদ্ধির প্রসাদকে মাধবানন্দ যেন অনুভব করছেন। হোক এটা ঘোর কলি; এগারো শো সাল; সিদ্ধি এখনও আছে, হ্যাঁ, আছে।

পিছনে এখনও কয়োর ডাক শোনা যাচ্ছে, মো-হি-নী!

আঃ! মেয়েটার নাম শুনেও তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠছে।

তিনি গরুর গাড়ির উপর বসেই ধ্যানস্থ হতে চেষ্টা করলেন।

হে চৈতন্যময় সত্তার চিন্ময় আত্মাপুরুষ, তুমি জ্যোতিষ্মান হয়ে অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকট হও। মাধবানন্দের বস্তুজগৎময় দেহসত্তার সকল স্পন্দন বস্তুজগতের সকল আকর্ষণের স্পর্শকাতরতা শুদ্ধ করে দাও, চৈতন্যমহিমাকে জাগ্রত কর।

বনপথে গাড়ি চলেছে, চাকার শব্দ উঠছে।

অজয়ের ঘাটের নৌকাগুলির দড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে। যাক ভেসে। লোকে সর্বপ্রথম নৌকার সন্ধানই করবে। তখনও বর্ষণ চলছে। ঝর-ঝর—ঝর-ঝর—ঝর-ঝর।

মাধবানন্দ তারই মধ্যে সিদ্ধির আসনে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারছেন রথ চলেছে কুরুক্ষেত্রের দিকে।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

তামাম হিন্দুস্তান ছারখার হয়ে গেল। দিল্লীর বাদশাহী খতম বললেই হয়। সারা ভারত জুড়ে অধর্মের তাণ্ডব চলছে। দুর্যোধন দুঃশাষণের জনম এবার এক নয়, দুই নয়, হাজার, দু হাজার। কুরুক্ষেত্রের ইশারা ঝলসাচ্ছে। উদ্যোগপর্ব শেষ। এ সময়ে আপনি—

গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কেশবানন্দ কথাটা শেষ করলেন না, কিন্তু অনুযোগ প্রকাশ পেল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

ষোল বৎসর পর গুরুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শ্যামরূপার গড় পরিত্যাগের পর ষোল বৎসর চলে গেছে।

মাধবানন্দ অসুস্থের মত নিরতিশয় ক্লান্তিতে আধশোয়া অবস্থায় আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। বিষণ্ন হেসে মাধবানন্দ বললেন, কী করব কেশবানন্দ, এর উপর তো আমার হাত নেই। আমি কিছুতেই আত্মসম্বরণ করতে পারি না; আমার জ্ঞান বুদ্ধি বিচার সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়; মনে হয় দুঃখের আমার আর পারাপার নাই। মনে হয় সব আঁধিয়ার, সব আঁধিয়ার। দুনিয়াতে দুঃখ ছাড়া কিছু নাই। বিলকুল ঝুট। সব মিথ্যে। ভগবান কংসারির মুখের দিকে চেয়ে মনে হয় প্রভুর মুখমণ্ডলও ম্লান। তাঁর চোখও যেন ছলছল করে। কান্না আপনি আসে কেশবানন্দ, বুক ফেটে বেরিয়ে আসে। কাঁদি, তাই যেন দম ফেলতে পারি, নয়তো দম বন্ধ হয়ে মরে যেতাম।

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন মাধবানন্দ, বোধ করি আবেগে ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন; বললেন, কেশবানন্দ, গীতা আওড়াই, মনে করি প্রভুর বাণী—

'ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥

তাতেও মন নাড়া খায় না, সাড়া দেয় না। কী করব আমি, কী করব? এ যার না হয়েছে সে বুঝতে পারবে না।

বলতে বলতেই দুটি বিশীর্ণ জলধারা চোখের কোণ থেকে নেমে এল। আবার তিনি হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেশবানন্দ বললেন, তা হলে কি কুম্ভ-স্নানে যাত্রার দন স্থগিত রাখব?

এবার চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। কুম্ভস্নানে যাত্রার দিন স্থগিত? ওঃ, কথাটা তাঁর মনে ছিল না। এবার প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভস্নান। অবশ্য বিলম্ব আছে, এখন সবে কার্তিক মাস। কিন্তু সংকল্প ছিল কার্তিক মাসে বের হয়ে ব্রজমণ্ডল থেকে দিল্লী পর্যন্ত মুলুকের অবস্থাটা দেখে আসবেন। সম্ভবপর হলে জ্বালামুখী পর্যন্ত, মুলুক পাঞ্জাবও স্বচক্ষে দেখা হয়ে যাবে। যাত্রার দিন কার্তিকী শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে। আজ বোধ হয় অষ্টম; কিন্তু আজ তিন দিন তাঁর বিচিত্র পুরাতন ব্যাধি উঠেছে। তিন দিন এই ভাবে স্তব্ধ হয়ে আছেন; অনাহার চলছে, জল এবং সামান্য দুধ ছাড়া কিছু খাচ্ছেন না। রিক্ত সর্বস্বহারার মত শোকার্ত দৃষ্টিতে আকাশের দিকেই তাকিয়ে আছেন; কখনও মন্দিরের মধ্যে গিয়ে বিগ্রহের সম্মুখে আসনে বসে অনর্গল কাঁদছেন। ধারা বেয়ে চোখের জল নামছে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত যোগসূত্র যেন নিঃশেষে কেটে গেছে, সুতো-কাটা ঘুড়ির মত কাঁপতে কাঁপতে নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছেন। কারুর কোন কথা কোনও জিজ্ঞাসাই যেন কানে যায় না; গেলেও অর্থ বোধ হয় না। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ঘাড় নাড়েন, যার অর্থ 'না'। হয়তো তার অর্থ 'কী বলছ বুঝতে পারছি না' অথবা 'এখন নয়' অথবা 'জানি না'।

এ অবশ্য তাঁর নতুন নয়। মধ্যে মধ্যে এমন তাঁর হয়। ষোল বৎসর পূর্বে শ্যামরূপার গড় ইছাই ঘোষের দেউল ত্যাগ করেছেন, তার মধ্যে বারো বৎসর ধরে মধ্যে মধ্যে এই অবস্থায় ব্যাধিগ্রস্তের মত আক্রান্ত হয়ে আসছেন। ব্যাধির মত লক্ষণও কিছু কিছু আছে। কখনও দেহের উত্তাপ বাড়ে; কখনও কমে যায়; হাত পায়ের আঙুলগুলি ঠাণ্ডা হয়। প্রথম, ব্যাধি আশঙ্কা

করে কেশবানন্দ কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবিরাজকে ডেকেছিলেন। তাঁরা কেউই কিন্তু তাঁর দেহে কোন ব্যাধির সন্ধান পান নি, শেষ পর্যন্ত বলে গেছেন, আধ্যাত্মিক সাধনার এ কোন বিচিত্র আক্ষেপ।

এক অবধূত সন্ন্যাসী অবধৌতিক মতে চিকিৎসা করেন, তিনি বলেছেন, কোন একটা নূতন সিদ্ধি আসতে আসতে আসছে না। এ বিচিত্র অবস্থা কখনও এক পক্ষ, কখনও এক মাস, কখনও দু মাস পর্যন্ত চলে। শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে যান, ঝড়ে ভগ্নশীর্ষ বনস্পতির মতই মনে হয় তাঁকে দেখে।

এবার মাত্র তিন দিন আক্রমণ হয়েছে, সুতরাং কেশবানন্দ যাত্রা স্থগিতের কথা না বলে পারলেন না। এই অবস্থায় সুদূর পথে যাত্রা তো উচিত হবে না।

মাধবানন্দ চমকে উঠলেন।

তামাম হিন্দুস্থান ছারখার হয়ে গেল। পাপের তাণ্ডবে পৃথিবীর কেঁপে ওঠার শক্তিও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এত অনাচারেও ভূমিকম্প হয় না। "ধরতি পত্থল হো গয়ি"—কেশবানন্দ বলেন ; মা ধরিত্রী পাষাণ হয়ে গেছেন।

* * *

বাংলা দেশের একেবারে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে রাজমহলের কাছাকাছি ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে পাহাড়ঘেরা একটি নিভৃত অঞ্চলে নতুন আশ্রমের মন্দিরচত্বরে শুয়ে ছিলেন মাধবানন্দ। সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কেশবানন্দ।

ষোল বৎসর পূর্বে সেই রাত্রে গড়জঙ্গল ত্যাগ করে এখানে এসে নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। ষোল বৎসরে আশ্রম এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বহুবিস্তৃত, সংঘশক্তিও বিপুল এবং সুদৃঢ়। গঙ্গার পরপারে মালদহ গৌড় এবং আরও উত্তরে বনবহুল অঞ্চলে এক দিকে পূর্ণিয়া, অন্য দিকে কুচবিহার পর্যন্ত নানা স্থানে আশ্রমের ছোট বড় মাঝারি শাখা, মঠ ও মন্দির গড়ে উঠেছে। এ সব মঠের মন্দিরের দেবতা একক কংসারি নন, তাঁর সঙ্গে রুদ্র-ভৈরব-শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আদিষ্ট হয়েই করেছেন মাধবানন্দ। সেদিন রাত্রে সেই দুর্যোগের মধ্যে বনের ভিতর দিয়ে চলবার সময় মাধবানন্দ বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। গোপালানন্দ এবং অক্রূরকে হত্যা করে গাড়ির উপর স্তব্ধ হয়েই বসে ছিলেন। বড় বড়

বয়েল দুটো বিপুল শক্তিতে বর্ষণসিক্ত লাল মাটির উঁচু নিচু পথ ভেঙে চলেছিল বাদশাহী সড়কের দিকে। গন্তব্যস্থল বর্ধমান। তারপর স্থির করবার কথা ছিল কোথায় হবে গন্তব্যস্থল। দামোদর পার হয়ে গড় মান্দার হয়ে যে পথ পুরী গিয়েছে সে পথ ধরবেন অথবা কাটোয়া গিয়ে ভাগীরথীর ধারা ধরে উত্তর-ভারতের দিকে চলবেন—তা স্থির করবার সময় ছিল না। তাঁর তো ছিলই না। তিনি তখন ভয়-ভাবনার সীমারেখা পার হয়ে অন্য এক রাজ্যে যেন বিচরণ করছেন। মানসলোকে এক সিংহদ্বার খুলে গেছে যেন।

অনাদি মধ্যান্তমনন্তবীর্যমনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।

পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥

গীতার একাদশ অধ্যায় তাঁর অন্তরলোকে গম্ভীর সঙ্গীতধ্বনি আপনা আপনি ধ্বনিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে আজকের রাত্রের এই অন্ধকারের ঠিক ওপারেই কংসারি বিশ্বরূপে প্রকট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই জন্য। "দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি, দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি"—সে প্রলয়ঙ্কর ভয়ঙ্করতম রূপের আভাস মাধবানন্দ আজ মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করেছেন, বোধ করি তাঁর বাণীও শুনেছেন—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব—নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচীন্।" গোপালানন্দ এবং অক্রূরকে তিনিই হত করে রেখেছিলেন, নইলে তিনি হত্যা করতে পারতেন না। তিনি তো ওদের থেকে দৈহিক শক্তিতে সবল ছিলেন না, পাশবিক উগ্রতায় প্রচণ্ড ছিলেন না। তাঁর ভয় হত, দুর্বলতায় হাত কাঁপত, নরহত্যার পাপ-পুণ্যের বিচারের জন্য তিনি ইতস্তত করতেন। তিনি নিশ্চয়ই তখন অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর বাণী শুনেছেন। এই তো বেশ অনুভব করছেন যে তাঁর রথকে তিনি চালিয়ে নিয়ে চলেছেন কুরুক্ষেত্রের পথে। এরই মধ্যে রাত্রি অবসান হল এক সময়, কলরব করে পাখি ডেকে উঠল। আকাশে তখনও মেঘ, তারই মধ্যে আলো ফুটল। কেশবানন্দ গাড়ি থামালেন। এতক্ষণে মাধবানন্দের সম্বিত ফিরল।

—গাড়ি থামালে কেশবানন্দ?

—এক বেলা বিশ্রাম করব। অপেক্ষারও প্রয়োজন আছে। যদি তারা অনুসরণ করে থাকে, সেটা বুঝতে পারব।

পথ ছেড়ে বনের গভীর অভ্যন্তরে গিয়ে ঢুকেছিলেন তাঁরা। ভাগ্যক্রমে পেয়েও ছিলেন একটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন স্থান, বড় বড় পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে ছিল এবং কিছু কিছু মাটির ভিতর থেকে যেন উঁকি মারছিল। বোধ করি বহু প্রাচীন কোন-কিছুর ভগ্নাবশেষ; অদূরবর্তী রাঢ়েশ্বর-শিবের মন্দিরের পাথরের মতই এ পাথরগুলি। গতদিনের প্রবল বর্ষণে মাটি ধুয়ে গিয়ে নীচের পাথরগুলি বিশ্রামের জন্য যেন পরিচ্ছন্ন হয়েই প্রতীক্ষা করছিল। কাছেই একটি প্রাচীনকালের মজা পুকুর। একটি পাথরের উপর আসন করে তিনি বসে ছিলেন। শিষ্য-সেবকেরা প্রাত্যঃকৃত্য সেরে ইষ্টস্মরণ করে চিঁড়া ভিজিয়ে আহারের উদ্যোগ করছিল। নীরবে কাজ করে চলেছিল, কেশবানন্দের নির্দেশে।

সেইখানে তাঁর আসনের ঠিক পাশেই একটি কষ্টিপাথরের খানিকটা অংশ হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধারণ পাথরগুলি বেলেপাথরের, এটি কষ্টিপাথর। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে যেন টেনেছিল। তিনি থাকতে পারেন নি, খুঁড়ে বের করেছিলেন পাথরটিকে। পাথর নয়, শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গটিকে সামনে রেখে তিনি সবিস্ময়ে ভাবছিলেন, মাটির তলা থেকে দেবতা উঠবার জন্যই তাঁকে যেন এখানে আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন। কতকাল মাটির অভ্যন্তরে প্রসুপ্ত ছিলেন, কত লোক গিয়েছে এসেছে এই অদূরের পথ দিয়ে, কতজন হয়তো এসে এখানে এমনি করেই বসেছে। কিন্তু দেবতা দেখা দেন নি, তারা দেখেও দেখে নি। তাঁর জন্যই যেন অপেক্ষা করছিলেন। এরই মধ্যে কখন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। তারই মধ্যে তিনি স্পষ্ট শুনেছিলেন দৈব কণ্ঠস্বর: আমাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমি যে রুদ্র, আমি ভিন্ন কুরুক্ষেত্র হবে কেন? চমকে জেগে উঠেছিলেন। কেশবানন্দ সমস্ত শুনে নিজেই নিজের নির্দেশ ভুলে গিয়ে ধ্বনি দিয়ে উঠেছিলেন, জয় শঙ্কর!

মঠে মঠে কংসারির সেবার সঙ্গে রুদ্রের আরাধনাও প্রচলন করেছেন তখন থেকে। তার ফলে সেবকদের মধ্যে শৈবনাগা-সম্প্রদায়ের জীবনসাধন-পদ্ধতির কিছুটা আচার নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে। বিশেষ করে যারা শ্যামানন্দ-গোকুলানন্দদের মত, তারা জটিলতার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

নাগাদের মতই তারা যোগচর্চার সঙ্গে ডন বৈঠক দেয়, কুস্তি করে, গায়ে ভস্ম মাখে, ব্রহ্মচর্য পালন করে আর প্রাণভরে হরি-হরকে ডাকে। হরি-হর একসঙ্গে কংসারি এবং রুদ্রের উপাসনা। কল্পনাটা কেশবানন্দের। তিনিই বলেছিলেন, ভগবান পথ দেখালেন গুরু মহারাজ; এ পথে স্বকীয়া-পরকীয়ার জটিলতা নাই। তার উপর স্বয়ং রুদ্র আদেশ করে আবির্ভূত হয়েছেন। এ পথ গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না।

কেশবানন্দই এই স্থানে বাংলার ও বিহারের সীমান্ত প্রদেশে চারিদিকে পাহাড়-ঘেরা এই স্থানটির কথা মনে করে এইখানে এসে আশ্রম স্থাপন করেছেন। মাধবানন্দের তখনও আচ্ছন্ন ভাব। বর্ধমানে এসে কেশবানন্দ বলেছিলেন, পুরীর পথ যে অঞ্চল দিয়ে গিয়েছে সে অঞ্চল দুর্গম বটে, কিন্তু এ অঞ্চল মুরশিদাবাদ এবং দিল্লী থেকে অনেক দূর। তা ছাড়া এই পথ মহাপ্রভুর পায়ের ধুলোমাখা পথ। এ দিকে 'রাধা'-নির্বাসনতত্ত্ব নেবে তো না-ই, উপরন্তু কঠিন শত্রুতা করবে। এখানকার মানুষেরা বড় উগ্র, এরা জঙ্গল-মহলের দেহাতি।

ওদিকে তখন দামোদরের প্রবল বন্যা। সংবাদ পেয়েছেন অজয়ও ভেসেছে। এই বন্যার জন্যই বোধ হয় ইলামবাজারের দে-সরকারের ক্ষোভ, হাতেমপুরের ফৌজদার রাজনগরের রাজার কোতোয়ালী পেয়াদা কি তাদের অনুসরণ করতে পারে নি। জয় দামোদর, জয় অজয়! কিন্তু দামোদর-অজয়ের প্রকৃতি মহাদেবের মত; রোষে যখন আত্মপ্রকাশ করেন তখন প্রলয়ঙ্কর। কিন্তু সে রোষ থাকে না; অল্পেই প্রসন্ন হয়ে শান্ত হয়ে যান। বন্যা তিন-চার দিন, বড় জোর পাঁচ-ছ দিনের বেশী থাকে না। বন্যা থাকতে থাকতে বেরিয়ে যেতে হবে। দামোদর পার হয়ে পুরীর পথ। দামোদর বন্যার সংকেতে নিষেধ করছেন। বলছেন, এ পথে নয়। দক্ষিণে নয়, উত্তরে চল, উত্তরে চল। বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত সড়ক ধরে যাত্রা শুরু হয়েছিল। কাটোয়ার পথেই এই স্থানে আশ্রম স্থাপনের কল্পনার জন্ম। মাধবানন্দের পিতৃবংশের কয়েকখানি তালুক আছে এখানে। এবং কংসারির সেবার জন্য নানান স্থানে যে নিষ্কর জমি আছে তার একটা অংশ এই তালুকের মধ্যে। ভাগীরথী ধরে নৌকাযোগে গড়জঙ্গল আসবার সময় তাঁরা এখানে

নৌকা বেঁধে একদিন বিশ্রাম করেছিলেন, এবং সেই অবসরে এখানকার প্রজাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে তাদের আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন। স্থানটি বড় সুন্দর। গঙ্গার ধারা এখানে প্রায় পাহাড় কেটে গতিপথ করে নিয়েছে। উত্তরে রাজমহল, দক্ষিণে গঙ্গার ওপারে মুরশিদাবাদ, অবারিত পূর্বে ক্রোশ-খানেক দূরেই গঙ্গা, পশ্চিমে ক্রমশ উত্তর দিকে বিস্তৃত পাহাড়ের পর পাহাড়। এরই মধ্য দিয়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলা দেশের এক সুপ্রাচীন সংযোগ-পথ। উত্তরে এই পথের উপরেই গিরিসংকটের মধ্যে উধুয়ানালার দুর্গ। গঙ্গার ওপারে জিলা মালদহ এবং রাজশাহী। কয়েক ক্রোশ দক্ষিণেই ঘিরিয়া প্রান্তর। এই পথে অনেক অভিযান এসেছে, গিয়েছে; এ পথে অনেক তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর দল যায় আসে। এখানে আসবার এক বৎসরের মধ্যে বাংলার মসনদের অধিকারী বদল হয়ে গেল এই ঘিরিয়ার প্রান্তরে। আলিবর্দী খাঁ নবাব সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে, মুরশিদাবাদে নবাব হয়ে বসল। আলিবর্দী খাঁ তার পল্টন নিয়ে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। তিনি ওই পাহাড়টার মাথার উপর দাঁড়িয়ে দেখেছেন। কেশবানন্দকে বলেছেন, এক পক্ষ হারবেই কেশবানন্দ, এবং হারবে সরফরাজ। যার হারেমে হাজারের উপর উপপত্নী, সে কখনও জিতবে না। সে মরেই আছে। তুমি সেবকদের প্রস্তুত রাখ, যে পক্ষ হারবে তাদের অস্ত্র আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

লোকে বলে, আলিবর্দী বিশ্বাসঘাতকতা করে ইটের উপর রুমাল জড়িয়ে কোরান বলে পাঠিয়ে, আনুগত্যের শপথ জানিয়ে সময় সংগ্রহ করে সরফরাজকে পরাজিত করেছে। সরফরাজ খাঁ বীরের মত যুদ্ধ করে যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে। বলুক। সরফরাজের পরাজয় এবং মৃত্যু অবধারিতই ছিল। তিনি যুদ্ধের বিবরণ শুনে এতটুকু বিচলিত হন নি। পরাজিত নবাবপক্ষের সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে-আনা, মৃত সৈনিকদের পড়ে-থাকা অস্ত্র সংগ্রহের জন্যই উৎসুক হয়েছিলেন। শ্যামরূপা গড়ের ওই শেষ রাত্রি থেকে তখন তিনি অন্য মানুষ। যেন জ্বলন্ত জীবন। কুরুক্ষেত্রের লগ্নের জন্য অধীর, কুরু-ক্ষেত্রের পথের যাত্রী। এ আশ্রম কুরুক্ষেত্রের পথের ধারে শিবির।

এই শিবিরে বসে দিল্লীতে নাদিরশাহের নাদিরশাহির বিবরণ শুনেছেন।

এখানে এসেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের জন্য তিনি কেশবানন্দকে দিল্লী পাঠিয়েছিলেন। সে বিবরণ শুনতে শুনতে তিনি চিৎকার করে উঠেছেন, হে কংসারি, হে রুদ্র, পাথর ফাটিয়ে জাগো। জাগো। আমাকে বল দাও।

সূর্যোদয়ের পর বেলা ছ দণ্ড থেকে তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত সে এক অবাধ হত্যাকাণ্ড। চাঁদনীচৌক, দরিয়াবাজার, পাহাড়গঞ্জ রক্তে ভেসে গিয়েছে। মানুষ দু প্রহরে একটা বন ঘিরে এত জানোয়ার মারতে পারে না। মারাঠারা বলে তিন-চার লক্ষ মানুষ, কেউ বলে এক লক্ষ। মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে জাল-পেতে-ধরা মাঠ-চড়ুইয়ের ঝাঁকের মত। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মর্যাদাবানেরা বাড়ির শিশু-নারীদের নিজের হাতে কেটে আত্মহত্যা করেছে অথবা লড়াই করে মরেছে। নির্বীর্য কাপুরুষদের মেয়েদের মধ্যে তেজস্বিনীরা কুয়োতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেঁচেছে, হতভাগিনীরা করুণ আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করে নরকের অন্ধকারে ডুবেছে; তাতেও অব্যাহতি পায় নি, ক্রীতদাসী হয়ে পারসিক সৈন্যাবাসে বন্দিনী হয়েছে। বহুজন আতঙ্কে, অনেকজন অপমানে বিষ খেয়েছে, নিজের হাতে গলা কেটেছে, দড়ি গলায় দিয়ে মরে পরিত্রাণ পেয়েছে। প্রকাশ্য দরবারে অর্থের জন্য আমীরদের কান কেটে দিয়েছে, চৈত্রের রৌদ্রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেছে। আশী-নব্বুই ক্রোড় টাকা মূল্যের ধনসম্পদ লুঠ করে নিয়ে গেছে। কোহিনুর গেছে, ময়ূরতক্ত গেছে; হিন্দুস্থানের রাজকোষ শূন্য করে, রাজলক্ষ্মীকে ভিখারিণীর বেশে নামিয়ে দিয়ে গেছে পথে। হায় রে হায়, আর কসবী-নাচনেওয়ালী নূরবাঈকে চার হাজার রূপেয়া দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে চেয়েছিল; কিন্তু হিন্দুস্থানের বাদশা মহম্মদ শাহের অনুরোধে ছেড়ে দিয়ে গেছে। হা রে বাদশা, হা! মুণ্ডুটা হেঁট করে সেলাম বাজিয়ে রাখলি হিন্দুস্থানের তক্ত, আর ওই কসবী নূরবাই! তক্ত নয় তক্তা, কাঠের চৌকি; আর লক্ষ্মীকে পথে ভিক্ষের জন্য নামিয়ে দিয়ে বাঁচালি নূরবাঈকে? পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাশ্মীর সেলামি দিয়েছে নাদিরশাহকে। হা রে হা!

তিন দিন ধরে এমনি করে হা-রে-হা, হা-রে-হা বলে মধ্যে মধ্যে চিৎকার করেছিলেন তিনি। তৃতীয় দিন এক অত্যাচারীর মাথা কেটে তবে শান্ত হয়েছিলেন। রাজশাহীর জায়গীরদারের পাইকসর্দার, একদল পাইক নিয়ে

ধরে নিয়ে যাচ্ছিল এ অঞ্চলের কয়েকজন প্রজা এবং তাদের যথাসর্বস্ব। এই সামনের পথ দিয়েই যাচ্ছিল। মাধবানন্দ পথের ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, কৌন হ্যায় তু? নাদের শা? বাঁধকে লে যাতা? আর ওই প্রজাদের বলেছিলেন, তু লোক ক্যা হ্যায়, ভেড়ি হ্যায়?

পাইকসর্দার রহিম উদ্ধত হয়ে তাঁকে মারতে এসেছিল, আরে কাফের, ফকির—

মাধবানন্দ চিৎকার করেছিলেন, জাগো কংসারি, শঙ্কর! হরি-হর! হরি-হর!

তারপর হয়েছিল একটি খণ্ডযুদ্ধ। পাইকদের একজনও অব্যাহতি পায় নি. আহত রহিম সর্দারের মাথা কেটে নিয়েছিলেন মাধবানন্দ। রাজশাহী ফিরে গিয়ে সংবাদ দেবার লোকও অবশিষ্ট ছিল না।

প্রজারা প্রণাম করে জয়ধ্বনি দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল।

মাধবানন্দ শান্ত হয়েছিলেন।

তখন সরফরাজ খাঁর নবাবী আমল। প্রথম দিন থেকেই উজীর হাজি আহম্মদের সঙ্গে বিবাদে পঙ্গু শাসনের আমল। কিন্তু শাসনের ভয় তখন মাধবানন্দের ছিল না। তিনি তখন তিন দৈবী শক্তিতে বলীয়ান। তাঁর চোখের সম্মুখে ভবিষ্যৎ ভাসে—তিনি দেখতে পান রক্তাক্ত পৃথিবী। যে দৃশ্য তিনি এক গভীর নিশীথে গড়জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মনশ্চক্ষে দেখেছিলেন— সেই দৃশ্য ব্যাপক এবং ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছিল তাঁর কাছে। দিবারাত্রি অহরহই প্রায় গীতার শেষ শ্লোকটি আবৃত্তি করতেন—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুতে।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥

কখনও কখনও আবৃত্তি করতেন—

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি ॥

পরের দিন থেকেই আশ্রম গঠনের কাজ স্থগিত রেখে নতুন কল্পনা করে গঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। সম্মুখের মন্দির এবং ঘরদুয়ারগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে পিছনে পাহাড়ের আড়ালে গোপন দেবস্থল, আশ্রয়স্থল, ভাণ্ডার, অস্ত্রাগারগুলিকে বড় করে তোলা হয়েছিল। অর্থের অভাব হয় নি। যে অর্থ সঙ্গে এনেছিলেন সে অর্থ কম ছিল না, তাঁর নিজের অর্থ এবং দে-সরকারের বাড়ির অর্থ যোগ করে পরিমাণে হয়েছিল অনেক। তারপরও অর্থ সংগ্রহ করেছেন কেশবানন্দ। জায়গীরদার, জমিদার এবং বড় বড় বণিকদের অনেক নৌকা রাজমহলের ওপার থেকে এপারে কয়েক ক্রোশব্যাপী গঙ্গার মধ্যে লুণ্ঠিত হয়েছে। কেশবানন্দ বাধা দেন নি। কী পাপে যে এই অর্থ সংগ্রহ করে এরা, তা তিনি কেশবানন্দের মতই ভাল করে জানেন। মুরশিদাবাদে বৈকুণ্ঠে জমিদার জায়গীরদাররা পচে, জায়গীরদার জমিদারদের বাড়িতে বৈকুণ্ঠের বদলে যা আছে তাকে অবশ্যই কৈলাস বলা যায়। বড় বড় বণিকেরা বড় বড় দে-সরকার। অনেক কৃষ্ণদাসীর আশ্রয়দাতা। হাজার হাজার টাকা দিয়ে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কাশী থেকে কসবীর মেয়ে কিনে এনে পোষে। কাশী যায় বিশ্বনাথ দর্শন করতে নয়, বাঈজীর গান শুনতে। ডোবার ছোট মাছের সায়রে এসে সারা অঙ্গে লাল রঙ ধরিয়ে, উল্লাসে-জল-তোলপাড়-করে-বেড়ানোর সরলা মোহিনীরা, পল্লীগ্রাম থেকে কাঁদতে কাঁদতে এই সব বণিকদের বাগান-বাড়িতে এসে অল্পদিনের মধ্যেই নাচের আসর মাতিয়ে তোলে। এদের সকলকে ধ্বংস করতে হবে— কেশবানন্দ ঠিক করছেন। কুরুক্ষেত্রের বিরাট আয়োজন সম্মুখে। মহাযজ্ঞের জন্য বিপুল সমিধের প্রয়োজন। যে বিশাল বনস্পতির কোটরে কোটরে সরীসৃপের বাস, যার অন্ধকার তলদেশ পাপানুষ্ঠানের লীলাভূমি, তার পল্লব-শোভা দেখে ভুলো না, তার ছায়া দেখে মোহগ্রস্ত হয়ো না, তাকেই কেটে আন, মূলোচ্ছেদ করে কেটে আন।

এক বৎসর পর যেদিন আলিবর্দী খাঁ পল্টন নিয়ে বাজনা বাজিয়ে এই পথ ধরে ঘিরিয়া প্রান্তরের দিকে গেল, সেদিন আশ্রমের গোপন সংগঠন প্রায় সম্পূর্ণ। বাইরের প্রকাশ্য মঠ-মন্দির নিতান্তই সাধারণ; তা দেখে

কারও সন্দেহ হয় না। আশ্রমের সেবকসংখ্যা এক শোর উপর। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মাধবানন্দ আলিবর্দীর পল্টন এবং অস্ত্রসম্ভার দেখে বলেছিলেন—এমনই আয়োজন চাই কেশবানন্দ, প্রস্তুত হও। এক পক্ষ হারবেই। হারবে সরফরাজ। কামুক, সে মৃত। আলিবর্দী উপলক্ষ। সরফরাজের ছত্রভঙ্গ সিপাহীদের অস্ত্র আমার চাই।

অনেক অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছিল।

অস্ত্রগুলি এনে এক জায়গায় জমা করা হলে, সেগুলি দেখে খুশী হয়ে বলেছিলেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় অস্ত্রগুলি বৃদ্ধা মায়ের শব বলে শ্মশানে শিমূলগাছের ডালে টাঙিয়ে রেখেছিলেন। এগুলি সযত্নে কাফনবন্দী করে কবর দাও।

গুহাগহ্বরে রেখে দেবার নির্দেশ।

তারপর এল বর্গীর প্লাবন।

বার বার—পাঁচবার। আলিবর্দী মসনদে বসবার পর-বৎসরেই প্রথম বর্গী এল। ভাস্কর পণ্ডিত আর উড়িষ্যাফেরত আলিবর্দী বর্ধমান থেকে লড়াই করতে করতে এল কাটোয়া পর্যন্ত। আলিবর্দী বাঁচল এবং শেষ পর্যন্ত জিতল, দুর্গা-নবমীর দিন, দুর্গাপূজা-নিযুক্ত ভাস্করকে অতর্কিতে আক্রমণ করে হারিয়ে দিলে। ভাস্কর ফিরে গেল। পর-বছরই এক দিক থেকে এল রঘুজী ভোঁসলে, অন্য দিক থেকে এল পেশোয়া বালাজী রাও। পর-বছর আবার। আবার এল ভাস্কর পণ্ডিত। ভাস্কর পণ্ডিত বাংলা দেশে ঢুকেই হুকুম দিলে—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বালক, বৃদ্ধ, নারী—কোন বিচার নাই। কাটো।

দেশ শ্মশান করে দিলে। সেই চিরাচরিত বর্গীর অত্যাচার। নবাব এবার কৌশলে কার্যোদ্ধার করলে। সন্ধি করবার ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে শিবিরে নিমন্ত্রণ করে এনে অতর্কিতে তাকে হত্যা করলে। বর্গীরা পালাল।

আবার এল বর্গী। শোধ নিতে এল রঘুজী ভোঁসলে।

মাধবানন্দ স্থির হয়ে বসে দেখছিলেন। লগ্ন গণনা করছিলেন। ওদিকে দিল্লীতে বাদশাহী পোকায়-শিকড়-কাটা প্রাচীন অশ্বত্থের মত শুকিয়ে আসছে। বড় বড় শাখাগুলির প্রশাখা শুকিয়েছে। হরিদ্বার গোকুল প্রয়াগ প্রভৃতি

স্থানের মঠে মঠে তিনি কয়েকবার ঘুরে এলেন। সন্ন্যাসীরাও সর্বত্র শক্তি সঞ্চয় করছে। রাজেন্দর গিরি গোসাঁই অযোধ্যার নবাবকে আশ্রয় করে সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে একজন শক্তিমান হয়ে উঠেছে। ভাগীরথীর ওপারে মালদহ থেকে রঙপুর কোচবিহার পর্যন্ত কয়েকটি মঠের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। তিনি চোখে ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন। আসছে, শেষ লগ্ন আসছে। রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন। ঠিক এই সময় এল, এক নতুন অবস্থা। অবধূত সন্ন্যাসী বলেছেন, কোন নূতন সিদ্ধি আসতে আসতে আসছে না।

কেশবানন্দ শ্যামানন্দ জানে, এ অভ্রান্ত সত্য। তারা চোখে দেখেছে যে!

ঘটনাটা ঘটে যেবার রঘুজী ভোঁসলে এল ভাস্করের হত্যার শোধ নিতে। সেইবার বর্গীদের সুযোগ করে দিয়েছিল মুস্তাফা খাঁ। আলিবর্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এই সামনের পথ ধরেই মুরশিদাবাদ থেকে পাটনার দিকে ছুটল। পাটনা আক্রমণ করে দখল করবে। পথে রাজমহল লুঠ করলে। আলিবর্দী অনুসরণ করলেন তাকে। ওদিকে মুস্তাফার নিমন্ত্রণে রঘুজী ভোঁসলে ঢুকে বসল বাংলায়। মেদিনীপুরের পথে বর্ধমান। মাধবানন্দ স্থির হয়ে বসে সংবাদ শুনতেন। কেশবানন্দ সংবাদ সংগ্রহের সুনিপুণ ব্যবস্থা করেছিলেন। নিত্য সংবাদ আসত। ঠিক দু দিন তিন দিনে নির্ভুল সংবাদ এসে পৌছত। বর্ষার মেঘের মত থমথমে হয়ে থাকতেন মাধবানন্দ। বিগ্রহের সম্মুখে বসে গভীর কণ্ঠে গীতার চতুর্থাধ্যায় পাঠ করতেন—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

কখনও মনে মনে কখনও উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করতেন, কবে? কবে? কবে? হিন্দু হয়ে মহারাজ শিবাজীর পতাকা—সাক্ষাৎ শিবতুল্য রামদাস স্বামীর উত্তরীয়-পতাকা বহন করে শুধু অর্থলালসায় গ্রাম নগর অত্যাচারে অত্যাচার উৎসন্ন করে দিলে, পাপের উপর পাপ জমা হয়ে আকাশ স্পর্শ করলে, বায়ু দূষিত হল, জল কলুষিত হল, তবু সময় হল না? তিনি মনশ্চক্ষে দেখতেন, গ্রাম জ্বলছে, বর্গীদের চিৎকারে অট্টহাস্তে আকাশ বাতাস চমকে উঠছে।

মানুষের ঘরের মেঝে স্তূপকরা মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়েছে, হাত-পা-কাটা মানুষ অন্তিম যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; কান-নাক-কাটা মেয়েরা এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুকের রক্তাক্ত কাপড়খানা সরিয়ে দিচ্ছে। হে ভগবান! স্তন নেই, পাশবিক অত্যাচারের পর স্তন কেটে ছেড়ে দিয়েছে তাদের। এক-একদিন অধীর হয়ে বিভ্রান্তের মত সারা দিনরাত্রি পায়চারি করতেন। ইচ্ছাও মধ্যে মধ্যে হয়েছে, তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন। নিবৃত্ত করেছেন কেশবানন্দ। প্রশ্ন করেছেন, কাকে বাঁচাবেন? মানুষকে, না নবাবকে? তাতেই কি অধর্মের উচ্ছেদ হবে? আলিবর্দী অবশ্য সরফরাজের মত ব্যাভিচারী নয়, সে শক্তিমান, কৌশলী আর বিচক্ষণও বটে। কিন্তু তারপর? নবাবের দৌহিত্র ভাবী নবাবের চরিত্রের কথা তো জানেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন মাধবানন্দ, যার মধ্যে অকস্মাৎ মনে পড়ে যাওয়ার অর্থ সুস্পষ্ট।

হ্যাঁ। মনে করিয়ে দিয়েছে কেশবানন্দ। তিনি জানেন, শুনেছেন, সিরাজউদ্দৌলার কথা। অন্যের কাছে শুনেছেন এবং নবাবদৌহিত্রের দ্বারা অত্যাচারিতের অবস্থা চোখে দেখেছেন। নিতান্তই বালক—এখনও ষোল বছর বয়সও পূর্ণ হয় নি। এখন থেকেই তার ভবিষ্যৎ স্বরূপ সুস্পষ্ট। মুরশিদাবাদ চৌকবাজার তার ভয়ে সন্ত্রস্ত। উদ্ধত দাম্ভিক নিষ্ঠুরই শুধু নয়, এরই মধ্যে অনাচার, দেহলালসার কথাও শোনা যায়। নবাব আলিবর্দী পর্যন্ত তার অত্যাচারে বিব্রত হয়ে তাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, সংসারে ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণদান করে যাঁরা গাজী হন, তাঁরা জানেন না সংসার-সংগ্রামে স্নেহের অত্যাচারের সঙ্গে যাঁরা যুদ্ধ করে জর্জরিত ক্ষত-বিক্ষত, তাঁরাই শ্রেষ্ঠ বীর। একজন শত্রুর হাতে মরে, অন্যজন অসহায় ভাবে মরে স্নেহাস্পদের হাতে। নবাব আলিবর্দী শুধু বর্তমানের কথাই লেখেন নি, ভবিষ্যৎ নবাব-গৌরবের কথাও বলেছেন।

ঠিক বলেছেন কেশবানন্দ। পাপ নিজের ঘাতে সংঘাতে পরিপূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ুক। তখন তাঁর শক্তিতে যতটুকু সম্ভব আঘাত হানবেন। আসুক, আগে ভগবানের অমোঘ নিয়মে পরিণাম আসুক।

রঘুজী ভোঁসলে বর্ধমানে ঢুকে ন লক্ষ টাকা আদায় করলে এক মাসে।

হঠাৎ একদিন সংবাদ এল, বর্গী ছাউনি তুলে কাটোয়ার পথে না-হেঁটে বীরভূম ঢুকেছে। ছাউনি গেড়েছে উত্তর বীরভূমে কেন্দুয়ার ডাঙায়। পথে গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে। কেন্দুয়ার আশপাশের কয়েকখানা গ্রাম তিন দিনে মুছে দিয়েছে। সম্ভবত এই পথ ধরে বিহারে গিয়ে ঢুকবে। নবাবের সঙ্গে মুখোমুখী হবে না।

কদিন পর সংবাদ এল, বর্গীরা হাতেমপুর আক্রমণ করে লুঠতরাজ করেছে। ফৌজদার হাফেজ খাঁ মারা গেছে।

হাফেজ খাঁ মারা গেছে? বর্গী হাতেমপুর লুঠ করেছে? মাধবানন্দের মনে পড়ে গিয়েছিল, গড়জঙ্গলে কয়ো একটি নীলা কুড়িয়ে পেয়েছিল। কয়ো বলেছিল হাফেজ খাঁর বেগমের কথা। বড় ভাল। তার কী হয়েছে?

শুধু হাতেমপুর নয়, হাতেমপুর থেকে ইলামবাজার, সেখান থেকে সুপুর পর্যন্ত বর্গীরা আক্রমণ করেছে। ইলামবাজারে দে-সরকারের বাড়ি শেষ। ঠেকেছে শুধু সুপুরে। আর অজয় পার হয়ে ইছাই ঘোষের দেউলের চারিপাশের গ্রামগুলি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করেছে ইলামবাজারের বৈরাগীপাড়ায়।

মাধবানন্দ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কেশবানন্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেশবানন্দ!

কেশবানন্দ তার অর্থ বুঝেছিলেন। তিনি বললেন, অসম্ভব অবশ্যই নয়। এ সেই সন্ন্যাসী-ছদ্মবেশী বর্গী সেনাপতি, প্রতিশোধ নিয়েছে, এমন নিশ্চয়ই হতে পারে। আবার তাই যে নিশ্চিত সত্য এমন মনে করারও কোন কারণ নেই?

বৈরাগীপাড়ার অত্যাচারের কথা, দে-সরকার বাড়ি ধ্বংস করার কথা, এপারে আমাদের আশ্রমের চারিপাশের গ্রামের উপর অত্যাচারের কথার পরেও কারণ নেই?

কেশবানন্দ বললেন, আমি বিস্তারিত খবরের জন্য লোক পাঠাচ্ছি।

মাধবানন্দ আর কথা বললেন না, উঠে গিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। ইলামবাজার, হাতেমপুর অঞ্চলের ঘটনা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করতে আসনে

বসলেন। প্রথমেই দেখলেন, আগুন জ্বলছে, বৈরাগীদের কুটির জ্বলছে। আর্ত চিৎকার উঠছে নারীকণ্ঠে। চেনা কণ্ঠস্বর, কিন্তু বর্গী সিপাহীর অট্টহাসির রোলে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কার কর্কশ কণ্ঠের আর্তনাদ! এ তো সেই উচ্ছিষ্টভোজী বৈরাগী কয়ো। হ্যাঁ, ওই তো দেখা যাচ্ছে, হাত-পা-কাটা কয়ো পথের পাশে পড়ে চেঁচাচ্ছে। কী বলে চেঁচাচ্ছে? মোহিনী! মোহিনী! ওঃ, ওই যে চেনা নারীকণ্ঠ, ও-কণ্ঠ মোহিনীর!

—নবীন গোসাঁই! বাঁচাও। বাঁচাও। বলতে বলতে মোহিনী ছুটে আসছে। মোহিনীর বক্ষবাস রক্তে ভেসে গেছে।

ছি—ছি—ছি! চোখ খুললেন মাধবানন্দ! ছি—ছি—ছি! পরক্ষণেই দৃঢ় হলেন।

এ-পারের অসহায় গ্রামগুলির লোকের কী হল? ওঃ, একান্ত অনুগত সেই বীর বাগদী, ওই যে তার বুকে একখানা বর্শা আমূল বিদ্ধ হয়ে গেছে! ওঃ—

বিস্তারিত সংবাদ এল পনের দিন পর। জয়দেব কেন্দুলীর মহান্ত মহারাজের কাছ থেকে চিঠি এল। তখন রঘুজী ভোঁসলে বীরভূম পিছনে রেখে দক্ষিণ বিহারে গিয়ে ঢুকেছে।

বিস্ময়কর বিবরণ। মাধবানন্দকেই মহান্ত লিখেছেন—"কবিরাজ গোস্বামী জয়দেব প্রভুর আরাধ্য দেবতার আশীর্বাদে এবং তদীয় তপস্যার পুণ্যে অত্র কেন্দুলী রক্ষা পাইয়াছে। আমরা বিগ্রহ লইয়া নিরাপদে অন্যত্র সরিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু এতদঞ্চলে যে হামলা ও অত্যাচার হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার সাধ্য নাই। এ অত্যাচার, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানে যাহা হইয়াছে, তাহা করিয়াছে সেই ছদ্মবেশী বর্গী সন্ন্যাসী, যাহাকে আপনি খেদাইয়া দিয়াছিলেন। এতদিন পর শোধ লইল। আপনার পড়ো আশ্রমটি ক্রমশ পড়িয়াই যাইতেছিল, যতটুকু খাড়া ছিল তাহা ধ্বংস করিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে। পাশের গ্রামগুলিকেও ছাই করিয়া ছাড়িয়াছে। ইলামবাজারের বৈরাগীপাড়াও ধ্বংস। দে-সরকারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নুন জামির দিয়া বধিয়াছে। সরকার-বাটির কাহাকেও বাতি দিতে রাখে নাই। পাষণ্ড

উচিতমত শাস্তি পাইয়াছে। এই পাষণ্ডই একরূপ হাতেমপুরে বর্গীদের ডাকিয়া আনিয়াছে। ফৌজদার ন্যায়পরায়ণ হাফেজ খাঁর সর্বনাশ করিয়াছে। তাঁহার পত্নী সাধ্বী শেরিনা বেগম আত্মহত্যা করিয়া জুড়াইয়াছেন। সে এক অপরূপ উপাখ্যান। অমাবস্যার রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের মতই অপরূপ। বেগম শেরিনা খোদ পাতশাহের ভাইঝি। পাতশাহের এক ভাইপো শাহ হুসেনের সহ সাদীর কথা হইয়াছিল।"

সে-কথা মাধবানন্দ জানেন। মনে পড়ে গেল হুসেনকে। মত্তপ উচ্ছৃঙ্খল যুবক নেশায় আরক্তমুখ স্খলিতপদক্ষেপে তাঁর নৌকায় উঠে জড়িত কণ্ঠে উদ্ধত ভঙ্গিতে প্রশ্ন করেছিল, হিন্দু ফকিরের কি এলেম আছে? এক বেশরমী আওরত ফেরার হয়েছে, তার নাম আমিনা, বহুত সুরত তার, রঙ গুলাবের মত; চোখ হরিণের মত।

সে এক কাব্যের রূপ বর্ণনা করে বলেছিল, সে এক বেইমান ছোট ঘরের বাচ্চা, উসমান তার নাম, তার সঙ্গে ফেরার হয়েছে। খড়ি পেতে সে কোন্ দিকে কোন্ মুলুকে গিয়েছে বলতে পারলে বকশিশ দেবে। কেশবানন্দ অপূর্ব চাতুর্যে তার নিজের অনুমানের কথাগুলি জেনে নিয়ে তাই বলে খুশী করে ফিরিয়েছিলেন। মাধবানন্দ মনে মনে সেই আমিনার রুচির প্রশংসা করেছিলেন; এই লোকটির পদমর্যাদা, দেহের বাদশাহী রক্ত-গৌরব সমস্ত সত্ত্বেও তার কুৎসিত প্রকৃতিকে ঘৃণা করে উপেক্ষা করেছে।

আমিনা এবং উসমান পরস্পরকে ভালবেসে গোপনে বিবাহ করে সমস্ত বিপদ মাথা পেতে নিয়ে মুক্ত পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে পড়েছিল। যা হবার হবে। দশ দিকে শত শত পথ, সহস্র সহস্র হয়ে কোথায় চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত শেরসাহী সড়ক ধরে শ্যামরূপার গড়জঙ্গলে উপস্থিত হয়ে ও-পারে হাতেমপুরে হাতেম খাঁয়ের নতুন গড়ের সন্ধান পেয়ে তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছিল। আমিনা এবং উসমান হয়েছিল শেরিনা ও হাফেজ। পুত্রহীন হাতেম খাঁ তাঁর অন্তিমে হাফেজকে পুত্রস্নেহে গ্রহণ করে দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর সর্বস্ব এবং রাজনগরের নবাবকে অনুরোধ করেছিলেন ফৌজদারি দেবার জন্য।

উদার ন্যায়পরায়ণ হাফেজ খাঁ। কয়োর হাতে মাধবানন্দের পত্রে অসহায়া

মোহিনীর বিবরণ শুনে দে-সরকারের মত শেঠকে এবং তাঁর বর্বর পুত্রটাকে গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা বোধ করেন নি।

দে-সরকার চাতুরী খেলে ফৌজদারের হাত থেকে মুক্তি পেলে। কিন্তু অক্রূরের পাপের ভার তখন পূর্ণ হয়েছে, ভগবানের রোষ নেমে এল, তাঁর সেবক মাধবানন্দের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে। কংসারির সেবকেরা তার দীর্ঘদিনের পাপপথে সঞ্চিত ধন কেড়ে নিলে। অক্রূর বলির পশুর মত নিহত হল।

দে-সরকার কিন্তু পাথরে-গড়া মানুষের মত সব সহ্য করলে। আবার বিবাহ করলে, আবার ধীরে ধীরে ব্যবসায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে। গড়জঙ্গলের আশ্রমের সন্ন্যাসীরা চলে গেছে, তাদের সন্ধান সে পায় নি। তার সব আক্রোশ গিয়ে পড়েছিল হাফেজ খাঁর উপর। তার সন্দেহ ছিল আশ্রমের সন্ন্যাসীদের এই ডাকাতির পিছনে হাফেজ খাঁর গোপন প্রশ্রয় আছে। সাপের আক্রোশের মত সে এই আক্রোশকে প্রতিটি দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে পোষণ করত।

সুযোগ এল।

একদিন ইলামবাজারের ঘাটে এল এক নৌকো। নামল হুসেন।

পরিচয় হতে দেরি হল না। সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী দে-সরকার, তার গদিতে এল হুসেন: এক মোকাম চাই। আচ্ছা মোকাম। সে শুনেছে বড়া শেঠের বেটার এক বাগিচাওয়ালা কোঠি আছে। আর শুনেছে, এখানে খুব ভাল বক্‌মী আছে, শেঠ ইচ্ছে করলে দিতে পারে। সব তার একতিয়ারের অন্দর। আর চাই টাকা। তার কাছে আছে জহরত। কিছু সন্দেহের কারণ নাই। তার কাছে বাদশাহী ফরমান আছে। বলেই সে কয়েকটা মুক্তা এবং একটা হীরে বের করে দিয়েছিল। তার পর হুসেনের সমাদর হতে দেরি হয় নি। এবং প্রথম দিন রাত্রেই সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমিনা আর কুত্তার বাচ্চা উসমানকে সে জানে কি না! নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছিল সে আমিনা উসমানের।

দে-সরকার সুচতুর। চেহারার বর্ণনা এবং তাদের নিরুদ্দেশ হওয়ার সন তারিখ শুনে মনে মনে হিসেব করে মিলিয়ে সন্দেহ হতে তার দেরি

হয় নি। কিন্তু সে-দিন কিছু বলে নি। পরের দিন ভাল করে জেনে শুনে হুসেনকে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ফৌজদারকে দেখিয়েছিল: দেখিয়ে শাহজাদা, উয়ো আদমী আপকা উসমান হ্যায় কি নহি!

—ওহি। ওহি। ওহি। নিমকহারাম কুত্তা—

—চুপ কর শাহজাদা। এ তোমার দিল্লী নয়। দিল্লীর তোমার সে দিন নাই। তোমাকে চিনতে পারলে তোমাকে কোতল করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। আমারও এবার জান নিয়ে ছাড়বে। সবুর কর। ফিরে চল এখন। হুঁশিয়ার, কারুর কাছে এ কথা বলো না। বলবে না তোমার নাম হুসেন। বলবে, তুমি সওদাগর। গালার খেলনা সওদা করতে এসেছ।

হুসেন বলেছিল, ঠিক বলেছ। বহুত এলেম তোমার। কালই আমি লোক পাঠাব মুরশিদাবাদ নবাবের কাছে।

—নবাব এখন এক দিকে মুস্তাফা খাঁর কামড়ে, অন্য দিকে বর্গীর থাবার খোঁচায় ছটফট করছে। তোমার আমিনাকে উদ্ধার করবার এখন ফুরসত কোথায়?

—তব্? বহুত আচ্ছা, ওর সঙ্গে আমি লড়াই করব। ও আর আমি।

—না। এক কাজ কর। বর্গীরা ছাউনি করেছে কেন্দুয়ার ডাঙায়। তুমি তাদের কাছে যাও। তোমার কাছে জহরত রয়েছে, ঘুষ দাও, বল, হাতেমপুরে চড়াও হোক। সোনা-রূপা জহরত তাদের, আমিনা তোমার। হাতেমপুরের পথঘাট, হালহদিস আমি সব জানি। আয়নার মত সাফা করে আমি সব বাতলে দেব। আমার আক্রোশ মিটবে।

রঘুজীর সঙ্গে ছিল মীর হাবিব। নিমকের গুণ, নিজের জাত, ধর্মের দাম তার কাছে কিছুই নাই। একছড়া মুক্তোর হার নিয়ে সে যোগাযোগ করে দিলে। কেন্দুয়ার ডাঙা থেকে বিহারের পথে যাওয়া স্থগিত রেখে ঘুরল বর্গীরা। রাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতেমপুরের গড়ের উপর। হাফেজ খাঁ অপ্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু রঘুজীর বর্গীর দলে চোদ্দ হাজার সওয়ার আর হাতেমপুরের গড়ে সবে হাজার তিনিক পয়দল আর সওয়ার। তার উপর বিশ্বাসঘাতক দে-সরকারের গোপন পথ-দেখানো। কেন্দুয়া থেকে আসবার

সড়ক-পথের উপর লক্ষ্য রেখে হাফেজ খাঁ পল্টন সাজিয়েছিলেন। দে-সরকার অন্য পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথে এসে তারা গড় ঘিরে মশাল জ্বেলে আত্মপ্রকাশ করলে। আশ্চর্য ভাগ্যের খেলা! নিয়তি! ওদিকে তখন শেরিনা বেগম প্রথম সন্তান প্রসব করে সূতিকাগারে। হাফেজ খাঁ অকস্মাৎ এসে দাঁড়ালেন। বিনিদ্র হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শেরিনা বসে আল্লাকে ডাকছেন।

—বিদায় নিতে এসেছি।

—বিদায়?

—হ্যাঁ, বিদায়। অসংখ্য বর্গী পল্টন। তার উপর—

—কী তার উপর?

—হুসেন। মশালের আলোয় হুসেনকে দেখলাম।

—হুসেন! চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, চমকে উঠে দাঁড়াল শেরিনা বেগম।

—সে এখান পর্যন্ত এসেছে। আমার ভাবনা শেরিনা—

—সব ভাবনা আমাকে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। লড়াই কর। বিশ্বাস রাখ আমার উপর। আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ। দাও, আমাকে শেষ চুম্বন দাও।

শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে হাফেজ খাঁ চলে গেলেন। শেরিনা বেগম বসে রইলেন। আকাশস্পর্শী কোলাহল। রক্তাক্ততার মত অন্ধকারের বুকে মশালের আলোর ছটা নাচছে। মুহুর্মুহু বন্দুক এবং বারুদ-ফাটার শব্দ। ওদিকে রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ উঠল। ভাঙল ফটক। শেরিনা বিবি স্থির থাকতে পারলেন না। বাঁদীর কোলে শিশুসন্তানকে দিয়ে একখানা তরোয়াল হাতে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে।

একটা সমবেত ভয়ার্ত ধ্বনি উঠল, ফৌজদার—

হাফেজ খাঁ গুলির আঘাতে আহত হয়ে পড়েছেন ঘোড়া থেকে। গড়ের পল্টনেরা পালাচ্ছে। হুসেন এসে তার তরোয়ালখানা হাফেজের বুকে বিঁধে দিলে। চিৎকার করে বারেকের জন্য নিজের তরোয়ালখানা উদ্যত করে হাঁকলেন শেরিনা বিবি, পালিয়ো না। রোখো। ওই দোজখের

কুত্তাকে রোখো। কিন্তু পর-মুহূর্তে তরোয়ালখানা নামিয়ে ঘুরলেন। কী হবে? হাফেজ, তার প্রিয়তম নাই, তিনি বেঁচে কী করবেন? তিনিও মরবেন। হঠাৎ বাঁদীটা সামনে এসে কোলের শিশুকে তাঁর হাতে দিয়ে বললে, নাও বেগম সাহেবা। তোমার ছেলে নাও। তাঁর কোলে ছেলেটিকে দিয়ে পালাল ছুটে। শিশুর স্পর্শে চমকে উঠলেন শেরিনা বেগম। তাই তো! এর উপায় কী হবে? একে হত্যা করে তার পর মরবেন? না, তা পারবেন না। নিজের সন্তানের বুকে—। না। না। তার চেয়ে—। গাঢ় স্নেহে বুকে চেপে ধরলেন তাকে।

—আমিনা। এইবার? বিপুল উল্লাসে 'আ মেরি পিয়ারি' বলে কে হি-হি করে হেসে উঠল! কে আবার? হুসেন।—কিছু ভয় নেই, আমি তোমাকে দিল্লী নিয়ে যাব। বাদশ হব। শের খাঁকে মেরে জাঁহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসাকে নূরজাঁহা করেছিলেন। আমি হব দুসরা জাঁহাঙ্গীর, তুমি হবে দুসরি নূরজাঁহা। পিয়ারী! শেরিনা!

বেগম হাসলেন বিচিত্র হাসি। উঠতে লাগলেন উপরে।

—আমিনা!—হুসেনও উঠতে লাগল।

—এস।

—আমিনা!

—এস।

—কোথায়?

—এস। ভয় কেন? উঠতে লাগলেন শেরিনা। উঠলেন ছাদে।

এবার হুসেন নিশ্চিন্ত হয়েছে। যাবে কোথায় আর?

শেরিনা বেগম আলসের উপর উঠলেন—বুকে তাঁর শিশু। দেখ, কোথায় যাবে। আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, ওখানে। যেখানে হাফেজ গিয়েছে। যেখানে তোমার মত পাপী কোন কালে যেতে পারবে না। পার তো এস। এস।

—আমিনা! আমিনা!

উত্তরে জলতরঙ্গের মত সঙ্গীতময় হাসি সেই বীভৎসতার মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল। তারপরই আর শেরিনা বেগমকে দেখা গেল না। মুহূর্ত পরে

নীচের প্রাসাদ-সরোবরের বুকের জলে সশব্দ আলোড়ন উঠল। সন্তানকে বুকে নিয়ে মাতাপুত্রে ঝাঁপ খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

"এ উপাখ্যান লইয়া এ দেশে ইহার মধ্যে লোকে গীত রচিয়া গান করিতেছে মাধবানন্দজী। শেরিনা বিবির কবরে নিত্য সন্ধ্যায় চেরাগের সারি জ্বালায়। গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করে। হিন্দু মুসলমান নাই। হিন্দু মেয়েরা সিন্দুর দেয়; বলে, তোমার মত যেন সতী হয়ে যেতে পারি। এখন ইলামবাজারের কথা জানাই। এই বর্গীর দলে ছিল সেই সাধু ছদ্মবেশী বর্গী মনসবদার।"

সে হাতেমপুর আক্রমণের সময় একদল বর্গী নিয়ে আসে ইলামবাজার। গতবার সে যখন লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে যায়, তখন অক্রূরের পরিচয় জেনে গিয়েছিল। কৃষ্ণদাসীর পরিচয়, ওপারের সন্ন্যাসীদের পরিচয়—সবই সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিল। অক্রূরের বাপের ধনসম্পত্তির কথাও জেনেছিল। সুতরাং সর্বাগ্রে আক্রমণ করেছিল দে-সরকারের বাড়ি। খুঁজেছিল অক্রূরকে। অক্রূর মরেছে শুনে বলেছিল, তবে আন্ ওর বাপকে, আর আন্ যে যেখানে আছে তাদের। কেটে ফেল্। ঘরের মেঝে খুঁড়ে ফেল্। তারপর জ্বালিয়ে দে ঘর।

দে-সরকার নিশ্চিন্ত ছিল। তার বাড়ি যেন কোন মারাঠা আক্রমণ না করে—এই মর্মে এক আদেশপত্র সে সংগ্রহ করে রেখেছিল মীর হবিবের কাছ থেকে। কিন্তু প্রতিহিংসাপরায়ণ বর্গী সেনাপতি সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তার উপর থুতু ফেলে টুকরোগুলোর উপর নিজের ঘোড়াটাকে চালিয়ে দিয়ে বলেছিল, কুত্তা, সে কুত্তাই। সে কারও পোষাই হোক আর রাস্তারই হোক। ওরে কুত্তা, তোর বেটা কুত্তা আমাকে কামড়াতে এসেছিল, তার শোধে তোদের সব কুত্তাকে আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারব। এমনি করে, এমনি করে, এমনি করে। নিয়ে আয় রে নুন জামির, দে ওর কাটায় কাটায় ছিটিয়ে।

সেখান থেকে গিয়েছিল বৈরাগীপাড়া। কাঁহা হ্যায় উ দুনো লৌণ্ডি?

কাঁহা হ্যায়? জ্বালিয়ে দে, গোটা বস্তি জ্বালিয়ে দে। বের করে আন্। নাক কান হাত পা কেটে দে।

বৈরাগীপাড়া জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কোনও বৈরাগীকে পায় নি। তারা তার আগেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সুপুরে—ডাকিনীসিদ্ধ আনন্দসুন্দর ঠাকুরের গড়ের মধ্যে। প্রেমদাস বৈরাগীর ঋণ ঠাকুর ভোলেন নি।

বর্গীরা ছুটে গিয়েছিল সুপুরের দিকে। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়েছে।

কেন্দুলীর মহান্ত মহারাজ লিখেছেন, গোস্বামীজী, লোকে বলছে চার ফটকে একসঙ্গে বর্গীরা আক্রমণ আরম্ভ করলে, আনন্দসুন্দর তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেন; একই সময়ে বর্গীরা এক আনন্দসুন্দরকে সাদা ঘোড়ার উপর আরূঢ় হয়ে চার ফটকেই উপস্থিত দেখে ভীত হয়ে ফিরে গিয়েছে।

কেউ কেউ বলছে, বর্গীরা সংখ্যায় ছিল একশো-দেড়শো; আনন্দসুন্দর তাঁর গড়ের মধ্যে হাজার দু হাজার জোয়ান জমায়েত করে দুর্দান্ত সাহসের সঙ্গে বাধা দিয়েছিলেন। বন্দুক-পিস্তলও তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। সেই কারণেই বর্গীরা ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এবং তাদের সময়ও ছিল না। যাই হোক মাধবানন্দজী, বৈরাগীপাড়া পুড়ে ভসম্ হয়ে গেছে; কিন্তু আনন্দসুন্দর ঠাকুর বীরও বটে সাধকও বটে, তার জন্য নিরীহ বৈরাগীরা রক্ষা পেয়েছে। তার পরই তারা ওপারে গিয়ে আপনার পরিত্যক্ত আশ্রম জ্বালিয়ে ধ্বংস করে পার্শ্ববর্তী গৌরাঙ্গপুর, লোহাগড়ি, গড় গোয়ালপাড়া, কোটালপুকুরে আগুন দেয়; কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা তার আগেই গভীর বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের কারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। শেষ লিখেছেন, "বর্গীরা এই ঘটনার পরদিনই বিহার-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। দেশ শ্মশান হইয়াছে। স্বয়ং নবাব আলিবর্দী বর্গীর সঙ্গে লড়াই দিতে বাহির হইয়া ভুজা চানা চাউল আটা দুই টাকা সের কিনিয়া জান বাঁচাইয়াছে। আর কেন্দুলী বাঁচিয়াছে কবিরাজ গোস্বামীর দৈব্যানুগ্রহে। দক্ষিণ অঞ্চলে কবিরাজ গোস্বামীর গীতগোবিন্দ শ্রীমদ্ভাগবত তুল্য পবিত্র এবং প্রিয়। বর্গীরা যাওয়া-আসার পথে নাকি বার বার প্রণাম করিয়া গিয়াছে। স্থানান্তরে নিরাপদে থাকিয়া পরে ফিরিয়া আসিয়া

দেখিতেছি, সমস্তই অটুট আছে, একটি ইটও খসে নাই। সমস্ত গ্রামের মধ্যে একটি লোক ছাড়া লোক ছিল না। সে আপনার সেই কউয়া বৈরাগী। সে বহুকাল হইতেই কদমখণ্ডীর বটগাছের ডালের উপর বাসা বাঁধিয়াছে। গাছের শীর্ষদেশে বসিয়া 'মোহিনী' 'মোহিনী' বলিয়া চিৎকার করে। সে কিন্তু বর্গীর ভয়েও স্থানত্যাগ করে নাই। সে বলে, জয়দেব ঠাকুর নাকি নিজে কেন্দুলীকে রক্ষা করিয়াছেন। গাছের মাথা হইতে সিদ্ধাসনে সে তাঁহার দিব্যমূর্তি দেখিয়াছে।"

পত্র শেষ হলে মাধবানন্দ দীর্ঘক্ষণ—পূর্ণ অষ্টপ্রহর স্তব্ধ হয়ে সেই একই স্থানে বসে ছিলেন। তারপর প্রশ্ন করেছিলেন, বৈরাগীপাড়া পুড়েছে, কিন্তু বৈরাগীরা বেঁচেছে? কারুর কিছু হয় নি?

কেশবানন্দ সারা পত্রখানির উপর আবার একবার চোখ বুলিয়ে দেখে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তাই লিখেছেন মহান্ত মহারাজ। সুপুরের আনন্দসুন্দর গোস্বামী তাদের আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছেন।

আবার কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করেছিলেন, কয়ো বৈরাগী কেন্দুলীর কদম-খণ্ডীর ঘাটের বটগাছের ডালে—

—হ্যাঁ, সারা কেন্দুলীর মধ্যে একা কয়োই তার বটগাছের ডালের বাসা ত্যাগ করে নি। সে সিদ্ধাসনের উপর কবিরাজ গোস্বামীর দিব্য-মূর্তি দেখেছে।

—তার কোনও অনিষ্ট হয় নি? অক্ষত দেহেই আছে?

—মনে তো তাই হয়। অবশ্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু লেখেন নি তিনি।

—কয়ো গাছের মাথার উপর বসে চিৎকার করে, লিখেছেন না?

—হ্যাঁ। 'মোহিনী' 'মোহিনী' বলে চিৎকার করে। মোহিনী সেই মেয়েটি, যাকে উদ্ধারের জন্য—

হাত তুলে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলেছিলেন মাধবানন্দ। কেশবানন্দ নীরব হয়ে কিছুক্ষণ নূতন প্রশ্ন বা কথার প্রতীক্ষা করে অবশেষে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন। মাধবানন্দ সেই হাত তুলে শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের প্রান্তরের

দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন মাটির মূর্তির মত। বহুক্ষণ পর একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বোধ করি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন, তবে ?

কিছুক্ষণ পর আবার বলেছিলেন, আমি যে স্পষ্ট দেখলাম। আরও অনেকক্ষণ পর আবার বলেছিলেন, সব ভ্রান্তি ?

মনে পড়ে গেল অথবা আবার তিনি যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পেলেন, হাত-পা-কাটা কয়ো চিৎকার করছে—মোহিনী ! মোহিনী !

নাক-কান-কাটা মোহিনী ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে, ভয়ে যন্ত্রণায় উন্মাদিনীর মত ছুটে চলে আসছে, তার বক্ষাঞ্চল রক্তসিক্ত, সে ডাকছে—বাঁচাও। ওগো নবীন গোসাঁই ! ও—গো—

এ দর্শন তা হলে ভ্রান্তি ?

সন্ধ্যা তখনও আসন্ন। মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছে। কাঁসর-ঘণ্টায় ধ্বনি উঠছে, দামামায় ঘা পড়ছে, আরতি হবে; মাধবানন্দ উঠে হাতমুখ ধুতে ধুতেই ডেকেছিলেন, কেশবানন্দ !

কেশবানন্দ কাছেই ছিলেন। গুরুর মানসিক অবস্থান্তরে শঙ্কিত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, গুরুজী !

—আমি একবার কেন্দুলী যাব। কাল বা পরশুর মধ্যে। তুমি আয়োজন কর। সঙ্গে অর্থ নাও। গৌরাঙ্গপুর লোহাগড়ি গ্রামগুলির লোকেদের যা ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ না করলে ধর্মে পতিত হতে হবে।

কেন্দুলী গিয়েছিলেন মাধবানন্দ। মহান্তের অতিথি হয়েছিলেন। কাটোয়া হয়ে অজয়ে ঢুকে যে ভাবে প্রথমবার শ্যামরূপার গড়ে গিয়েছিলেন সেই ভাবেই। সেই ভাবেই তিনি নৌকার ছইয়ের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে বর্গীদের অত্যাচারের পৈশাচিক দৃশ্য দেখতে দেখতে গিয়েছিলেন। পোড়া গ্রাম, গ্রামের পর গ্রাম; পড়ো প্রান্তরের মত তৃণশূন্য কঠিন শস্যক্ষেত্র, হাত-পা-কাটা মানুষ, নাক-কান-কাটা কর্তিতস্তন নারী—বীভৎস দৃশ্য। একদিন রাত্রে একটি ঘাটে নৌকা বেঁধেছিলেন, সেখানে গান শুনেছিলেন, দল বেঁধে পালাবন্দী গান—

উপায় কি করি বল, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান—
কিমতে কও বাঁচে জান মান ?
বরগীরা আইল দ্যাশে, হাজারে হাজারে, যমদূতের সমান—
কিষ্টো কালী শিবো ভগবান !
মানুষ হইলে যম, সাক্ষাৎ যমের বাড়া
দেবতারে মানে যম, মানুষ-যমে ডরে দেবতারা—
মানুষে ঘর ছাড়তে নারে, দেবতারা আগেভাগে পালান—
কিষ্টো কালী শিবো ভগবান !
কবি গঙ্গারামে বলে, দেবতায় কেনে দুষ ?
অন্তর খুঁজিয়া দেখ, কত পাপ পুষ।
ওরে মানুষে থেকা পাপ বেশী জড়ো কৈলে বিন্ধপর্বত সমান—
কি করিবে, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান !
ওরে তবে শুন বিবরণ—
রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা
রাত্রদিন ক্রীড়া কর পরস্ত্রী লইঞা।
শৃঙ্গার কৌতুকে জীব থাকে সর্বক্ষণ
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কক্ষণ !
পরহিংসা পরনিন্দা রাত্রি দিনমান—
জর্জর পৃথিবী, পাপ বিন্ধপর্বত সমান—
কলির ঠ্যাঙায় ধর্ম্ম বৃষের যায় যায় শেষ পদখান—
রুষ্ট হইল কিষ্টো কালী শিব ভগবান !
শুন শুন বিবরণ।—
এত যদি পাপ হইল পৃথিবী উপরে—
পাপের কারণে পৃথিবী ভার সহিতে নারে—
তবে পৃথিবী চলি গেলা ব্রহ্মার গোচর—
কান্দিতে লাগিলা পৃথী ব্রহ্মা বরাবর।
পাপের ভারায় ভেঙে বুঝি যায় বা বক্ষখান—
কিষ্টো কালী শিবো ভগবান !

দীর্ঘ গান। মূর্খ গঙ্গারাম কল্পনা করেছে, এই পাপের প্রতিবিধানের জন্য শিব নন্দীকে পাঠালেন শাহরাজার মধ্যে অধিষ্ঠান হতে।

এতেক শুনিয়া নন্দী গেলা শীঘ্রগতি
উপনীত হইলা গিয়া শাহরাজা প্রতি।
শাহরাজা বাহু মেলি তোলে তলোয়ার খান
জয় কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!

তবে হ্যাঁ, এ তাণ্ডব প্রেততাণ্ডব বটে। সেখানে গঙ্গারাম ভুল করে নি। ওঃ, অসহ্য! মাধবানন্দ অধীর হয়ে বলেছিলেন, কেশবানন্দ, নৌকা খোল, এগিয়ে চল, এ শুনতে আমি আর পারছি না।

ওরা তখন গাইছিল, বামুন পালাচ্ছে, স্বর্ণবণিক পালাচ্ছে, গন্ধবণিক কামার কুমার বৈদ্য কায়স্থ, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী পালাচ্ছে। বর্গী আসছে—

ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলোয়ারের ধ্বনি—
তলোয়ার ফেলাইঞা তারা পলায় এমনি।
সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল—
বরগির নাম শুইনা সব পালাইল।
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে।
দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে।
গাছতলাতে কান্দে নারী কোলেতে সন্তান—
রাখো, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান!
এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে—
আচম্বিতে বরগী ঘেরিল আইসা সাথে—
কারু হাত কাটে কারু কাটে নাক কান—
একই চোটে কারু বা বধএ পরাণ।
মোহিনী রমণী বাছি ধইরা লইয়া যাএ—
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।
একজনে ছাড়ে আর অন্যজনা ধরে।
রমণের ভয়ে তারা ত্রাহি শব্দ ছাড়ে।

আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দিছে পাষাণ—
রাখো কিষ্টো কালী শিবো ভগবান ॥

নৌকা খোলো—নৌকা খোলো—এই মুহূর্তে। উন্মত্তের মত চিৎকার করে উঠেছিলেন মাধবানন্দ।

কেন্দুলীতে এসে কয়োকে দেখে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। কয়োর হাত পা কাটা যায় নি বটে, কিন্তু তার হাত পা ভেঙে সে পঙ্গু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে ঘোর উন্মাদ। শুধু চিৎকার করে, মোহিনী, মোহিনী, মোহিনী! মো—হি—নী!

মোহিনী হারিয়ে গেছে। সেই রাত্রে। সেই ভয়ঙ্কর বর্ষণমুখর রাত্রে মাধবানন্দ যে তাকে বলেছিলেন, সাক্ষাৎ পাপ। তোমার মুখদর্শনও পাপ। কাল ভোর হতে হতে তুমি চলে যাবে, আর যেন তোমার মুখদর্শন করতে আমাকে না হয়!

সেই কথা শুনে, সেই রাত্রেই সে সেই দুর্যোগের রাত্রে বর্ষণোল্লাসিত শাল-অরণ্যের মধ্যে কোথায় সন্ধানহারা হয়ে হারিয়ে গেছে।

কয়ো সেই দিন থেকেই ডেকে ডেকে ফিরছে। অবশেষে গাছে বাসা বেঁধে গাছের মাথায় বসে দিগ্‌দিগন্তের দিকে চেয়ে তার সন্ধান করেছে আর ডেকেছে—মো-হি-নী!

এর পর গিয়েছিলেন শেরিনা বিবির কবর দেখতে। হিন্দু মুসলমান সকলে মিলে কবরে প্রণাম করে সন্ধ্যার প্রদীপ সাজিয়ে দেয়; হিন্দুরা সিঁদুর দেয়—তাদেরও প্রেম যেন এমনি গভীর হয়। এমনিভাবে যেন তারাও মরতে পারে।

মাধবানন্দের চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা নেমে এসেছিল সেদিন সন্ধ্যায়। কেঁদেছিলেন সারা রাত্রি সারা দিন।

সেই দিন সেই মুহূর্ত থেকে এই বিচিত্র ব্যাধির সূত্রপাত। স্তব্ধ হয়ে ছিলেন ক্রমান্বয়ে সাত দিন। বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত বসে ছিলেন। চৈতন্য যেন কোন্ দূরলোকে আকাশের গায়ে সুতোকাটা ঘুড়ির মত

কাঁপতে কাঁপতে নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে—হারিয়ে যাচ্ছে। অসীম অনন্তের মধ্যে নিরালম্ব, নিরাশ্রয়, দিক নাই, দিগন্ত নাই; মাটির বুকে নামার উপায় নাই; বন্ধন নাই; পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের স্নেহ থেকেও যেন বঞ্চিত হয়েছেন তিনি।

* * *

সাত দিন পর সেবার সুস্থ হয়েছিলেন। পৃথিবীর বুকে নেমেছিলেন বজ্রের বেগে। কাটা ঘুড়ি অকস্মাৎ ইন্দ্রদেবতার বজ্র হয়ে নেমেছিল মাটির বুকের এক উদ্ধত পাপপরায়ণের উপর—ধর্মের বিচারে অভিশপ্ত জনের মাথায়।

ফেরার পথে মুরশিদাবাদের পরেই বালুচরের সামনে গঙ্গার ঘাটে একখানা ছোট প্রমোদ-তরণী বাঁধা ছিল, তরঙ্গদোলায় অলসবিলাসে যেন দুলছিল। ছাদের উপর বসে ছিল এক বিলাসী শেঠের ছেলে; সন্ধ্যা তখনও হয় নি, দিনের আলো ম্লান হলেও সমস্ত স্পষ্ট দেখা যায়। সেই স্পষ্ট আলোকে পবিত্র গঙ্গার বুকে সে এক নটীকে কোলে নিয়ে তার মুখ চুম্বন করছিল। বার বার। মিথুনলীলায় মগ্ন পশু এবং পশুনারীর মতই লজ্জা সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন।

বিষণ্ণ বিমর্ষ মাধবানন্দ মুহূর্তে বজ্রের মত জ্বলে উঠেছিলেন। পর-মুহূর্তেই আকস্মিক বিপদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা ফিরিঙ্গীদের তৈরী বন্দুক একটা হাতে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলেছিলেন—খাড়া কর নৌকা। অলঙ্ঘনীয় সে কণ্ঠস্বর এবং আদেশ। নৌকার গতি স্থির হতেই বন্দুক গর্জে উঠেছিল বজ্রের মত। হতভাগ্য শেঠ যুবক পড়ে গিয়েছিল, নটীটার কী হয়েছিল কে জানে! নৌকার সমস্ত দাঁড়গুলি তখন একসঙ্গে পড়তে আরম্ভ করেছে।

আরও বারো বৎসর এই ধারায় চলছে। ক্রমশ বাড়ছে। সাত দিন থেকে দশ দিন পনের দিন, ক্রমে এখন তিন মাস পর্যন্ত ওই অবস্থায় মুহ্যমান হয়ে থাকেন মাধবানন্দ। প্রয়াগে এবার পূর্ণকুম্ভ। পূর্ণকুম্ভস্নানের জন্য যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। এক সপ্তাহের মধ্যেই দেবী-পক্ষের ত্রয়োদশী তিথি, বুধবার। দিনটি চিরকালই প্রশস্ত, শুভ। এবার আরও কয়েকটি বিশেষ যোগাযোগে পুণ্য এবং কল্যাণকর হয়ে উঠেছে; ওই তারিখেই যাত্রার কথা, কিন্তু অকস্মাৎ আজ তিন দিন মাধবানন্দ এই বিচিত্র বিষণ্ণতায় স্তিমিত স্তব্ধ

হয়ে গেছেন। প্রথম দু দিন কেশবানন্দ কিছু বলেন নি। আজ কথাটা নিবেদন না করে পারলেন না।

—তা হলে যাত্রার আয়োজন এখন স্থগিত থাক্।

যাত্রার আয়োজন স্থগিত থাকবে? প্রয়াগযাত্রার আয়োজন? চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। গভীর মগ্নতার মধ্যে ডুবে-যাওয়া মনও সকল শক্তি এক করে সজাগ হয়ে উঠল। যাত্রা স্থগিত থাকবে?

পূর্ণকুম্ভ বারো বৎসর পর আবার আসবে। নবগ্রহ, দ্বাদশ রাশি, তিথি বার সৃষ্টিচক্রের অপরিবর্তিত নিয়মে বারো বৎসর পর পর এই সমাবেশে আসবে; রবিবারে পূর্ণিমা-তিথিতে সূর্য বৃহস্পতি মকররাশিস্থ হবে। গঙ্গা-পুষ্করযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এবার মহাযোগ। স্নানযোগের সঙ্গে মহাদর্শনযোগ যুক্ত হয়েছে।

যে-যে গ্রহ রাশি নক্ষত্র তিথি বার সমাবেশে কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ হয়েছিল, সে সমাবেশ তারপর আবারও এসেছে, এর পর আবারও আসবে, সেই যোগে কুরুক্ষেত্রতীর্থ দর্শনে স্নানে স্নায়ীর কোটী জন্মের পাপমোক্ষণও হবে; কিন্তু যে-বৎসর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল, সে-বৎসর সেই যোগে সমস্ত পৃথিবীর পাপ মোক্ষণ হয়েছিল। সে যোগ মহাযোগ, এক-সঙ্গে স্নানযোগ ও দর্শনযোগ। রক্তাক্ত কুরুক্ষেত্র, রথ রথী গজ অশ্বের শব-সমাকীর্ণ কুরুক্ষেত্র, বিগতশক্তি নিঃশেষিততেজ সিদ্ধ মহাস্ত্র-আকীর্ণ কুরুক্ষেত্র; কুরুকুল এবং পাণ্ডবকুলের পুরনারীদের অশ্রু-অভিষিক্ত কুরুক্ষেত্র; পাঞ্চজন্য-মহাশঙ্খধ্বনি এবং গীতার মহাসঙ্গীতের রেশঝঙ্কৃত কুরুক্ষেত্র সেই বৎসরই কালের সঙ্গে চলে গেছে আর আসে নি। এ বৎসর যে সেই মহাযোগ। সমগ্র আর্যাবর্ত জুড়ে মহাধ্বংসলীলার শেষ পর্ব এখনও আসে নি, কিন্তু অর্ধেক শেষ। সম্মুখে আসছে অপরার্ধ। শেষ পর্বে তাঁরা উঠবেন; তার আগে অর্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের মহাকালের রুদ্ররূপ দর্শন না করলে দিব্যজ্ঞান মহাশক্তি আসবে কী করে? রক্তস্রোতে তুফান উঠুক, অন্তরাত্মা হুঙ্কার দিয়ে উঠুন। বিষণ্ণ সন্ন্যাসীর চিত্তলোকে মহাভারতের শঙ্খ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল হিন্দুস্থানের বর্তমান চিত্র।

বাংলা দেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত এই বিরাট ক্ষেত্রে এই ষোল বছরে যে

যুদ্ধ চলেছে, তার কথা কুরুক্ষেত্র থেকে কম কি বেশী তিনি বুঝতে পারছেন না। মনে হচ্ছে যেন বেশী। কলির কুরুক্ষেত্র। বাংলা দেশে সরফরাজের ধ্বংস হল ঘিরিয়ার প্রান্তরে। এই তো কয়েক ক্রোশ দূরে। সুতির নালা থেকে চড়কা বালিঘাটা পর্যন্ত দু পক্ষের কামান বসাবার জায়গাগুলো পর্যন্ত চিহ্নিত করা রয়েছে। আলিবর্দী ওগুলো পাকা করে কায়েমি করতে চেয়েছিল। ভবিষ্যতে যুদ্ধ হবে এ কথা সে জানত। কিন্তু জানত না যে, ঘিরিয়ায় হবে না, হবে মারাঠাদের সঙ্গে বাংলা-বিহার জুড়ে নানান স্থানে। মারাঠারা বাংলা দেশকে বার বার চারবার জ্বালিয়ে লুঠে মেরে কেটে নারীধর্ষণ করে ছারখার করে দিয়ে উত্তর-ভারতের দিকে মুখ ফেরালে। আলিবর্দী ভেবেছিল—বাস্, নিশ্চিন্ত, এইবার আর-একটা যুদ্ধ হলেই শেষ। দ্বৈপায়ন হ্রদের দুর্যোধনের মত হৃতসর্বস্ব দিল্লীর বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে, অথবা ভগ্ন-উরু দুর্যোধনের শেষ সেনাপতি অশ্বত্থামার মত অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে একটা লড়াই হলেই শেষ। তারই জন্য সে ঘিরিয়া এবং আরও উত্তরে রাজমহলের ওপারে উধুয়ানালায় ঘাঁটি তৈরি করেছিল। ভাবে নি তার বংশ ধ্বংস হবে মুরশিদাবাদের উত্তরে নয়—দক্ষিণে, পলাশীর আমবাগানে। তিন মাসও পূর্ণ হয় নি এখনও, পলাশীতে উচ্ছৃঙ্খল অস্থিরচিত্ত নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা শেষ হয়েছে। আলিবর্দী বিশ্বাস-ঘাতকতা করে সরফরাজকে ধ্বংস করে নবাব হয়েছিল। মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে ফিরিঙ্গী ইংরেজের মুঠোখানেক পল্টনের হাতে সিরাজউদ্দৌল্লার পরাজয় ঘটিয়ে ফিরিঙ্গীকে ঘুষ দিয়ে নবাব হয়েছে। এই তো বর্ষার সময় শ্রাবণ মাসে হতভাগ্য মীরজাফরও যাবে। ওদিকে সারা উত্তর-হিন্দুস্থান শ্মশান, দিল্লীর অবস্থা দ্বৈপায়ন হ্রদের দুর্যোধনের মত।

নাদিরশাহী মহা দুর্যোগের পর আবদালশাহী দুর্যোগ। নাদিরশা মরেছে—মরেছে তার তুর্কী-মনসবদারের হাতে। গভীর রাত্রে তুর্কীরা তার তাঁবুতে ঢুকে, একসঙ্গে তেরোজন মনসবদার তেরোটা তলোয়ার দিয়ে কোপ মেরেছিল। নাদিরের আফগান মুল্লুকে শাহ হয়ে বসেছে আহমদ-শাহ আবদালী। দুটো কান কাটা, নাকে কুষ্ঠরোগের বিকৃতি, তেমনি নিষ্ঠুর কুটিলপ্রকৃতি আহমদশাহ আবদালী। এর মধ্যে চার-চারবার সে

হিন্দুস্থান ঢুকেছে মহামারীর মত, আশ্বিনী ঝড়ের মত, বৈশাখী অগ্নিদাহের মত সমস্ত দেশকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে গেছে। গতবার সে এসেছিল মথুরা বৃন্দাবন গোকুল পর্যন্ত। গোটা হিন্দুস্থান শ্মশান। সাত দিন ধরে মথুরা তাদের দেওয়া আগুনে পুড়েছে। মথুরার রাজপথ গলিপথ কাটা মুণ্ডু আর লাসে ছয়লাপ। মাটি কাদা হয়েছে রক্তে। যমুনার জলে শুধু মড়া—মড়া আর মড়া। কুয়োগুলো জেনানার লাসে ভর্তি। দেবমূর্তি ভেঙে রাস্তায় তারা গেণ্ডুয়া খেলেছে। হাজারে হাজারে—দশ বিশ ত্রিশ হাজার যুবতী মেয়ে আর জোয়ান ধরে ঘোড়ার লেজের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। কাবুল কান্দাহারে পথে হাটে হাটে গাই-বকরি-ভেড়ীর মত এক এক মুঠো দামড়ির দামে বেচে গিয়েছে। পথের দু ধারে থালা কাঁসা তামার ভাঙা বাসন ছড়িয়ে পড়ে আছে—কুড়িয়ে নেবার লোক নেই। আবদালী নিজে নিয়ে গেছে বাদশাহ ঘরের শাহজাদী। মহম্মদ শাহের বেটী—বাদশাহী রঙমহলের ফুটন্ত গোলাপ—তার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নাকে দিয়ে ভোগ করবার জন্য টেনে ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে। আরও নিয়ে গেছে আয়ফতউন্নিসাকে। হায় রে নসীবের খেল, আয়ফতউন্নিসা—ঔরংজীব বাদশার সাক্ষাৎ প্রপৌত্রী, দেওয়ার বক্সের বেটী। তার বেটা তাইমুর নিয়ে গেছে দুসরা আলমগীর বাদশার বেটী গৌহরউন্নিসাকে। দিল্লী-হারামের আরও ষোল-ষোলটি বহু বা বেটীকে নিয়ে গেছে। দিল্লীর আমীরদের বাড়ির সুন্দরী বহু বেটী লুঠে নিয়ে গেছে আবদালীর পাঠান মনসবদারেরা। দিল্লী থেকে কাবুল পর্যন্ত পথের ধারে পড়ে আছে কঙ্কাল, আর আছে ভাঙা বাসন কোসন। আরও আছে, তা খুঁজতে হয়—মাটির সঙ্গে মিশে আছে লবণাক্তস্বাদ, চোখের পানির, আর স্বাদ আছে রক্তের।

গোটা হিন্দুস্থানের মধ্যে দু জায়গা ছাড়া কোথাও তলোয়ার ওঠে নি। ব্রজমণ্ডলে চৌমুহায় জাঠেরা লড়েছে ব্রজনাথের জন্য। হিন্দুপাদ-পাদশাহীর নামে মিথ্যে গৈরিক ধ্বজা বয়ে বেড়ায় আর লুঠতরাজ অত্যাচার করে বেড়ায় যে মারাঠা সে মারাঠা হঠে গিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, আর আট হাজার জাঠ চাষী এসে রুখল আফগানের পথ। জাঠদের দেহ মাড়িয়ে তবে ঢুকতে

হবে ব্রজমণ্ডলের রাজধানী। ওদিক থেকে এল বিশ হাজার আফগান আর রোহিলা সিপাহী। সঙ্গে কামান শিভল বন্দুক—বন্দুক। সকালবেলা থেকে পুরা ন ঘড়ি বিশ্রামহীন লড়াই। বন্দুক-কামানের শব্দ, তার সঙ্গে চিৎকার, বারুদের ধোঁয়ার সঙ্গে রক্তের গন্ধ। ন ঘড়ির পর শবাকীর্ণ চৌমুহার প্রান্তর থেকে হাজার কয়েক জাঠ ফিরল মাথা হেঁট করে। আফগান ঢুকল ক্ষিপ্ত নেকড়ের মত। বারো হাজার মুর্দায় আচ্ছন্ন তখন চৌমুহার প্রান্তরে জাঠ পাঁচ হাজার, আফগান সাত হাজার। আফগানী সওয়ারের ঘোড়া হুঁচোট খেলে মুর্দার উপর।

ওই চৌমুহার প্রান্তরের মাটিতে প্রণাম করতে হবে, রক্তের গন্ধ স্বাদ থাকতে থাকতে ওই মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হবে।

আর মহাপুণ্যতীরথ—গোকুল।

গোকুলে আবদালী পল্টন হঠেছে—হেরেছে। হঠেছে, হেরেছে সন্ন্যাসীর কাছে। রাজা নয়, সেনাপতি নয়, পল্টন নয়, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। দেহে বর্ম নাই, চড়বার জন্য ঘোড়া নাই; আফগান আসছে শুনে ভস্মমাখা কৌপীনসার পাঁচ হাজার বীর সন্ন্যাসী তলোয়ার তীর ধনুক—কিছু বন্দুক আর চিমটা ত্রিশূল নিয়ে দাঁড়াল। নাকাড়া বাজল, শিঙা বাজল, ধ্বনি উঠল : গোকুলনাথ-কি—! পাঁচ হাজার গলায় আওয়াজ উঠল—জয়।

তারপর এক ভীষণ সংঘাত। দুটো পাহাড় যেন জীবন্ত হয়ে উঠে মহা আক্রোশে পরস্পরের দিকে ছুটে গিয়ে পরস্পরকে আঘাত করল।

পড়ল আড়াই হাজার গোস্বামী, ওদিকে আড়াই হাজারের বেশী আফগান। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে গেল আফগান; মরণোল্লাসের এমন হুঙ্কার তারা শোনে নি; সমুদ্রের ঢেউয়ের পাহাড়ের উপর আছড়ে-পড়ার মত এমন আছড়ে-পড়ে লড়াই দেওয়া কাজাকস্তান, খোরাসান, আফগানেস্তান—বহু স্থানে তারা লড়েছে; কিন্তু কোথাও দেখে নি।

আবদালী নিজে ফিরিয়ে নিয়েছে ফৌজ, ছোড় দো। চালায় থাকে, পরনে কৌপীন, গায়ে ছাই, ওদের কাছে কী থাকবে, ওরা বাউরার দল, ওদের ছেড়ে দিয়ে ঘোরো, সব ঘোরো। পল্টনে মহামারী লেগেছে তখন। কৃতকর্মের ফল, যমুনার জলে হাজার হাজার লাস তখন পচে উঠে জল বিষাক্ত

করে তুলেছে। তার পশ্চাতে আছে দেবরোষ। হার স্বীকার করেই আফগান গোকুল থেকে ফিরে গেছে। জয় গোকুলনাথকি— ! বৈষ্ণব সন্ন্যাসী মরেছে, কিন্তু গোকুলনাথ সেই আত্মোৎসর্গে হাসছেন। তিনি জেগেছেন। তিনি জেগেছেন। অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তির প্রসাদ পেতে হবে। গোকুলনাথকে প্রণাম করে ওই হাসি দেখে আসতে হবে। ওই গোস্বামীদের যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে জেনে আসতে হবে, শেষ লগনের দেরি কত? তার আগে কী নির্দেশ? অজ্ঞাতবাসের মত আত্মগোপনের কালের আর কত বাকি! 'তামাম হিন্দুস্থানের সন্ন্যাসী এক হো যাও'—এ ফতোয়া জারি হবে কবে?

লগন আ গয়া—লগন আ গয়া—নিদ মগন রহনা নহি হ্যায়।

তিনি নিজেই রচনা করে দিয়েছেন আশ্রমের সেবকদের জন্য। যাত্রা স্থগিত রাখলে তো চলবে না।

—জয় কংসারি! জয় গোকুলনাথ! না কেশবানন্দ, যাত্রা স্থগিত থাকবে না। এই অবস্থাতেই আমাকে নিয়ে চল। দেহান্তই যদি ঘটে, তবে গোকুলে সৎকার করো আমার। ওই দেবীপক্ষের ত্রয়োদশীর দিনই যাত্রা স্থির। ওর আর অস্থির হবে না।

দূরে গ্রামে-গ্রামান্তরে বোধনের ঢাক বাজছে। অকালে মহাশক্তির আবাহন। দশভুজার পূজা। সন্ধ্যার প্রাক্কাল। বাঁকা এক ফালি চাঁদ গাঢ় নীল আকাশের পশ্চিম দিগন্ত ঘেঁষে গলা রূপার দীপ্তিতে দীপ্যমান, তার অনতিদূরেই শুক্রাচার্য মণিখণ্ডের মত ঝলমল। যেন মহাকালের ললাটপট দেখলেন মাধবানন্দ।

অবসাদ কেটে যাবে। চল। চল।

হরি-হর! হরি-হর! হরি-হর! কংসারি আর রুদ্র।

আবেগময় গম্ভীর কণ্ঠস্বরের ডাক গঙ্গার দুই তীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসছিল। হরি-হর! হরি-হর! ক্লান্তি হোক অবসাদ হোক, যা হোক—দূরে যাক। নূতন সিদ্ধি চাই না, যদি তা না-আসে।

সম্মুখে যেন মনোলোকের পথের মধ্যখানে একটা রুদ্ধ সিংহদ্বার গতিরোধ করে দাঁড়ায় মাধবানন্দের। তখন আশপাশ চারিদিকে তাকিয়ে অনুভব করেন, এক পাও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হন নি। একটা দিক্‌ভ্রান্তির মধ্যে ওই রুদ্ধ সিংহদ্বারের এক পাশেই একটা চক্রাকার পথে পাক খেয়েছেন এতদিন। দুয়ার খোলে না। আঘাত করতে গেলে ওই দ্বারের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না; মনে হয় শুধু গাঢ়তম অন্ধকার দিয়ে গড়া, কোন বস্তুময় লজ্জাই নেই; আঘাত করতে গেলে আঘাত কিছুকে স্পর্শ করে না, অন্ধকারের ভয় উপেক্ষা করে পা বাড়াতে গেলে তাও যায় না, যেখানে কোন-কিছুই নেই সেখানে পদস্থাপন করবেন কোথায়? শূন্যে পা বাড়ালে মানুষ পড়ে; পড়বার জন্যও স্থানের প্রয়োজন; এ যে স্থানই নেই। আলোহীন বায়ুহীন এমন কি ব্যোমসত্তাহীন নাস্তিত্ব শুধু। ভয়ে? না এ তো ভয় নয়। আর-কিছু। শূন্যতার মত একটা কিছু তাঁকে মুহূর্তে গ্রাস করে নেয়। কিছু নাই; কেউ নাই; নিজেও হারিয়ে যাচ্ছেন, ধরতে কিছু নেই, ধরবার কেউ নেই।

সব হারাচ্ছে, নিজে হারাচ্ছেন, শুধু বেদনা হারাচ্ছে না। নিজেকে মুহূর্তে মুহূর্তে অনুভব করবার একমাত্র উপায় নিজের বুকটা চাপড়ানো। আলো তো নেই যে নিজের ছায়া দেখেও নিজের অস্তিত্ব অনুভব করবেন। পিছনের দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা খুঁজতে যান, দেখতে পান, পিছনটা তৃণহীন পুষ্পহীন প্রান্তরের মত খাঁ-খাঁ করছে। সেখানেও কেউ নেই। তাঁর এই চলে-আসা পথের দিকে কোন দুটি চোখ তাকিয়ে নেই। ফেলে-আসা কোন ঘরের চিহ্ন নেই, নিজের হাতে পোঁতা গাছ নেই, কোন নিশানা নেই কোথাও। নিজের ঝুলি খোঁজেন, সেখানে শুধু মুঠো মুঠো ছাই; যে যা জীবনে তাঁকে দিয়েছে তিনি যে তার সবই পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছেন—সেই ছাই। সব মিথ্যা। সব মিথ্যা হয়ে গেছে। কিছুই পান নি তিনি। মনে শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই; সারা দেহে ক্লান্তি, উদরে ক্ষুধা, কণ্ঠে তৃষ্ণা, জীবনে এক বিচিত্র অশ্বস্তি—যেন জ্বালা। সব মিথ্যা। কোথায় সে চৈতন্যময়? তার বস্তুময় দেহকে নিংড়ে তার সকল হবিকে নিঃশেষিত করে চৈতন্যের প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন, সে প্রদীপ-

শিখা নাস্তিত্বের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। কোথায় জ্যোতির্লোক? কোথায় প্রাণময় উষ্ণমণ্ডল? তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন পিছনে ফেরবার জন্য। কিন্তু তা তো পারেন না। পঙ্গুর মত অসাড় হয়ে পড়ে থাকেন। সে অনুভূতি-অনুভবও নাস্তিত্বের মত। ব্যক্ত করতে যেন পারা যায় না। বার বার তাই পুনরাবৃত্তি করে নিজেই যেন বুঝতে চেষ্টা করেন।

তারপর একদিন বাস্তবে ফেরেন। কখনও দুরন্ত ক্রোধে ফেরেন, কখনও দৈহিক আঘাত পেয়ে ফেরেন; কখনও গান শুনে ফেরেন। কখনও কখনও ফেরবার জন্য নিজের দেহে নিজে অস্ত্র দিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেন, কিন্তু তাতে ফল হয় না। আবার আকস্মিক ভাবে কোন পাথরে হোঁচট খেয়ে অল্প আঘাতেই সচেতনতায় ফিরে আসেন। কয়েক দিনের মধ্যেই মোহ কাটিয়ে প্রবলতর উদ্যমে কর্মে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। উৎসব জুড়ে দেন।

অহরহই বলেন, আনন্দ্ রহো। আনন্দ্ রহো।

বন্দুক নিয়ে চাঁদমারি করেন। সমস্ত অস্ত্র বের করিয়ে নিজের সামনে সাফ করান। শিষ্যদের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েন। কুস্তির আখড়ায় মাটি মাখেন। তারপর গঙ্গার জলে স্নান করতে নেমে সাঁতার কেটে চলে যান গঙ্গার মাঝখানে। তারপর একদিন কেশবানন্দকে ডেকে বলেন, তলব এসেছে কেশবানন্দ। এর অর্থ কেশবানন্দ জানেন। কংসারির খাজনাখানায় খাজনা বাকি পড়েছে।

স্বপ্নাদেশে মাধবানন্দ কংসারির ভাণ্ডারে এক খাস তহবিল খুলেছেন। বৎসরে সেখানে সোনায় রূপায় নগদে বিশ হাজার টাকা জমা দিতে হয়। সেই টাকা জমেই আসছে। কুরুক্ষেত্রের আয়োজন ছাড়া এ তহবিল থেকে খরচ হয় না। ফরাসী, ইংরেজ, ওলন্দাজ কুঠির যে সব কর্মচারী নিজেরা গোপন ব্যবসা করে, তাদের মারফত বন্দুক বারুদ কেনা হয়। দালালি করে আরমানী বানিয়ারা। ওদিকে পাটনায়, এদিকে চন্দন-নগর হুগলীতে মাধবানন্দের গৃহী শিষ্যেরা কিনে পাঠায়। হুগলী কলকাতা অঞ্চলের বৈষ্ণব বণিকদের, বাংলার রুকুনপুর মালদহ রঙপুর জেমো বাঘডাঙার জমিদার থেকে বিহারের পালোয়ান সিং স্বেতাব রায়, এমন কি রাজা রামনারায়ণ রায় প্রভৃতি বিশিষ্টদের ঘরেও মাধবানন্দের পরিচয়

এবং প্রভাব পৌঁছেছে। তারা ভক্তি করে। সাহায্য করে। বিশেষ করে পূর্ণিয়ার শক্তিশালী রাজকর্মচারী অচল সিং। শুধু ধর্মজীবনেই নয়, কর্মজীবনেও সম্পর্ক আছে পরস্পরের মধ্যে। উত্তর-ভারতে অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে রাজেন্দর গিরি মহারাজ যেমন নবাব সাহেবের সকল অভিযানে ডান হাত, পাশে থেকে যেমন যুদ্ধ করেন, ততখানি ঘনিষ্ঠভাবে না-হলেও অনেকটা সেই ভাবেই মাধবানন্দজী এঁদের দু-তিনজনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী জায়গীরদার এবং জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে মাধবানন্দ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অস্ত্রধারণও করে থাকেন। এর জন্য যে টাকা প্রণামী পান, তাই জমা হয় কংসারির খাজাঞ্চিখানায়। বৎসরান্তে হিসাবে এই জমার পরিমাণ বিশ হাজারের কম হলে সে টাকা পূরণ করতে হয় এবং পূরণ হয় ব্যবসায়ী বা জমিদার বা জোতদারদের কাছ থেকে। এর জন্য এক পৃথক সেরেস্তা আছে কংসারির কাছারিতে। এই এলাকার জমিদার জোতদার এবং বানিয়াদের অন্যায় জবরদস্তির খতিয়ান থাকে। সেই খতিয়ান দেখে তাদের উপর জরিমানা হয়। এবং একদিন সশিষ্য বেরিয়ে পড়েন এই জরিমানা আদায়ের জন্য।

'হরি-হর' 'হরি-হর' ধ্বনি ওঠে। ধ্বজা ওড়ে, পতাকা ওড়ে, ঘোড়া বয়েল গাড়ি সাজসরঞ্জাম নিয়ে বের হন। দণ্ডিত জমিদার জায়গীরদারের এলাকায় গিয়ে বসেন। সাধারণ প্রজা গৃহস্থদের বাদ দিয়ে তহশীল কাছারি অধিকার করে তহবিল বাজেয়াপ্ত করেন। সাধারণ লোককে দিতে হয় সিধা—চাল-আটা-ঘি-সবজী-দুধ। যেখানে যে-কদিন তাঁবু পড়ে সে-কদিন গ্রামের সমস্ত ঘরে অরন্ধন; ভাণ্ডারা খুলে দেন মাধবানন্দজী। মধ্যে মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ হলে জরিমানার পরিমাণ বাড়ে। মাধবানন্দ আজও কোন ঠাঁই থেকে ব্যর্থ হয়ে ফেরেন নি। ফিরে এসে মাধবানন্দ লুটিয়ে পড়েন কংসারি এবং রুদ্রের সম্মুখে।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥

জয় হৃষীকেশ! আনন্দ রাখো। আনন্দ রাখো।

কেশবানন্দকে ডেকে বলেন, খুলে দাও ভাণ্ডারা। ভাণ্ডারা খোলা হয়।

ঢেঁড়া পড়ে—ভাণ্ডারা! কংসারির প্রসাদ নেবে এস। অবারিত দ্বার। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে গ্রামবাসীরা ছুটে আসে। পরিতৃপ্তি করে খেয়ে তারা ধ্বনি দেয়, জয় হরি-হর! জয় কংসারি! জয় গুরু মহারাজ!

—আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! আনন্দ রহো! বলে হাত তুলে মাধবানন্দ গ্রহণমুক্ত সূর্যের মত প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন। এই বারো বছর এমনি ভাবে জীবনে চলেছে গ্রহণ এবং গ্রহণমুক্তি। আবার লাগে গ্রহণ।

* * *

নৌকায় ছইয়ের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন মাধবানন্দ। হাতে একখানা ছুরি। বুকে একটা সদ্য ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেদনায় যন্ত্রণায় অনেক সময় এই অবস্থায় কাটে, তাই নিজের হাতেই ক্ষতটার সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তবুও জাগ্রত চৈতন্য ফিরছে না। সব যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা, জীবন মিথ্যা, তপস্যা মিথ্যা, সিদ্ধি মিথ্যা—সব মিথ্যা। নাস্তিত্বের মধ্যে সব বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই আঘাতের যন্ত্রণাতেও মন জাগ্রত হচ্ছে না। অতি কষ্টে চোখ ফেলছেন, সে চোখ আবার বন্ধ হয়ে আসছে। ছেলেবেলায় এক সাপের ওঝার কাছে এই পদ্ধতি শিখেছিলেন। তাকে গোখুরায় কামড়েছিল। সে নিজেই নিজের চিকিৎসা করেছিল। দেখেছিলেন সামনে একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের কড়াই রেখে কতকগুলো আধখানা-করা কেলেকোঁড়া ফল শিকে বিঁধিয়ে তেল মাখিয়ে ওই আগুনে গরম করে তাই দিয়ে বুকে ছ্যাঁকা নিচ্ছিল। বিষের আচ্ছন্নতায় চেতনা নিবে-আসা প্রদীপের মত স্তিমিত হয়ে আসতে আসতে আবার যেন জ্বলে উঠছে। ওই ছ্যাঁকার যন্ত্রণায় চমকে উঠে আবার কিছুক্ষণের জন্য বিষের প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করছে। সে বেঁচে ছিল এতে। মাধবানন্দও তাই করেন। ফলও পান কিছু। কিন্তু এবার যেন এ বিষের প্রভাবে মৃত্যুর গাঢ়তা। যন্ত্রণাও তার মনকে চেতনাকে চকিত করতে পারছে না। অন্তর চিৎকার করছে, এ গ্রহণ থেকে মুক্তি দাও। নয়, মৃত্যু দাও।

নৌকা চলেছে, আশ্বিনশেষের ভরা গঙ্গা। দু পাশের তীরভূমি বর্ষান্তে মহালক্ষ্মীর সস্নেহ অঞ্চলের মত পুষ্পে ফলে পল্লবে পত্রে সমৃদ্ধ; বর্ণ তার কিছু স্বর্ণবর্ণ, বাকীটা ঘন সবুজ। আশু ধান্যের ক্ষেতগুলি সোনার বরন

পাকা ফসলে ভরা; হৈমন্তী ধানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে দিগন্ত পর্যন্ত গাঢ় সবুজ ধানের শীষগুলি সদ্য সদ্য বের হচ্ছে; ওরই উপর দিয়ে বয়ে আসছে বাতাস, ধানগুলি তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মত দোলা খাচ্ছে; বাতাসের সর্বাঙ্গে ধানের শীষে শীষে যে শ্বেতকণিকার মত ধান্যপুষ্প তারই গন্ধ; বাসমতী, গোবিন্দ-ভোগ, কনকচুর, খুদিখাসা প্রভৃতি সুগন্ধি ধানের চাষ যেখানে, সেখানে বাতাস যেন নারায়ণ-মন্দিরে অর্ঘ্যবাহিনী লক্ষ্মীর অর্ঘ্যথালিকা-বাহিকা সহচরীর মত মধুর পবিত্র। তটে তটে দিয়ারাভূমি জাগতে শুরু করেছে। গঙ্গার জল শুভ্র, এখনও স্বচ্ছ হয় নি। বহর চলেছে কখনও পাল তুলে, কখনও গুণ টেনে। উজানে যাত্রা। কোন নৌকায় সেবকেরা ভজন গাইছে। কোন নৌকায় শাস্ত্রপাঠ হচ্ছে। কোন নৌকায় দেবতার পূজা-ভোগের আয়োজন চলছে। একটি নৌকায় কেশবানন্দ শ্যামানন্দ প্রভৃতি প্রধানেরা আলোচনা করছেন। মাধবানন্দের নৌকায় মাধবানন্দ বসে আছেন স্তব্ধ হয়ে; তাঁর সেবার জন্য দুজন সেবক বাইরে বসে আছে। দীর্ঘ ধ্বজ-দণ্ডে ধ্বজা উড়ছে; ধ্বজদণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পর্যবেক্ষক।

গঙ্গায় এই সময় থেকেই নৌকার ভিড় বেশী। বর্ষার প্রবল স্রোত বন্যা ঝড় প্রভৃতির কাল চলে গেল। এইবার ভীমাভয়ঙ্করী হবেন বরদা প্রসন্নময়ী। প্রচীনযুগে এই সময়েই নদীপথে রাজারা বের হতেন দিগ্বিজয়ে, আজ দিগ্বিজয়ের দিন নেই কিন্তু বণিকেরা আজ বের হয় বাণিজ্যে; পুণ্য-কামীরা বের হয় তীর্থদর্শনে। এই সময় থেকেই শুরু হয় মেলার। এই তো শোনপুর হরিহরছত্রে রাস-পূর্ণিমায় মেলার আরম্ভ, মেলা শেষ আষাঢ়ে রথযাত্রায় নীলাচলে। কিন্তু এবার গঙ্গার বুকে নৌকার ভিড় নেই। ঘাটগুলি ফাঁকা। স্থানীয় এ-ঘাট ও-ঘাট, এপার-ওপার যাওয়ার নৌকা ছাড়া লম্বাপাড়ির নৌকা বড় দেখা যায় না। লম্বাপাড়ির নৌকার একটা আলাদা গড়ন আছে, যাওয়ার ভঙ্গির মধ্যেও বিশেষ ঢঙ আছে। লম্বা-পাড়ির নৌকার মধ্যে দু-তিন দফায় ইংরেজ ফিরিঙ্গীদের নৌকা এবং এক দফা নবাবী নৌকার ছোট বহর ছাড়া আর কোনও বহর দেখা যায় নি।

পলাশীর যুদ্ধের পর এখনও চার মাস পুরো পার হয় নি। পলাশীর

পাপের জেরই এখনও মেটে নি। মীরন এখনও অবাধে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। নানান স্থানে নানান আয়োজনের গুজব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। উৎকণ্ঠায় মীরজাফর আফিংয়ের মাত্রা চড়িয়েছে। খাস মুরশিদাবাদ শহরে রাজা দুর্লভরাম নাকি হিন্দু আমীরদের নিয়ে জোট পাকাচ্ছে। আলিবর্দী-বেগম সিরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র বালক মির্জা মেহেদীকে খাড়া করে মসনদ দখলের চেষ্টায় আছেন। ঢাকায় এক দল নবাব সরফরাজের দ্বিতীয় পুত্র আমানী খাঁকে নবাব করবার জল্পনা-কল্পনা করছে। পাটনায় রাজা রামনারায়ণ রায় আজও মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি। ফরাসী জাঁদরেল মসিয়ে ল' বাংলায় আসতে আসতে পলাশীর খবর পেয়ে পথ থেকে ফিরে গিয়ে অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ক্লাইভের হুকুমে গোরা সিপাই আর তেলেঙ্গী পল্টন আজ এখানে কাল ওখানে ছুটোছুটি করছে। পূর্ণিয়ার অচল সিং নবাবী প্রভুত্ব অস্বীকার করে মাথা চাড়া দেবার আয়োজন করছে। গোটা দেশটায় যেন থমথমে ভাব। কেউ ঘর থেকে বের হতে সাহস পাচ্ছে না। গঙ্গাই শুধু তার আপন গতিতে চিরকালের ধারায় যেমন চলেন তেমনি চলেছেন। কিন্তু কল-কল্লোলে কি সেই একই কথা? না, অন্য কথা বলছেন? মাধবানন্দের মনে হচ্ছে, সেই একই কথা বলছেন। কথাই নয়, অর্থহীন ধ্বনি শুধু গতিশীল জলস্রোতের শব্দ। ভাবতে ভাবতে হাঁপিয়ে ওঠেন তিনি। ধ্বনিময়ী গতিময়ী গঙ্গাও যেন ওই অন্ধকার নাস্তিত্বের মধ্যে মিশে যাচ্ছেন। অর্থহীন—সব অর্থহীন।

অকস্মাৎ নৌকার গতি মন্থর হল। বাইরে কেশবানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত বিশ্রামের জন্য পূর্বনির্দিষ্ট কোন ঘাট এসেছে—কোন গঞ্জ। এখানে একদিন বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু হবে। এখানে মঠের শিষ্য সেবক ভক্ত আছে। তারা আসবে, প্রণামী দেবে। প্রণাম করবে। কিন্তু কোন্ ঘাট? রাজমহল, শকরিগলিঘাট পার হয়ে এসেছে নৌকা। তারপর বিশ্রামের কথা সুলতানগঞ্জে। গৈবীনাথ দর্শন করে মুঙ্গেরে গিয়ে বিশ্রাম। তা হলে সুলতানগঞ্জ এল?

ঠিক এই মুহূর্তেই শিঙা বেজে উঠল।

শিঙাধ্বনিতে সংকেত জানানো হচ্ছে, নৌকার গতি সংযত কর। হুঁশিয়ার, রোখ্‌না হ্যায়। রোখ্‌না হ্যায়! না, তা হলে রাজমহল নয়। কোন নৌকাতে কোন একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ সংকেত তীরে ভিড়াবার নয়; এ সংকেত দুর্ঘটনার জন্য নৌকাগুলিকে হুঁশিয়ারের সঙ্গে গতিরোধ করবার সংকেত। দুর্ঘটনা! কী দুর্ঘটনা? হয়তো কেউ জলে পড়েছে। হয়তো কোন নৌকা বিপন্ন হয়েছে। হলেই হল। অর্থহীন ধ্বংস সৃষ্টির নিয়ম। একটু বিষণ্ণ হাসি তাঁর মুখে দেখা দিল। কিন্তু সে হাসি পর-মুহূর্তেই বিলুপ্ত হয়ে গেল, নৌকাখানা অকস্মাৎ দুলে উঠল—কেউ বা কিছু লাফ দিয়ে যেন পড়ল নৌকার উপর। অসতর্ক মাধবানন্দ নৌকার ছইয়ের গায়ে আছড়ে পড়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আকস্মিক আঘাতে তিনি বিরক্তি এবং ক্রোধে চিৎকার করে উঠলেন, আঃ!

—কে মূর্খ? কৌন্ মূরখ্? বলে উদ্যত ক্রোধে উঠে দাঁড়ালেন।

সেই মুহূর্তেই বাইরে উদ্ধত ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কে বলে উঠল, রোখো নায়। কাঁহা হ্যায় উ বেইমান কাফের ফকির?

মুহূর্তে মাধবানন্দের ক্রুদ্ধ অন্তরাত্মা ঊর্ধ্ব আকাশে উদাস পরিক্রমায় সঞ্চরমাণ চিলের পাখা গুটিয়ে পৃথিবীর বুকে এক মুহূর্তে নেমে পড়ার মত ছোঁ দিয়ে নেমে এল। তিনি তুলে নিলেন পাশে-রাখা তরোয়ালখানা। দরজার মুখে সেই ক্ষণটিতেই দেখা দিল এক দীর্ঘকায় পাঠান। সেই মুহূর্তেই আবার নৌকাখানা দুলে উঠল, আবার কেউ লাফিয়ে পড়েছে নৌকার উপর। সেই দোলায় দরজার মুখে পা হড়কে পাঠান পড়ে গেল। মাধবানন্দ ফিরেছেন, দুরন্ত ক্রোধে দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি সুযোগ উপেক্ষা করলেন না। লাফ দিয়ে তার বুকের উপর পড়ে তরোয়ালের অগ্রভাগ সজোরে বিদ্ধ করে দিলেন। বাইরে বন্দুক গর্জে উঠল। কেউ একজন পড়ল নৌকার পাটাতনের উপর। মাধবানন্দ বসে পড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, পাশেই একখানা ছিপ। ছিপ থেকে নবাবী কোতোয়ালী জমাদার চৌকিদার নৌকায় উঠবার চেষ্টা করছে। কিছু দূরে আরও দুখানা ছিপ। এপাশে তাঁর নৌকার বহরের দুখানার উপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে সন্ন্যাসীর দল, হাতে বন্দুক

তাঁর ধনুক সড়কি। নেতৃত্ব করছেন কেশবানন্দ। পাটাতনের উপর গুলি খেয়ে পড়েছে তাঁরই একজন সেবক। মাধবানন্দ জ্বলে উঠলেন বৈশাখের আগুনের মত। ছিপে নবাবী সিপাহীদের একজন বন্দুক গাদছে, একজন তুলছে; মুহূর্তে তিনি চিৎকার করে তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পাশের ছিপটায়। হরি-হর! হরি-হর! লগন আ গয়া।

হ্যাঁ, লগ্ন এবার সত্যই এসেছে। নবাবী শক্তির সঙ্গে এই প্রথম সংঘর্ষ। সামনের জমাদারটার মাথার উপর পড়ল তাঁর উদ্যত তরবারি। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা নিষ্ঠুর আঘাত অনুভব করলেন। বন্দুকের গুলি! আঃ! সেই নাস্তিত্ব, মানসলোক-দর্শন-করা সেই বিচিত্র সত্তা আজ বাস্তবে দিবালোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়ে আসছে। এক কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠনাবৃতা রহস্যময়ী—তাকে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু নিদারুণ হতাশার আতঙ্কের মত ঝাপসা,—তার আঁচল দিয়ে সব কিছু মুছে দিচ্ছে। দ্যুলোক ভূলোক দুলছে, উল্টে যাচ্ছে।

টলে তিনি জলে পড়ে গেলেন। বন্দুকের শব্দ উঠল, বহুদূরের যুদ্ধক্ষেত্রের শব্দের মত।

গঙ্গার জলস্রোতের মধ্যে সেই রহস্যময়ী যেন কায়া গ্রহণ করছে—বর্ণহীন গন্ধহীন শব্দহীন গতিহীন নাস্তিত্ব। স্পর্শও নেই। গঙ্গার জলের শীতলতাও নেই; স্পর্শাতীত হয়ে বিলুপ্তিতে মিশিয়ে যাচ্ছে।

*　　　*　　　*

না, তারপরও তো রয়েছে। অমৃতলোক।

কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ উঠছে। তাঁকে ঘিরে মৃদু প্রসন্ন প্রদীপের আলো এবং মধুর ধূপগন্ধ। তারই সঙ্গে ললাটে একটি স্নিগ্ধ কোমল শীতল স্পর্শও অনুভব করলেন। মাথার শিয়রের দিকে চেয়ে তিনি শিউরে উঠলেন, ঠিক তাঁর কল্পনার মত একটি মূর্তি। কালো-কাপড়-পরা একটি মূর্তি তাঁর মুখের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু সে মুখ ঘন এলোচুলের রাশিতে ঢাকা। কালো চুলের ডগাগুলি তাঁর কপালের উপর ঝুলছে, যেন স্পর্শও করছে। এ কি সেই?

এ সবই যেন স্বল্প কয়টি মুহূর্তের জন্য। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার

সেই নাস্তিত্ব তাঁকে চারিদিক থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে চৈতন্যমণ্ডলের কেন্দ্র-বিন্দুতে এসে নিরন্ধ্র হয়ে মিলিত হল।

নীলাম্বরী-পরা রূপসী একটি মাধবানন্দের শিয়রে বসে ছিল। সে-ই ঝুঁকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল একাগ্র দৃষ্টিতে। বারেকের জন্য মাধবানন্দের চোখ-মেলে-চাওয়া তার একাগ্র দৃষ্টি এড়ায় নি। মাধবানন্দ আবার চোখ বুজতেই সে ধীরে ধীরে মাধবানন্দের হাতখানি টেনে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করলে। তারপর হাতখানি সন্তর্পণে নামিয়ে রেখে পাশের ত্রিপদী থেকে খলনুড়ি ওষুধ নিয়ে মধু দিয়ে মেড়ে আঙুল দিয়ে জিভে লাগিয়ে দিলে। তারপর কয়েক ঝিনুক দুধ ফোঁটা ফোঁটা করে খাইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এতক্ষণে যেন মেয়েটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হল। বসে ছিল, মুখের উপর চুলের ছায়া পড়েছিল তাই আকারে অবয়বে অনবগুণ্ঠিত মুখের মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা যেন অর্ধ-অপ্রকাশিত ছিল।

মেয়েটি অপরূপা। কিশোরী অথবা যুবতী বুঝা যায় না। কৈশোর-যৌবনের সঙ্গমে স্নান করে উঠেছে যেন; এ মেয়ে সেই মেয়ে, যারা চির-কিশোরী চিরযুবতী একাধারে দুই। মুখে আশ্চর্য একটি দ্যুতি! সুকোমল সারল্যের মাধুর্য, বর্ষাসন্ধ্যায় অর্ধবিকশিত জুঁইফুলে-ভরা জুঁইলতার মত শুভ্র নিষ্কলুষতায় প্রসন্ন এবং পবিত্র।

মেয়েটি উঠে লঘুপদক্ষেপে ঘরের বাইরে এল। বাইরে বসে ছিল মাধবানন্দেরই সেবক প্রৌঢ় গোকুলানন্দ। তাকে বললে, এখন তুমি গিয়ে বোস। ভাল আছেন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। অঘোরে ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবেন। সে চলে গেল। গোকুলানন্দ শিয়রে গিয়ে বসল।

মাধবানন্দ আহত হয়ে জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। উত্তর-ভারতে যমুনার তটভূমির এক গ্রামে তার জন্ম; তাদের বংশগত পেশা নৌকা চালনা। আগ্রার উত্তরে গাঁওঘাটে খেয়া নৌকা চালাত। গাঁওঘাট বিখ্যাত খেয়াঘাট।

বাদশা মহম্মদ শার সিপাহীরা তার বাপকে খুড়োকে কেটেছিল। মহম্মদ শা তখন বাদশা নয়, তখন ছিল শাজাদা রৌশন আখতার, আসছিল

বাদশা হতে। দিল্লী থেকে বজরা নিয়ে আসছিল ফতেপুরসিক্রী। পুরনো বাদশাকে সৈয়দ উজীর আর তার ভাই খুন করে তার লাশ গায়েব করে রেখেছে। নতুন বাদশা তক্তে বসিয়ে তবে ঢেঁড়া দেবে, পুরনো বাদশার ইন্তেকাল হয়েছে। তর সইছে না। বাদশাহী বজরার সামনে পড়েছিল তার বাপের নৌকা। পথ ছাড়তে দেরি হয়েছিল। বাদশাহী কালাপোশ সিপাহী গুলি চালিয়ে নৌকো ডুবিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, তার বাপ এবং খুড়ো ভেসে উঠে সাঁতার দিতে শুরু করলে তাদেরও গুলি করে মেরেছিল। সে নৌকোতে গোকুলানন্দও ছিল; সে তখন বিশ বছরের নওজোয়ান। তার দম ছিল বহুত। ছেলেবেলা থেকে যমুনায় গাঁওঘাট থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত যেখানে কেউ একটা দামড়ি ফেলেছে জলে, সেইখানে ডুব মেরে সে দামড়ি তুলে এনেছে। সে ডুব-সাঁতার কেটে অনেক দূর গিয়ে উঠেছিল এক গাঁয়ে। সেখান থেকে কয়েক দিন পর ঘরে ফিরে আর ঘর পায় নি। শুধু ঘর নয়, মা বহিন তার সদ্য-সাদী-করা বহু কাউকে পায় নি। সেই থেকে সে বেরিয়েছে পথে। খুঁজতে বেরিয়েছিল সকল খেয়ামাঝির সেরা সর্দার মাঝিকে, যে সারা দুনিয়ার বাদশা থেকে ফকির—তামাম লোককে এপার থেকে ওপারে পার করে।

কত জনকে গুরু ধরে কত মঠ ঘুরে শেষে এসেছিল মাধবানন্দের আশ্রয়ে। মাধবানন্দের সাধনা, তাঁর সিদ্ধি, তাঁর শক্তি দেখে সে নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছে—সে পাবে, যাকে খুঁজছে তাকে সে পাবে। শুধু তাই নয়, গরিবের উপর অত্যাচার, আমীর-ওমরাদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে মাধবানন্দের লড়াই দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল, একদিন-না-একদিন যে কালাপোশ দুজন গুলি ছুঁড়ে তার বাপ-খুড়োকে মেরেছে তাদের এবং যে বাদশার জন্য তার বাপ খুড়ো নৌকো ঘর বাড়ি মা বহিন বহু সব গিয়েছে তারও সঙ্গে একদিন মুখোমুখী দাঁড়াতে পারবে। সেই দিন-দুনিয়ার খেয়ামাঝির বাদশাহের দরবারে সে দিন সে ফরিয়াদ করবে। গুরু তার উকিল। সে সেই গুরুকে পড়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর অচেতন দেহখানা নিয়ে জলের তলেই উজানের বদলে ভাটির টানের সঙ্গে সাঁতারের টান মিলিয়ে বন্দুকের এলাকার বাইরে গিয়ে ভেসে উঠে

কিনারায় পৌঁছেছে। তারপর কংসারির দয়া, গুরু মহারাজের অসীম পুণ্য-বল, সেই ঘাটেই সন্ধ্যায় স্নান করতে এসেছিলেন এই ভক্তিমতী বাঁশরী-ওয়ালী প্যারেবাঈ। লোকে বলে, বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ বাঁশরী বাজায় আর বৈকুণ্ঠধামে নন্দলালা আকুল হয়ে ওঠেন। নেমে আসতে হয় তাঁকে।

আরও খবর মিলেছে। প্যারেবাঈ সব খবর যোগাড় করেছে। মঠের নৌকাগুলোর তিন-চারখানা ডুবেছে। বাকী সব ভেসে চলে গেছে ভাটিতে। নবাবী ছিপ একখানা ফিরেছে, বাকী কখানা খতম। সন্ন্যাসীরা নবাবী ছিপ হটিয়ে কিনারায় উঠে নৌকো ছেড়ে দিয়ে পয়দলে পাহাড়-জঙ্গলের পথে লুকিয়ে পড়েছে। তারা কোন্ মুখে কোন্ পথে চলেছে তার খবর ঠিক মেলে নি, কিন্তু তারা গঙ্গার কিনারা ধরে হাঁটছে না এটা বিলকুল ঠিক। কেশবানন্দজী বেয়কুক নন। সামনে মুঙ্গের পর্যন্ত এবং পিছনে রাজমহল পর্যন্ত প্রত্যেক নবাবী থানা-ঘাঁটি হুঁশিয়ারী নজর রেখেছে গঙ্গার বুকের উপর এবং গঙ্গার দুই পারের পথঘাটের উপর। কংসারির সেবকদের পাকড়াও করবার হুকুম জারি হয়েছে। আশ্রম ছেড়ে যাত্রা করে উজান ঠেলে এই পর্যন্ত আসতে যে সময় লেগেছে তারই মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। খবর তাঁরা পান নি। পূর্ণিয়ায় অচল সিং গুরু মহারাজের ভক্ত শিষ্য। তিন-চার দফায় অচল সিংয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে গুরু মহারাজ পূর্ণিয়ার আশপাশের জায়গীরদার জমিদারদের 'পাপ করমে'র জন্য জরিমানা আদায় করে ভগবানের খাজাঞ্চীখানায় খাজনা দাখিল করেছেন। এই খবর চাপা নেই। কিন্তু তখন নবাবী দরবারে খাজনা দাখিল করলেই সব মিটে গেছে। এবার অচল সিং গুরুর হুকুম অমান্য করে 'হঠকরা'র কাজ করে নিজে ডুবেছে গুরুকে গুজবে ডুবিয়েছে। মীরজাফরের বিরুদ্ধে চারিদিকে নানান গুজব। অসন্তোষ সারা বাংলা জুড়ে। সব থেকে অসহ্য হয়েছে নূতন নবাবজাদা মীরনের অত্যাচার। অচল সিং গুরুর আদেশ অমান্য করে হাজির আলি মনসবদারকে নিয়ে পূর্ণিয়ার নতুন ফৌজদার মীরজাফরের দলের লোক মোহন সিংয়ের বেটা সোহন সিংকে হটিয়ে ফৌজদার হয়ে বসে ফতোয়া

জারি করেছে—খাজনা দেবে সে তাকেই, যে বাদশাহের কাছে সুবেদারী ফরমান পাবে। আলিবর্দী-বেগম বালক মির্জা মেহেদীর জন্য ফরমানের চেষ্টা করছেন—এ গুজব চারিদিকে ছড়িয়েছে। ওদিকে পাটনায় রাজা রামনারায়ণের হাবভাব ভাল নয়। অযোধ্যার নবাব নাকি আসছে মসিয়ে ল'কে নিয়ে বিহার দখল করতে। মীরজাফর আর থাকতে পারেন নি। এসে হাজির হয়েছেন রাজমহলে। ওদিকে মীরন বাচ্চা-ছেলে মীর্জা মেহেদীকে খুন করেছে। কেউ বলছে, সিরাজ-নবাবের মা আমেনা বেগমকে নৌকা সমেত জলে ডুবিয়েছে। ক্লাইভ আসছে কলকাতা থেকে। মীরজাফরের সঙ্গে যাবে বেহার। রাজমহলে নবাব মীরজাফর তার পেয়ারের লোক খাদেম হোসেনকে পূর্ণিয়ার ফৌজদারি দিয়ে অচল সিংয়ের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছে। রাজমহল থেকে শকরিগলিঘাটে পৌঁছে খাদেম হোসেন পাকড়াও করে অচল সিংয়ের এক লোককে। এই লোককে অচল সিং পাঠিয়েছিল গুরু মহারাজের কাছে। সে অনুনয় করেছিল গুরুকে। এ সময় কুম্ভে না গিয়ে তার এই লড়াইয়ে যোগ দেবার জন্য আরজি করেছিল। দুর্ভাগ্য অচল সিংয়ের, এবং শিষ্যের দুর্ভাগ্যে গুরুর দুর্ভাগ্য। লোক পথে অসুস্থ হয়ে দেরি করেছে, মাধবানন্দ শকরিগলি আসবার সময় বরাবর পৌঁছতে পারে নি। মঠের নৌকা শকরিগলি ছাড়বার চার দিন পর এসে পৌঁছেছে। চিঠি পড়েছে খাদেম হোসেনের হাতে। খাদেম হোসেন সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছিল ছিপ। খাদেম হোসেনের হুকুম ছিল বরাবর মুঙ্গের যাবার। সেখানে কেল্লা থেকে লোক লস্কর পল্টন নিয়ে চারিপাশে ঘিরে এই হিন্দু ফকিরদের গ্রেপ্তার করে নবাবজাদা মীরনের কাছে পাঠাবে। না পার, তামাম ফকিরকে গুলি করে মেরে রাস্তার গাছে লটকে রাখবে। কিন্তু দারোগা বাহাদুরি আর ইনাম পাবার লোভে পথের মধ্যে নিরস্ত্র সন্ন্যাসী দেখে আক্রমণ করবার লোভ সামলাতে পারে নি।

রক্ষা করেছেন দিনদুনিয়ার মালিক, সকল রাজার রাজা, সব বাদশাহের বাদশাহ ভগবান কংসারি আর গুরু মহারাজের তপস্যা। ব্রজনাথ, নন্দলাল, কিষণলালার সাক্ষাৎ সেবিকার মত এই বাঁশরীওয়ালী প্যারে গোসাঁইন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হাজির ছিল গুরু গোসাঁইয়ের জন্য। গোকুলানন্দ

জানে, বাঁশরীওয়ালী মুখে স্বীকার করুক আর নাই করুক, এর জন্য ইশারা সে পেয়েছিল, সে সাক্ষাতেই হোক আর স্বপ্নেই হোক।

মান্দারে মধুসূদন। সেই মান্দার পাহাড়ে বাঁশরীওয়ালী প্যারের রাধা-গোবিন্দজীর মঠ।

পৌষ-সংক্রান্তিতে মান্দারে মধুসূদনজীর বাৎসরিক পর্ব। সামনে রাস-পূর্ণিমায় রাধাগোবিন্দজীর রাসযাত্রা। সে সব রেখে এবার সে বের হয়েছিল তীর্থ-পরিক্রমায়; রাসপূর্ণিমায় শোনপুর গণ্ডক গঙ্গা আর শোনসঙ্গমে স্নান করে হরিহরনাথের উপর জল চড়াবে, ভজন শোনাবে, তারপর যাবে পূর্ণকুম্ভে প্রয়াগধাম। সেখানে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গমে স্নান করে সেই জল নিয়ে যাবে বৃন্দাবন গোকুল। তার তপস্যার ষোল বছর পূর্ণ হয়েছে এবার। সেই জন্য চলেছিল সে ভাগলপুর হয়ে সড়ক ধরে সুলতান-গঞ্জ। সেখানে স্নান সেরে মুঙ্গেরে গিয়ে নৌকা নেবার কথা। পথে সন্ধ্যার মুখে রাত্রের জন্য ডেরা ফেলে বাঁশরীওয়ালী এসেছিল গঙ্গার ঘাটে সাঁঝের স্নান করতে। গোকুলানন্দ গুরুর অচেতন দেহ নিয়ে ঘাটের কাছেই একটা গাছের বেরিয়ে-পড়া শিকড় ধরে হাঁপাচ্ছিল। দাঁড়াবার ক্ষমতাও ছিল না। বাঁশরীওয়ালী সেই ক্ষণটিতে ডুব দিয়ে উঠেছিল ঠিক গঙ্গা থেকে ওঠা কোন দেবতার মত। গোকুলানন্দ চিৎকার করে উঠেছিল, বাঁচাও, মাতাজী, বাঁচাও।

বাঁশরীওয়ালীর লোকজন ছিল ঘাটের উপরেই। বাঁশরীওয়ালীর ডাকে তারা ছুটে এসে তুলেছিল তাদের দুজনকে। আঃ, বাঁশরীওয়ালী সাক্ষাৎ দেবী। ঘাটের উপর গুরু মহারাজের অচেতন দেহ দেখে সে কী করুণা! ধীরে ধীরে দেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে তার সে কী নিঃশব্দ রোদন!

* * *

"জয় রাধারাণী! জয় রাধারাণী! শ্যামপিয়ারী, তোমার হুকুম আর বাঁশরীওয়ালীর নসীব!"

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে গুরু মহারাজের অবস্থা নিজে পরখ করে দেখেছিল বাঁশরীওয়ালী, অনেক ওষুধ জানে, নাড়ী দেখতে জানে। নিজে দেখে ওই

গাঁয়ের কাছের একজন কবিরাজকে ডেকে দেখিয়ে বলেছিল, ফেরো, মুঙ্গের না, চল মান্দার।

সঙ্গের লোকজন বিস্মিত হয়েছিল, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ বাঁশরীওয়ালীর ছিল না। হুকুম রাধারাণীর আর নসীব বাঁশরীওয়ালীর আর গুরু মহারাজের প্রাক্তন—গোকুলানন্দ ভেবে দেখেছে, এ যেন 'তিরবেণী'র টান। লোকের বুঝবার ক্ষমতা নেই; আর না বুঝে তাদের বিস্ময় হলেই বা কার কী যায়-আসে, দুনিয়ারও আসে-যায় না, বাঁশরীওয়ালীর তো নয়ই। এবং বাঁশরীওয়ালীর যা ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কেন, কী জন্য—এ নিয়ে তকরার বাঁশরী-ওয়ালীর লোকজনের মধ্যে নাই।

বাঁশরীওয়ালী কাঁদে, বাঁশরীওয়ালী বংশী বাজায় রাধা-গোবিন্দজীর সামনে, বাঁশরীওয়ালী ভজন গায়, বাঁশরীওয়ালী নাচে; বাঁশরীওয়ালী ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়; বাঁশরীওয়ালী এক-একদিন ভিখ মাগতে বের হয়, কোনদিন বাঁশরী-ওয়ালী মনোহর সজ্জায় সাজে, সে সজ্জা খুলে বিলকুল বিলিয়ে দেয়; কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না। জিজ্ঞাসা করলে ছোট্ট এতটুকু একটু হাসি, জোনাকির আলোর মতই জ্বলে উঠে নিবে যায়। ওতেই জবাব হয়ে যায়। জবাব মানে তো মনের অস্বস্তি অখুশী ভাব, তা ওতেই মন খুশী হয়ে যায়, সব খুঁতখুঁতি মিটে যায়। বাঁশরীওয়ালীর সব হয় রাধাগোবিনজীর ইশারায়। ও জিজ্ঞাসা করতে নেই; ও বলতে নেই; শুনতে নেই।

সেই রাত্রেই বাঁশরীওয়ালীর কথামত গুরুকে ডুলিতে চাপিয়ে পনের কোশ পথ এসে এই মঠে এসেছে। আজ আট দিন। আট দিন গুরু মহারাজ বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। পূজার সময় ছাড়া সব সময় মাথার শিয়রে বসে আছে বাঁশরীওয়ালী। শহর থেকে বড় কবিরাজ এসেছিল। তার কাছ থেকে সব বুঝে নিয়েছে বাঁশরীওয়ালী নিজে।

আজ বাঁশরীওয়ালী বলে গেল, চোখ মেলে চেয়েছেন, শোর হয়েছিল গুরু মহারাজের। বাঁশরীওয়ালী আরতির জন্য গেল। আরতির পর বাঁশরীওয়ালীর ভজন। সারা গাঁয়ের লোক বসবে। বাঁশরীওয়ালী বংশী বাজাবে, ভজন গাইবে, নাচবে রাধারাণী-কিষণলাল মহারাজের সামনে।

ওই তো বংশী বাজছে। কাঁদছে, মুরলী কাঁদছে। চোখে জল আসছে গোকুলানন্দের। বাংলা দেশে সে এ সুর অনেক শুনেছে। কীর্তন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাধবানন্দ।

গোকুলানন্দ সন্তর্পণে একটু ঝুঁকে তাঁর মুখের দিকে তাকালে। না, জাগেন নি। ঘুমের ঘোরেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন। বেহুঁশের মধ্যেও একটা হুঁশ থাকে, সেই হুঁশের কুঠরির ভিতর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে এই বংশীর সুর।

শেষ-কার্তিকের হিমেল রাত্রি, ঠাণ্ডা আসছে জানলা দিয়ে। সুরও আসছে ওই পথে। গোকুলানন্দ উঠে গেল জানলাটা বন্ধ করবার জন্য। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বলে দিয়েছে বাঁশরীওয়ালী, কবিরাজও বলে গেছে—এই অবস্থায় ঠাণ্ডাকে সাবধান। সর্দি হলে বহুত মুশকিল হবে; বুকে সর্দি বসবে, কাশি হবে, জ্বর আসবে। হুঁশিয়ার!

জানলা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

বাঁশরী বন্ধ হয়ে সারেঙ্গী বাজছে, মন্দিরা বাজছে ঠিনি-ঠিনি; এইবার ভজন গাইবে বাঁশরীওয়ালী প্যারে। বাইরে চাঁদনী ঝলমল করছে। সামনে কদিন পরে রাধারাণী আর ব্রজবালাদের নিয়ে কানাহিয়ালালের রাস-দরবার বসবে; মলমলের ফরাস বিছানো হচ্ছে, মসলিনের ঝালর ঝুলাচ্ছে, নীলমণি দিয়ে মোড়া দরবারের ছাদটাকে দুধ দিয়ে মাজাঘষা হচ্ছে, চন্দ্রকান্তমণির বাতির ডোমটাকে মুছে সাফা করছে, আর একদিকের আঙুল-দুই জায়গায় কালি পড়ে আছে, ওইটুকু মোছা হলেই—বাস্, সুগোল হয়ে একটা জ্বলন্ত নিটোল মুক্তার মত টলমলে হয়ে উঠবে। শীত আসছে; কোকিল-পাপিয়াগুলোর গলায় সর্দি জমবে; এই রাস-দরবারে তারা গীত গেয়ে গোটা শীতের মত গান বন্ধ করবে; সেই রাস-দরবারের গানের মহড়া দিচ্ছে। একটা কোকিল হঠাৎ কু-কু-কু করে ডেকে উঠল।

নাচত নাগররাজ
ঝমর ঝমর ঝম; ঝমর ঝমর ঝম;
রাসরস-রাঙ্গিয়া, পীতপট সাজ।
সুন্দর শ্যাম, সখিগণ মাঝ।

আ! হায়! হায়! ভজন শুরু করে দিয়েছে বাঁশরীওয়ালী! এইবার কিছুক্ষণ পরে ঘুঙুর বাজবে, ঝুম-ঝুম-ঝুম। ঝুম ঝুম ঝুম! ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু; ঝুম্ ঝুম।

জানলাটি বন্ধ করতে গিয়েও বন্ধ করা হল না গোকুলানন্দের; আবেশ লাগছে তার; দাঁড়িয়ে সে শুনতেই লাগল—

ঝুমুর ঝুমুর ঝমু নাচত নাগরী—
মুচকি মুচকি মধু হাস—
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কিনি-কিনি কন-কন
গাওত সঙ্গীত আধ আধ ভাষ।

'ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝুম। ঝুমু ঝুমু ঝুমু, ঝুমু, ঝুম। ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু।' বেজেই চলেছে ঘুঙুর। বেজেই চলেছে।

একটা আবেশে যেন জ্যোৎস্নালোক নিথর স্পন্দনহীন। আনন্দে পৃথিবী যেন হারিয়ে যাচ্ছে। গোকুলানন্দও আবিষ্ট হয়ে গেছে। সে ভুলে গেল জানলা বন্ধ করতে, ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, চলল ওই শব্দ লক্ষ্য করে।

গান থেমে গেল, ঘুঙুর নীরব হল, তবু তার মোহ ভাঙল না। এসে দাঁড়াল রাধাগোবিনজীর মন্দিরের আঙিনায়। লোকেরা চলে যাচ্ছে। বাঁশরীওয়ালী আহিরিণীর পোশাকে সেজে নাচছিল, সে যেন মূছিত হয়ে পড়ে আছে বিগ্রহের সামনে, দুটি হাত তার বিগ্রহের দিকে প্রসারিত। কিন্তু মূছিত তো নয়। সে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

অকস্মাৎ মাধবানন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কেশবানন্দ! শ্যামানন্দ!

চমক ভাঙল গোকুলানন্দের। সে ছুটল : গুরু মহারাজ!

মাধবানন্দ জেগেছেন। চেতনা ফিরেছে। বাঁশরীওয়ালী প্যারে যে ঘুমের ওষুধ দিয়ে বলেছিল—অঘোরে ঘুমোবেন, সে ওষুধ তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে নি। হয়তো তার ভুল হয়েছিল। কঠোর ব্রহ্মচর্য এবং গভীর চিন্তা ও যোগের পথের সাধক মাধবানন্দের যে চৈতন্য আঘাতের প্রচণ্ডতায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল, আঘাতের প্রচণ্ডতার প্রতিক্রিয়ার কাল পার হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে সে জাগতে শুরু করেছে যখন, তখন সাধারণ মানুষকে যে ওষুধ যতখানি এবং যতক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে বা রাখতে পারে, তাঁকে তা পারে নি। অন্তরের মধ্যে সেই আঘাতের ক্ষণের উৎকণ্ঠাও চৈতন্যের সঙ্গে সঙ্গে জেগেছে। এবং তাঁকে উৎকুণ্ঠিত করেই জাগিয়ে তুলেছে। তিনি ডেকে উঠেছেন, কেশবানন্দ! শ্যামানন্দ!

তারপর তাকিয়ে দেখছেন চারিদিকের পারিপার্শ্বিক। বাস্তব জগতে ফেরবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। অপরিচিত পারিপার্শ্বিক। এ তিনি কোথায়? জাগ্রতোন্মুখ চৈতন্যলোকে ঝঙ্কৃত অপরূপ সঙ্গীতধ্বনির রেশ যেন মনের মধ্যে বেজে চলেছে। ক্ষীণ অস্পষ্ট হলেও মনে পড়ছে, শিয়রে সেই এক রহস্যময়ীর মুখ। জীবনের সেই প্রশ্ন যা চিত্তলোকে অনুভব করছেন, তারই যেন সে প্রত্যক্ষ শরীরী রূপ। তার সঙ্গে এই স্বল্পদীপালোকিত, জনহীন, পরিচ্ছন্ন, অনূর্ধ্ব ঘরখানির সম্পর্ক ঠিক আবিষ্কার করতে পারছেন না। খাপরার চাল। মাটিতে নিকানো দেয়াল, বোধ হয় কাঁচা ইটের। তিনি হয়তো মৃত্যুর ওপারের রহস্যপুর থেকেই বিচিত্র ভাবে ফিরেছেন; এ গল্প তো অনেক শুনেছেন। এবং এখন তিনি মরজগতে ফিরেছেন এটা নিশ্চিত। কিন্তু এ তিনি কোথায়?

—গুরু মহারাজ!

হাত জোড় করে গোকুলানন্দ দাঁড়াল।

—গোকুলানন্দ?

—হাঁ পর্ভু, আপনা দাস সেবক।

—এ আমি কোথায় গোকুলানন্দ? কেশবানন্দেরাই বা কোথায়? আমি তো গুলি খেয়ে জলে পড়েছিলাম! লড়াইয়ের কী হল? নবাবী কালাপোশেরা এমন করে হামলাই বা করল কেন? আর—

চারিদিক আবার একবার তাকিয়ে দেখে মাধবানন্দ আবার প্রশ্ন করলেন, আমি কোথায়?

—বাঁচাইলেন বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ। ই আশ্রম উনকি। রাধা-গোবিনজীর মন্দিল। আশ্রম। ভগবানকে সাথ উনকি বাতচিত হয়। বাঁশরীওয়ালী প্যারে সাক্ষাৎ দেবী।

—বাঁশরীওয়ালী প্যারেবাঈ ?

—হাঁ, মহারাজ, বাঁশরীওয়ালী প্যারে। গোসাঁইন। বড়া ভারি মাতাজী।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন মাধবানন্দ। গোকুলানন্দ সব বিবরণ বলে গেল। তিনি শুনলেন। মনের মধ্যে নানান প্রশ্ন, নানান সিদ্ধান্ত, নানান বিশ্লেষণ এলোমেলো ভাবে আসছে যাচ্ছে। অচল সিং তাঁর উপদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ করলে। কেন? বার বার তিনি বলেছেন, এখন নয়, লগ্ন আসুক। সে লগ্ন রাজনৈতিক সুযোগ সময় নয়, সে লগ্ন দেবতার নির্দেশ। সমস্ত-কিছুর উপর মধ্যে মধ্যে ওই নাস্তিত্বের ছায়া পড়ে মিথ্যা মনে হয়, তবুও তো সবার একসঙ্গে সময় নির্ণয় করে একযোগে অভ্যুত্থানের একটা মূল্য আছে তবে? সন্দেহ তাঁর বরাবরই ছিল, আজ বোধ হয় নিঃসন্দেহ হলেন যে, এই জায়গীরদার জমিদার ফৌজদার—এরা ধর্মরাজ্য-হিন্দুধরমশাহী মুখেই চায়, আসলে চায় না। সব চায় নিজের নিজের সুযোগ। কেশবানন্দেরা কোথায় গেল? কী করলে? এরাও কি—? হাঁ, তিনি জানেন, তাঁর সে-জানা সন্দেহাতীত সত্য যে, তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব থেকে মুক্তি পেলে ওদের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে শুধু আক্রোশ, শুধু হিংসা; তার সঙ্গে লোভ, তার সঙ্গে কাম। ওঃ, গোপালানন্দের সে মূর্তি তাঁর মনে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত একটা সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, দুনিয়ার জীবনের সমুদ্রে যেন একটা তুফান জেগেছে; কালে কালে জাগে; দীর্ঘকাল ধরে দুনিয়ার সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, ভালবাসা-হিংসা—কিছু হারায় না, একতিলও না; সব জমা হয়, তারপর একদিন তুফান ওঠে। দিল্লীর তক্তাউস নিয়ে হানাহানির মধ্যে পাঠান আলাউদ্দিন বাদশার খুড়োকে খুন করার পাপ থেকে ঔরংজীব বাদশার সব ভাইকে খুন করার পাপ আছে। নাদিরশাহী, আবদালশাহী, বর্গী হাঙ্গামা সব এক তুফানের পরের পরের ঢেউ। গোকুলানন্দ, গোপালানন্দ, কেশবানন্দের কারও জীবনের আগুন নেবে নি। সব আজ বাতাসে ছাই উড়িয়ে জেগেছে। পাপ-পুণ্য ধরম-অধরম সব একাকার হয়ে গেছে। আজ কিছুর মানে নেই। সব ধ্বংস হয়ে যাবে। আর কোথায় পাপ, কোথায় পুণ্য? কী ধর্ম, কী অধর্ম? তাঁর সামনে সেই নাস্তিত্ব, সেই কিছুই-না যখন

এসে দাঁড়ায়, তিনি যখন নিজেই হারিয়ে যান, তখনকার কথা সামনে এসে দাঁড়াল।

জ্ঞাতুম্‌—ইচ্ছাই প্রশ্ন, সেই অদম্য ইচ্ছা ইচ্ছাই থেকে গেল, উত্তর তো মিলল না!

উত্তর নাই? প্রশ্ন জাগলে উত্তর খুঁজে বের করতে হয়, প্রশ্নের পথেই এগিয়ে চলতে হয়; কিন্তু পথ কোথায়? নাস্তিত্বের মধ্যে? বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্পর্শহীন, স্থানহীন, কালহীন নিরর্থকতা নাস্তিত্ব।

না। না। তিনি যেন তার আকার দেখেছেন। হাঁ, দেখেছেন। কালো আবরণে ঢাকা অবয়ব, কালো কিছুতে ঢাকা মুখ তাঁরই মুখের উপর ভাসছিল। হাঁ। তারপর যেন সঙ্গীত-ঝঙ্কার শুনেছেন। তা হলে কি তাঁর উত্তর দেবার জন্য এসে সে দাঁড়িয়ে ছিল, তাঁকে মূক দেখে হেসে ফিরে গেছে?

একটা কাতর আক্ষেপ সশব্দে তাঁর বুক যেন ফাটিয়ে বের হয়ে এল: আঃ!

গোকুলানন্দ সভয়ে দু পা পিছিয়ে এসে ডাকলে, গুরু মহারাজ!

বাইরে থেকে এসে ঢুকল আশ্রমের একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব। মাথার শিয়রে এসে ত্রিপদ থেকে ওষুধ নিয়ে খলে মেড়ে সামনে ধরে দেহাতী হিন্দীতে বললে, খেয়ে নিতে মহারাজের ইচ্ছা হোক। মহারাজের শরীর তো এখন বহুত দুর্বল। এখন ঘুম দরকার। খুদ্‌ বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী বলে দিলেন।

—বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী?

—হাঁ মহারাজ।

—কোথায় তিনি?

—তিনি মন্দিল মে।

—তাঁকে বলো আমি তাঁকে নমো-নারায়ণ জানিয়েছি। দর্শন চাই। এখনি একবার যদি—

—তিনি এখন দেবতাকে শয়ন দিচ্ছেন। রাধারাণী-গোবিনজীকে শয়ন দিয়ে চরণসেবা করবেন। এখন তো আসতে পারবেন না।

—শয়ন দিচ্ছেন ? চরণসেবা করছেন ?

একটু হাসি দেখা দিল তাঁর মুখে। বিগ্রহের শয়ন, চরণসেবা ? কংসারির মুখের দিকে চোখের দিকে চেয়ে কত বিনিদ্র রাত্রি তাঁর কেটে গেছে।

—ওষুধ পিয়েন গোসাঁইজী। খলটি সে এগিয়ে ধরলে।

খলটি হাতে নিয়ে মাধবানন্দ বললেন, অবসরমত একবার মেহেরবানি করে আসতে বলো গোসাঁইনকে। আমার কথা আছে।

—হাঁ। ই বাত আপনি বলবেন, ই তাঁর মালুম ছিল। বলিয়েছেন কী, কহনা—উনকে সামনা যানে কি প্যারেজী কি মানা হ্যায়।

—মানা হ্যায় ? কার মানা ?

—উ তো হামি জানে না। আপ শো যাইয়ে। নিদ যাইয়ে।

* * *

—কিসকে মানা ?

হাঁ, কার মানা ? বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী তো সকলের সামনেই মুখ খুলে বের হন, কথা বলেন, বিগ্রহের দরবারে হাজার হাজার লোকের সামনে ভজন গান করেন, নাচেন, তবে আমার সামনে মানা কেন ? আপনার ঠাকুরের ? রাধাগোবিনজীর ?

বাঁশরীওয়ালী প্যারেকেই মাধবানন্দ প্রশ্ন করলেন; অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে বাঁশরীওয়ালী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। পরনে ঘাগরা। কাঁচুলির উপর ঘন নীল রঙের ওড়নার দীর্ঘ অবগুণ্ঠন। বেশভূষার কাপড় মূল্যবান নয়, সাধারণ দেহাতী তাঁতের। কিন্তু রঙের প্রাচুর্যে ঝলমল করছে। যার মধ্যে দেহাতের রুচি সুস্পষ্ট।

এ ঘটনা আরও দশ দিন পরের। এই দশ দিনের মধ্যে মাধবানন্দ অনেকটা সেরে উঠেছেন। শরীরে বল পেয়েছেন—চলে যাবার কথা ভাবছেন। কিন্তু সংবাদ পেয়েছেন নবাবী ফৌজ চারিদিকে কংসারি মঠের সন্ন্যাসীদের খোঁজ করছে। কারণ কংসারি মঠের সন্ন্যাসীরা নৌকা ছেড়ে দিয়ে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে আজ এখান কাল সেখান করে ফিরছে, তাদের চেষ্টা তারা গঙ্গাজী পার হয়ে ওপারে পূর্ণিয়া-কিষণগঞ্জের দিকে গিয়ে অচল সিংহের ভাঙা দলের সঙ্গে মিলিত হবে। পথে ছোটখাটো লুঠতরাজ নিত্যই

ঘটছে। বিশেষ করে কয়েকটা সরকারী থানা লুঠ করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, নবাবের অনুগত কয়েকজন ছোট জমিদার বড় জোতদারের কাছারী বাড়ি লুঠ করেছে। গিধৌড় থেকে ত্রিকূট পর্যন্ত অঞ্চলে লুঠতরাজ করে সম্প্রতি তারা উত্তরমুখে ঘুরে বনের মধ্যে আত্মগোপন করেছে। কয়েকটা মুসলমান-গ্রাম হাতী দিয়ে সমভূমি করে দিয়েছে। গিধৌড়ের রাজা এবং একজন মুসলমান জমিদারের তিনটে হাতী তারা লুঠ করে নিয়েছে। এদিকে মুঙ্গের ওদিকে রাজমহল থেকে নবাবী ফৌজ তাদের পেছন নিয়ে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। তারাও পথে ঘাটে সন্ন্যাসীদের অকারণ গ্রেপ্তার করে জুলুমবাজি চালাচ্ছে। মঠগুলির উপর সতর্ক দৃষ্টি পড়েছে। ওদিকে ঘিরিয়ার কাছে তাঁদের মূল মঠ তল্লাশি করে নবাবী ফৌজ প্রায় দখল করে রেখেছে। এ সময় পথে বের হওয়ার বিপদ আছে। এবং বাঁশরীওয়ালীও বের হতে দেয় নি। কিন্তু এখানে ধরা পড়লে বাঁশরীওয়ালীর বিপদ আছে। সেই সূত্রেই আজ বাঁশরীওয়ালী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে নিজেকে আবৃত করে মাধবানন্দের সঙ্গে কথা বলতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দশ দিন ধরে বাঁশরীওয়ালীর অস্তিত্ব তার ব্যক্তিসত্তার আস্বাদ প্রতিমুহূর্তেই গ্রহণ করেছেন—তারই চিকিৎসা, তারই শুশ্রূষা, তারই সেবা, তারই হাতের পথ্য পেয়েছেন; তার কণ্ঠস্বর শুনেছেন, হাসি শুনেছেন, গান শুনেছেন, তার নাচের নূপুরধ্বনি শুনে গভীর রাত্রে হেসেছেন, সাধনার কত বিচিত্র ধারাই মানুষ বের করেছে! জীবনের অপব্যয়কে দানখাতে খরচ লিখলেই আত্মগ্লানি থেকে অব্যাহতি। কিন্তু না। তা ভেবেও নিজে গ্লানিবোধ করেছেন। ওই গানের মধ্যে নাচের মধ্যে একটা কিছু আছে। সঙ্গীতের মাধুর্য ছাড়াও আরও কিছু। নইলে গান শুনে কখন এক সময় অনুভব করেছেন যে, তাঁর চোখে জল এসেছে—এমন হবে কেন? কিছু আছে। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সামনে পেয়েও করেন নি। নিত্যই দিনে রাত্রে দুবার এমনই নীলাম্বরী অবগুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে বাঁশরীওয়ালী প্যারে এসে তাঁকে দেখে নীরবে চলে গেছেন। কপালে কোমল হাতের তালুর স্পর্শ এবং মণিবন্ধে তার চাঁপার কলির মত আঙুলগুলির স্পর্শ অনুভব করেছেন। তাকিয়েও দেখেছেন তার গঠন ও সৌন্দর্য। অনাবৃত দুটি হাতের সুষমাও দেখেছেন।

বিস্ময় বোধ করেছেন এই ভেবে যে, এই সুকুমার তরুণ বয়সে এ সাধনা সম্ভব হল কী করে? এ তো যেন কিশোরী কুমারী! অবশ্য প্রতিবারই দেখেছেন কুহেলির মত আলোর মধ্যে। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের পূর্বে একটি কোমল শীতল স্পর্শে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়। প্রতিদিনই তিনি চমকে উঠেছেন। মনে হয়েছে, তাঁর জীবনের সেই নাস্তিত্বের এ যেন অস্তিরূপ। নীলাম্বরীর দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃতা সুকুমার নারীমূর্তিটি মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রেখে উত্তাপ অনুভব করেছে। সেই স্বল্প আলোকে নীলাম্বরী ঘনকৃষ্ণাম্বরী বলে ভ্রম হয়েছে।

প্রথম দু-তিন দিন সচকিতভাবে প্রশ্ন করেছেন, কে? তুমি কে?

অবগুণ্ঠনাবৃতা নীরব থেকেছে, অচঞ্চল থেকেছে। পাশ থেকে উত্তর দিয়েছে গোকুলানন্দ: বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী পরভু।

হাঁ। তিনি সদ্য-স্নাতার কেশগন্ধ পেয়েছেন তখন। স্পর্শের শীতলতায় মাধুর্যের অর্থ অনুভব করেছেন।

শেষ দিন হাত চেপে ধরে দুবার প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি কে? গোকুলানন্দের উত্তর শোনার পর আবারও প্রশ্ন করেছিলেন, বল তুমি কে?

মূর্তি তেমনি স্থির অচঞ্চল ছিল।

গোকুলানন্দ তাঁকে নাড়া দিয়ে বলেছিল, গুরুজী! বোধ করি সে তাঁকে নিদ্রাঘোর-বিভ্রান্ত ভেবেছিল। তিনি গোকুলানন্দের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই সে মনে করিয়ে দিয়েছিল, প্যারেজী—বাঁশরীওয়ালী প্যারে আপনার নাড়ী দেখবেন।

তিনি আবার একবার ওই কৃষ্ণাবগুণ্ঠনাবৃতা মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখে হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর পর আর কোনদিন কোনও প্রশ্ন করেন নি। মনের প্রশ্নের নিবৃত্তি হয় নি, কিন্তু নিজেকে সংযত করেছেন। এক-একদিন ক্রোধ হয়েছে, অবগুণ্ঠনপ্রান্ত চেপে ধরে এক মুহূর্তে টেনে খুলে দিতে ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছেন। সন্ধ্যায় দেবকর্মে যাবার আগে আবার এসে দেখে যায় বাঁশরীওয়ালীজী। তখন আসে ভজনের আসরের সজ্জায় সেজে। সযত্ন কেশ-প্রসাধনে আমলকি ও মসলার গন্ধ পেয়েছেন। হাতের স্পর্শে উষ্ণতা অনুভব করেছেন।

তখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়েছে—কী পেয়েছ? কিন্তু তাও করেন নি। সন্ধ্যায় তিনিও থাকেন নীরব স্থির। বোধ করি ওই সঙ্গে একটি দুটি কুঞ্চন-রেখা ফুটে ওঠে ললাটে, কখনও বা একটু ক্ষীণ হাসির রেখা।

আজ বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী নিজেই কথা বলবেন অভিপ্রায় জানিয়েছেন। আজ সকালেই গোকুলানন্দ সংবাদ এনেছিল, নবাবী ফৌজ ত্রিকূট পাহাড় থেকে মান্দারের পথে রওনা হয়েছে। সন্ন্যাসীর দল না-কি বনে বনে এই দিকে এসেছে। দুখানা গ্রামে তারা জুলুমবাজি করে সিধা আদায় করেছে—এ খবরের সূতার নাগাল পেয়েছে নবাবী ফৌজ। মাধবানন্দ গোকুলানন্দকে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন, খবর করো গোকুলানন্দ, দলের খবর করো। আমি আজই রাত্রে এ আশ্রম ত্যাগ করব। দলের খবর মেলে ভাল, না-মেলে আমি পথে বের হয়ে পড়ব। প্যারেজীর আশ্রমে নবাবী ফৌজের হাতে ধরা পড়ে তাকে বিপন্ন করতে পারব না। গোকুলানন্দ চলে গেছে। সন্ধ্যায় প্যারেজীর লোক এসে বললে, প্যারেজী আপনার সঙ্গে বাত বলতে চান।

—আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ। আপনার অনুমতি চাইছেন তিনি।

—কিন্তু কার যে মানা আছে শুনেছি। পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর, জিজ্ঞাসা করলেন, কার মানা? এ প্রশ্নটা আজ হঠাৎ যেন জেগে উঠল তাঁর মনে। দরজার মুখেই তখন কৃষ্ণ-অবগুণ্ঠনাবৃতা মেয়েটি ঢুকছিল; মাধবানন্দের কথা শেষ হতেই সে ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়িয়ে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্নটির পুনরাবৃত্তি করলে, কার মানা?

কথা হচ্ছিল দেহাতি হিন্দীতে।

মাধবানন্দ বললেন, হ্যাঁ। কার মানা? বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী তো সকলের সামনেই মুখ তুলে বের হন, কথা বলেন। বিগ্রহের দরবারে হাজার লোকের সামনে ভজন গান করেন, নাচেন, তবে আমার সামনে মানা কেন? কার মানা? রাধাগোবিনজীর? স্বপ্ন?

অবগুণ্ঠনবতীর মাথাটি 'না'র ভঙ্গিতে দুলে উঠল। 'না' অর্থাৎ তাঁদের মানা নয়।

—তবে ?

—আমার শ্যামের।

—শ্যাম? গোবিনজী ?

—না। গোবিনজী ভগবান শ্যাম আমার শ্যাম। আমার গোসাঁই। আমার গুরু।

—কিন্তু কেন ?

—আমার মুখ দেখলে আপনার পাপ হবে।

—তোমার মুখ দেখলে আমার পাপ হবে? বাঁশরীওয়ালী প্যারেজী, তোমার সেবায় চিকিৎসায় আশ্রয়ে আমি বেঁচেছি। তুমি না-থাকলে আমাকে নিশ্চিত মরতে হত। তোমার ভক্তি-গদগদ কণ্ঠের গান শুনেছি, শুনে কেঁদেছি। তোমার পায়ের নূপুরের শব্দে আবেশ এসেছে। চোখে দেখি নি, কিন্তু মনে মনে কল্পনা করতে পারি, তার মধ্যে তোমার সে আত্মনিবেদন। আমি শুনেছি এখানকার লোকে তোমাকে দেবী মনে করে। তবে তোমার মুখ দেখলে আমার পাপ হবে কেন ?

—সে কথা থাক্ গোসাঁইজী, শ্যামের দেখা পেলে আমি শুধাব। তবে আমার ডর লাগে গোসাঁইজী কেন জান ? কারণ লোকে আমাকে বলে প্যারী, আমার মধ্যে তারা নাকি দেখে রাধাভাবের ছায়া; আমার সাধনও সেই রাধাভাবের। তুমি, গোসাঁইজী, মস্ত বড় যোগী, ভারী সাধনা তোমার। তোমার রাগ হলে আগুন জ্বলে যায়; তোমার দিকে কেউ অবুঝ যদি প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় তো আপন কলুষে ডুবে দম বন্ধ হয়ে মরে। তুমি জ্ঞানী পণ্ডিত, তোমার হুকুমে রাধারাণীজীকে বনবাসে পাঠিয়েছ; গোসাঁই, আমাকে দেখে যদি তোমার রাগ হয়! আমি যে ভস্ম হয়ে যাব মহারাজ!

স্তব্ধ হয়ে রইলেন মাধবানন্দজী।

বাঁশরীওয়ালী বললে, ও কথা যাক গোসাঁইজী, যে কথা বলতে আমার শ্যামের হুকুম আমি আধা লঙ্ঘন করেছি, তাই বলি—

বাধা দিয়ে মাধবানন্দ বললেন, না। তার আগে আর কয়টা প্রশ্ন করব। লোকে বলে আমারও বিশ্বাস, তুমি সিদ্ধি পেয়েছ।

—সিদ্ধি কাকে বলে জানি না গোসাঁই, তবে আনন্দ পেয়েছি। দুঃখে

যখন কাঁদি তখনও সুখ পাই। সেও সুখ হয়ে ওঠে। সে যদি সিদ্ধি হয় তো পেয়েছি।

—তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও?

—তাও জানি না গোসাঁই। আমি তো কখনও দেখতে চাই নি।

—ভগবানের দর্শন?

—না গোসাঁই। ভগবানের দর্শন তো আমি মাঙি নাই, আমি চিরদিন চেয়েছি আমার শ্যাম—আমার গুরুর দর্শন। সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে গোসাঁই—ষোল বছর। তখন আমার বয়স ষোল। আজ আমার বয়স বত্রিশ। ষোল বরিষ আজ আমার যৌবন-রূপের পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে ফিরছি।

—দেহকামনা নিয়ে তোমার সাধনা প্যারেজী? বিস্মিত হলেন মাধবানন্দ। এ হতভাগিনী বলে কী? এই নিষ্ঠা যার, তাকে দীক্ষা দিলে কে?

বাঁশরীওয়ালী হাতজোড় করে বললে, দেহের মধ্যেই যে বেঁচে থাকা গোসাঁই। দেহ আমার মূল, পরমাত্মা আমার ফুল। মূলের তিয়াস না মিটলে ফুল ফুটবে কেন মহারাজ? ফুল ফুটলে ভ্রমর আসে গুরু। ভ্রমর ভগবান। তখন ফল হয়। তুমি জ্ঞানী। আমি মুরুখ্ দেহাতী ছোকরী। অপরাধ হলে নিও না। সংসারে যে ভাল কথা বলে সেই আমার আপনজন, যাকে বুকে ধরে বুক জুড়ায় সেই আমার পরমধন। ধরম কি তা জানি না গোসাঁই, যে করমে মনে আহ্লাদ, দেহে আহ্লাদ, তুমি খুশী তারা খুশী, তাই আমার ধরম।

অভিভূত হয়ে শুনছিলেন মাধবানন্দ। কথাগুলি নূতন নয়, এ কথা অনেকবার অনেকজনের কাছে শুনেছেন, ভণ্ড পতিতের মুখে মুখস্থ বুলির মত শুনেছেন, কূট নাস্তিকের মুখে তর্কের বক্র ছন্দে শুনেছেন, কিন্তু এমন বিশ্বাসের সঙ্গে পবিত্র জীবননিষ্ঠার কষ্টিপাথরে-যাচাই-করা সোনার মত পরিচয় নিয়ে কখনও কথাগুলি তাঁর সামনে ফুটে ওঠে নি। দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর মুখ—মুখের ছবি।

বাঁশরীওয়ালী একটু থেমেছিল, আবার বললে, আপনি পণ্ডিত, আপনার ধরম আলাদা ; কিন্তু গোসাঁইজী, ধরম আপনার যাই হোক, আপনি ওই সুন্দর দেহখানি ধরেছেন বলেই তো সে ধরমকে আপনি ধরতে পেরেছেন, আর ধরমও আপনাকে ধরে ধ্বজা তুলেছে। দেহের উপর রাগ কেন গোসাঁই? সে তো নিজের উপরেই রাগ করা গো! দেহের উপর রাগ করে মরা তো সোজা, কিন্তু তখন দাঁড়াই কোথা? কোথায় মাটি? তিয়াস মেটে কিসে? কোথায় জল? মাটি নাই, জল নাই, চাঁদসুরয নাই—

চিৎকার করে উঠলেন মাধবানন্দ। যেন চোখের সম্মুখে সেই নাস্তিত্বের রূপ। চিৎকার করে উঠলেন, কে তুমি? কে? কে?

দাঁড়িয়ে উঠে হাত বাড়ালেন তিনি। ওই অবগুণ্ঠন খুলে দেবেন।

হাতজোড় করে পিছিয়ে গেল বাঁশরীওয়ালী: না মহারাজ। তারপরই বললে, আমি কসুর করেছি গোসাঁইজী। আপনার সঙ্গে ধরমের তকরার করেছি। আপনি সিদ্ধপুরুষ, কংসারির সঙ্গে কথা হয় আপনার। আমার মুখ দেখবেন না। এ মুখ দেখে যদি আপনার মুখ অপ্রসন্ন হয়, তবে লজ্জায় যে মরে যাব আমি।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠল। আরতির সময় হয়েছে। বাঁশরীওয়ালী একটু চঞ্চল হয়ে উঠল; বললে, এ সব কথা থাক্ মহারাজ; আমি দেহাতী মেয়ে, কিছুই জানি না। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন অহঙ্কার হল আমার, আবোল-তাবোল বকেই যাচ্ছি। প্রাণের আকুলি-বিকুলিতে আদেশ আধা লঙ্ঘন করে যে কথা বলতে এসেছি, তাই বলা হয় নি। আজ যে আমার ডর লাগছে গোসাঁই। নবাবী ফৌজ শুনছি—

মাধবানন্দ চঞ্চল হলেন না, অচঞ্চল ভাবেই বললেন, সে খবর আমি পেয়েছি প্যারেজী।

—আপনি গোকুলানন্দকে পাঠিয়েছিলেন আপনার শিষ্যদের সন্ধানে। একজন ভিন গাঁয়ের লোক তাকে ধরিয়ে দিয়েছে নবাবী ফৌজের হাতে। খবর এসেছে।

—গোকুলানন্দ ধরা পড়েছে? চিন্তাকুল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন এবার মাধবানন্দ।

—আমাকে না বলে কেন পাঠালেন মহারাজ? আপনার শিষ্যরা ওদিকে গাঁয়ে জুলুমবাজি করছে। পরশু এক গাঁও হাতী দিয়ে ভাঙিয়ে দিয়েছে। এ লোক সেই গাঁওয়ের। এখন আপনাকে আমি বাঁচাই কী করে, সেই ভাবনায় আমি ছুটে এসেছি।

ভাবনা তুমি করো না প্যারেজী। ভয় নাই। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। তোমার সেবা, তোমার স্নেহ, তোমার দেওয়া আনন্দের মত আনন্দ আমার জীবনে কখনও পাই নি। অনেক তপস্যা করেছি প্যারেজী, সিদ্ধি আমি পাই নি—শুধু কেঁদেছি, দুঃখ ভোগ করেছি, অনেক ভেবেছি, কিন্তু এ স্বাদ মেলে নি। আমার জন্যে তোমার বিপদ ঘটতে দেব না, আমি চলে যাব।

—রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! কাতর স্বরে যেন কেঁদে উঠল বাঁশরীওয়ালী: না, না, না গোসাঁই, না। আমার বিপদের কথা আমি ভাবি নি গোসাঁই। আপনার জন্যে আমার বিপদ ঘটলে সেই বিপদেই ভগবান আসবেন, আমার সিদ্ধি হবে। আমার বিপদের জন্যে নয় গোসাঁই; কথাটা আপনাকে জানাতে এসেছি। আমি মনে মনে জেনেছি, আপনি চলে যাবার মতলব করেছেন। তাই হাতজোড় করে আপনার চরণ ধরে—

বাঁশরীওয়ালী যেন ভেঙে পড়ে গেল, নতজানু হয়ে বসে তাঁর পা দুটি জড়িয়ে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, এমন কাজ আপনি করবেন না। আপনি বেরবেন না। আপনি আমার পরম ধন।

বিষণ্ণ ক্লান্ত কণ্ঠে উপরের দিকে চেয়ে মাধবানন্দ বললেন, বাঁশরীওয়ালী, তোমার অনুমতি না নিয়ে আমি যাব না। বলেই তিনি বুঝলেন, সেই বিষণ্ণতায় আবার যেন ডুবে যাচ্ছেন।

কিন্তু সে কথা তাঁর সম্পূর্ণ হল না, মেঘের ডাকের মতই আকস্মিকভাবে একটা প্রচণ্ড গর্জনধ্বনি যেন ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। হাজার লোকের চিৎকার একসঙ্গে।

মুহূর্তে জলের-স্রোতের-টানে-পড়ে-বেঁকে-যাওয়া বেতের লতা যেন স্রোতের টান থেকে মুক্ত হয়ে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়াল; দীর্ঘ নীলাম্বরীর অবগুণ্ঠনখানা টেনে খুলে ফেলে দিয়ে বাঁশরীওয়ালী ছুটে বেরিয়ে গেল,

পিঠের বেণীটা দুলে উঠল। অপরূপ কোমল লাবণ্যের চকিত একটা ঝলক খেলে গেল; দরজার মুখে বারেকের জন্য মুখ ফিরিয়ে সে বললে, আমি আসছি।

চমকে উঠলেন মাধবানন্দ। বাইরে চিৎকার উঠছে; হয়তো নবাবী ফৌজের কিংবা সন্ন্যাসী দলের। কিন্তু সে প্রশ্ন তাঁর মনে ছিল না। ছিল একটি প্রশ্ন—

—কে? ও কে? আকাশপাতালের অসীম শূন্যতায় হারানো একটি তারা আজ অকস্মাৎ জ্বলে উঠেছে।

—বন্ধ করো। ফটক সব বন্ধ করো। নাকাড়ায় ঘা মারো।—নীচে কেউ আদেশ দিচ্ছে।

* * *

মাধবনানন্দ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন: কে?

কতক্ষণ কে জানে? মাধবানন্দ ঠিক তেমনিভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। জীবনের অন্ধকার বিষণ্ণতার যবনিকায় যেন আগুন লেগেছে। ধোঁয়াচ্ছে। জ্বলে উঠবে। বাইরের কোলাহল কানে গিয়েও যাচ্ছে না। দরজার ওপারে অন্ধকার পার হয়ে দ্রুতপদে ঘরে ঢুকল এবং দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল বাঁশরীওয়ালী প্যারে। অবগুণ্ঠনহীন মুখ, ওড়নাখানা মেঝের উপর পড়ে আছে। হাঁপাচ্ছে সে। সন্ধ্যার আরতির সাজসজ্জা এই অল্পকালের মধ্যে বিস্রস্ত হয়ে গেছে। ভারী ভারী ফটক দুটো বন্ধ করিয়ে উঠানের চারিপাশের ঘন আমবাগানের তল দিয়ে ছুটোছুটি করবার সময় বাধার জ্ঞান ছিল না। মাথার চুল উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে, সিঁথির ধুকধুকিটা একপাশে এসে পড়েছে। কাচুলির কাঁধটা ছিঁড়ে গেছে। মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে, চোখ দুটি অস্বাভাবিক ‘

মাধবানন্দের চোখ দুটিও বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে: কে?

—আমি মোহিনী! ওগো গোসাঁই, আমি মোহিনী। তুমি তোমার চরণ ছাড়িয়ে নিয়েছিলে, তোমার চরণের ঘায়ে আমার ঠোঁট কেটে গিয়েছিল; এই দেখ সেই দাগ। তুমি মুখ দেখাতে বারণ করেছিলে। কী করব গোসাঁই—আমার শ্যাম—আমি সাধ করে দেখাই নি। পাশের গাঁয়ে নবাবী ফৌজ

এসেছে, গাঁয়ের ওপাশে তোমার সন্ন্যাসীর দল। আমার হুঁশ ছিল না। আমার অপরাধ নিয়ো না গোসাঁই। তোমার সেবা করেছি; আমার সাধন সফল হয়েছে। আমার সাধনের শিক্ষাগুরু বলেছিলেন, তোর রূপ-যৌবনের পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে রাধাশ্যামের ভজন গেয়ে পথ চল্—তাকে পাবি, ওই কুম্ভের জলে তার অভিষেক হবে, আমার আশীর্বাদ রইল। গোসাঁই, আমি আমার কুম্ভের জল তোমার পায়ে ঢেলে দিয়ে ধন্য হয়েছি। তুমি রেগো না গোসাঁই।

হেমন্তের রাস-পূর্ণিমার আগের রাত্রি আর শ্রাবণের ঝুলন-পূর্ণিমার আগের রাত্রি যেন এক হয়ে গেছে। ষোল বছর আগের সেই গড় জঙ্গলের রাত্রি যেন ফিরে এসেছে। মেঘ আকাশে নেই; কিন্তু মাধবানন্দের দেহে মনে ষোল বছর ধরে যে গুমটের মত আচ্ছন্নতা নিরন্তর ঘনিয়ে ঘনিয়ে ওঠে, সেই আচ্ছন্নতাকে আজ বিদীর্ণ করে যেন বিদ্যুৎ বিস্ফুরিত হয়ে বর্ষণ নেমেছে, ঝড় উঠেছে; ঝড়ে ঝাপটায় বর্ষণে বিদ্যুতে মাতামাতি লেগেছে জীবনে।

আজ জীবন এই বর্ষণে ধুয়ে ধুয়ে অমলিন অবারিত সত্যে প্রকাশিত হচ্ছে। আজীবন নিবারিত জীবনসত্যের এ কী মহাপ্রকাশ! আঃ! জীবনের সেই মর্মান্তিক নাস্তিত্ব আনন্দে আশায় সুখে দুঃখে সাধনায় কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণাবগুণ্ঠন-খসা মোহিনী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। তার ষোল বছর ধরে কাঁখে-বওয়া রূপযৌবনের পূর্ণকুম্ভ থেকে অমৃত উথলে উঠছে। সেবার অমৃত, স্নেহের অমৃত, সান্ত্বনার অমৃত, শুশ্রূষার অমৃত অঞ্জলি অঞ্জলি পান করেছেন তিনি। আজ মৃত্যু-কোলাহলের সম্মুখে এই প্রাণ দিয়ে ঘিরে রাখার আকুতির মধ্যে সে অমৃত উথলে পড়ে বুকে প্লাবন তুলেছে। আজ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মৃত্যুর মধ্যেও তিনি একা নন। এ কী আনন্দ!

মাধবানন্দের চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল। বলতে চাইলেন—তুমি রাধা, তুমি রাধা, তুমি রাধা। কিন্তু পারলেন না।

কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড মহা নাচনে নাচছে। দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি কোষ-মুখ থেকে উল্লাসের কল্লোল প্রস্রবণের ধারার মত বেরিয়ে আসছে। সৃষ্টির আদিপ্রান্তের অনাবিষ্কৃত

কন্দর-মুখ থেকে জীবন-স্রোতের নির্গমন কলরোল। তার ফেনিল আবর্তে আনন্দের জ্যোতির ছটার প্রতিফলনে হাজার ইন্দ্রধনু ফুটে উঠছে। তাঁকে যে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে কামনা করেছে সে তাঁর সম্মুখে; তিনি যাকে অবচেতনে মনের কোণে কোণে খুঁজেছেন—পান নি, সে আজ বাইরে এসে বিচিত্র ভাবে দাঁড়িয়েছে।

মোহিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে, পথের শেষ প্রান্তে এসে সে আর পারছে না। তার চোখে বিচিত্র দৃষ্টি। মুখে শোণিতোচ্ছ্বাসের প্রতিচ্ছটা। সে আত্মবিহ্বলা। বিস্রস্ত বেশবাস। তার বক্ষাবরণ কাঁধের কাছটায় ছিঁড়ে গিয়ে সে অর্ধ অনাবৃত। অতিশুভ্রনবনীত তনু-লাবণ্য প্রদীপের আলোয় গলে গলে তাঁর জীবন হোমের শিখার সম্মুখে ঘৃতধারার আহুতির মত উদ্যত হয়ে রয়েছে।

অকলুষ আনন্দে অসঙ্কোচ বাহু বিস্তার করে প্রার্থীর মত নতজানু হয়ে বসলেন, এতক্ষণে কথা বের হল, তুমি রাধা—আমার রাধা!

মুহূর্তে উল্লাসে আত্মহারা হয়ে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল মোহিনী।

পূর্ণকুম্ভ আছাড় খেয়ে পড়ল বিগ্রহের মাথায়। এক মুহূর্তে প্লাবনে সর্বাঙ্গ অভিষিক্ত করে ছড়িয়ে পড়ল।

* * *

মোহিনী বললে, গোসাঁই, বড় দুঃখ না হলে সাধনে মন বসে না। দুঃখের আসনে না বসলে রাধারাণীর দয়া হয় না। ঠোঁটটা কেটে গেল, তুমি বললে—ভোর হলেই চলে যেয়ো, তোমার মুখ যেন না দেখতে হয়।

—মোহিনী!

না, মোহিনীর মুখ তো এ নয়। এ মুখ রাধারাণীর স্নানজলে ধুয়ে ধুয়ে অন্য মুখ—শ্যাম।

—দুঃখে অভিমানে সেই তখনই বেরিয়ে গেলাম। বনের পথ যে দিকে যায় সেই দিকে চলেছিলাম। কেমন করে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এসেছিলাম জানি না। তারপর পড়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে। জ্ঞান যখন হল তখন মাথার কাছে দেখলাম, বড় সুন্দর এক বুড়ী মাকে। আমাকে চোখ মেলে চাইতে দেখে শুধু বললে, বেটী! আমার মনে হল,

গোসাঁই, আমার সব হারিয়েছিল, আমি সব পেলাম। সেই বুড়ী মায়ের এই আশ্রম। সে ছিল কাশীর মস্ত বড় বাঈজী। সন্তান ছিল একটি, তাকে হারিয়ে মান্দারে গোপালের সাধনায় সন্ন্যাসিনী হয়ে ভজন করত। বাদশাহী সড়ক ধরে যাচ্ছিল বিষ্ণুপুরে হরিনামের বেগার-লেনেওলা রাজা দুর্জন সিংহের বাড়ি মদনমোহনের আঙিনায় ঝুলনে ভজন গাইতে। আমার ভাগ্য গোসাঁই, উটের গাড়ির উপর থেকে ভজনওয়ালী নন্দরাণী মা আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিয়েছিল যশোদার মত। সে আমাকে গান শিখিয়ে নাচ শিখিয়ে বলেছিল—এই তোর সাধন। বাঁশের বাঁশী বাজাতে শিখেছিলাম, তাই বাঁশী হাতে দিয়ে বলেছিল—তুই বাঁশরীওয়ালী প্যারী। মন্তর না, তন্তর না, ধরম না—এই মন্তর, এই ধরম। ভগবান চাস না, মিলবে না। মানুষ যাকে চাস তাকে চাইবি। পাস না-পাস তার জন্য প্রাণপাত করবি, মরবি, তখন আপনি আসবে ভগবান। আমি পেয়েছি গোসাঁই।

মাধবানন্দ বাক্যহারা। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

বাইরে কোলাহল বাড়ছে।

হেমন্ত-শুক্লা-চতুর্দশীর জ্যোৎস্নাকে নিষ্প্রভ করে দিগন্তে আকাশে আগুনের ছটা ফুটেছে। আগুন লেগেছে। গ্রাম পুড়ছে।

*   *   *

পরদিন সন্ধ্যাবেলা।

আকাশে রাস-পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

কোলাহল উঠছে বাঁশরীওয়ালী প্যারীর আশ্রমে। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসছে লোক। বাঁশরীওয়ালী বৃন্দাবন যাচ্ছে। সাধন পূর্ণ হয়েছে। সাধুর বেশে স্বয়ং শ্যাম এসেছিলেন নিতে। মন্দিরের সামনে রাশি-রাশি-ফুলে-ঢাকা দুটি শব।

বাঁশরীওয়ালী প্যারে আর মাধবানন্দ।

উদয়-মুহূর্তে মারা গেছেন মাধবানন্দ; তাঁর দেহের উপর পড়ে দেহত্যাগ করেছে বাঁশরীওয়ালী। মাধবানন্দের দেহখানা দলিত পিষ্ট মাংসপিণ্ডে

পরিণত হয়েছে। তাঁর নিজের দলের হাতী তাঁকে পায়ে দলে দিয়ে গিয়েছে।

যুদ্ধোন্মত্ত হাতীর সামনে গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাধবানন্দ।

সারারাত্রি এই গ্রামের ও-প্রান্তে নবাবী ফৌজ আর সন্ন্যাসীর দলে লড়াই হয়েছে। গোকুলানন্দকে গ্রেপ্তারের সংবাদ সন্ন্যাসীদের কাছে পৌঁছেছিল, গ্রামের লোক তাকে ধরিয়ে দিয়েছে। তারা কঠিন আক্রোশে ফিরেছিল, গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ওদিকে সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছিল নবাবী ফৌজ। দু দলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলেছে শেষরাত্রি পর্যন্ত। শেষরাত্রে নবাবী ফৌজের কাছে হটে গিয়ে সন্ন্যাসীরা মান্দার পাহাড়ের কোলে বনের দিকে পালাবার পথে সম্মুখের গ্রাম লুঠে জ্বালিয়ে হাতী দিয়ে ভূমিসাৎ করে চলে যাচ্ছিল। গ্রামবাসীর আর্তনাদে আর থাকতে পারেন নি মাধবানন্দ। তিনি বেরিয়ে এসে পথের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তলোয়ার হাতে। যুদ্ধোন্মত্ত হাতী ছিল সর্বাগ্রে। সে শুঁড় দিয়ে চাল টেনে নামাচ্ছিল; মাথা দিয়ে ঠেলে ফেলছিল দেওয়াল। আবার ছুটছিল সম্মুখে। সে রূপ ভীষণ রূপ! হাতীর উপর বসে চিৎকার করছিল কেশবানন্দ: হরি-হর! হরি-হর! হরি-হর!

পথের উপর লাফ দিয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন মাধবানন্দ: না। না। রোখো। কেশবানন্দ!

সে ডাক বোধ হয় শুনতে পায় নি কেশবানন্দ। পাগলা হাতী শুঁড় তুলিয়ে ভয়ানক চিৎকার করে ছুটে এসেছিল। সে মানবে কেন? মাধবানন্দ এক পাশে সরে গিয়ে সবলে তলোয়ারের আঘাত করেছিলেন তার শুঁড়ে। প্রচণ্ড চিৎকার করে হাতী দুর্বার বেগে দলের গুরুকে পায়ে দলে সম্মুখ-পথে ছুটে চলে গেছে। সন্ন্যাসীর দল শেষ মুহূর্তে তাঁকে চিনেছিল, কিন্তু দাঁড়াবার তাদের উপায় ছিল না। পিছনে ছুটে আসছে হয়তো নবাবী ফৌজ।

আশ্রমের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, বাঁশরীওয়ালী স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল। হাতীটা ছুটে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে এসে মাধবানন্দের দলিত দেহের উপর আছাড় খেয়ে পড়েছিল। তারপর আর ওঠে নি।

পিছনে আসছিল উন্মত্ত গ্রামের লোক। নবাবী ফৌজ ক্লান্ত। তারা বিশ্রাম নিচ্ছে। গ্রামের লোক পিছু নিয়েছিল সন্ন্যাসীদের। কিন্তু বাঁশরীওয়ালীর বিচিত্র মৃত্যু দেখে তারা থমকে দাঁড়িয়েছিল।

বাঁশরীওয়ালী প্যারীর সাধন পূর্ণ হয়েছে রাস-পূর্ণিমার প্রভাতে। শ্যাম তাকে নিতে এসেছিল সন্ন্যাসীর বেশে। শ্যাম হাতীকে বধ করে বৃন্দাবন ফিরলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারী।

হাতীটা গ্রামপ্রান্তে গিয়ে পড়েছে। সন্ন্যাসীরা পায়দল পালিয়েছে উত্তর মুখে।

পালাক। পালাতে দাও তাদের। গাঁয়ের লোকেরা, এস। ফুল আন, ধূপ আন, চন্দন আন, সোনা আন, রূপা আন, বেনারসী শাড়ি আন, ভারে ভারে আন গঙ্গাজল। প্রণাম কর।

শ্যামের সঙ্গে বাঁশরীওয়ালী প্যারে যাচ্ছেন বৃন্দাবন।

ও সে গোপন মনের গুপ্ত বৃন্দাবন।
হোক না লক্ষ কুরুক্ষেত্র
বৃন্দাবনে অহ-রহ যুগল-মিলন।

লোকে আজও গান গায়। গায় ওই বাউলেরা।